# কলোনি যায়নি মরে আজো ...

ত্রিদিব সেনগুপ্ত

গত কয়েক বছর ধরে যে প্রবন্ধের সিরিজ লিখে যাচ্ছি, অনুষ্টুপে, অপরে, এবং অন্যত্র, এটা সেই সিরিজেরই আর একটা। এই সিরিজের প্রবন্ধগুলোর বিষয় ভীষণভাবেই এক ২০০০ মে তে প্রকাশিত 'মার্জিন অফ মার্জিন : প্রোফাইল অফ অ্যান আনরিপেন্টান্ট পোস্টকলোনিয়াল কোলাবোরেটর' নামের বইয়ের সঙ্গে। শুধু সম্ভাব্য পাঠকের ইতিহাসের তফাত লেখার ধাঁচেও একটা তফাত এনেছে। আর একটা সমস্যা থাকছে এই যে প্রতিটি প্রবন্ধই এক অর্থে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার কথা। তাই এমন কিছু প্রসঙ্গ চলে আসবেই যা অন্য প্রবন্ধে আগেই এক বা একাধিকবার এসে গেছে।

## ১।। উত্তরআধুনিক উত্তরঔপনিবেশিক

এখন উত্তরঔপনিবেশিক তত্ত্বচর্চার যুগ। ধরিত্রী মার বুকে আর কোনো কলোনি নেই, কলোনাইজার কলোনাইজড নেই, কোনো ইংরাজ প্রভু নেই, কোনো নেটিভের-বাচ্চা-নেটিভ বাঙালি বাবু নেই। পৃথিবী জুড়ে, এককথায় বলতে গেলে, বিরাজ করছে সাম্য আর সাম্য। ভূ-গোলকের একভাগ স্থল আর তিনভাগ জল জুড়ে সতত সঞ্চরমান শুধু সাম্যের সবুজ শৈবাল।

কিন্তু ভূগোলে আর কলোনি না থাকলে কী হয়, ইতিহাসে তো রয়েছে। বেচারা ছাগলছানা আর বেজার বাঘের রিসেন্ট কথোপকথনেই তো সব শেষ হয়ে যায়না, ছাগলছানার বাপঠাকুর্দার সঙ্গে বাঘের আন্ত্রিক আন্তরিক সম্পর্কের আবহমান অন্তরঙ্গতাটা যাবে কোথায় বাবা?

কলোনি তাই একইসঙ্গে নেই এবং আছে। পৃথিবীর যাবতীয় অকলোনি দেশগুলোর দুটো নিট ভাগ — যারা কলোনি ছিল, এবং যারা কলোনি ছিলনা, মানে কলোনাইজার ছিল। এই যে 'কলোনি' আর 'কলোনাইজার' শব্দদুটোকে আমি বেমালুম আমার বাংলা লেখায় লিখে যেতে পারছি সে তো সেই একসময়কার কলোনাইজার ইংরেজ প্রভুর আবহমান ঐতিহাসিক দাক্ষিণ্যেই। আমাদের আজকের মধ্যেই সেই গতকাল আছে, যা আমাদের আগামীকালের তাত্ত্বিক অবস্থানকে প্রস্তুত করে দিচ্ছে — যারা একদিন কলোনি ছিল তাদের সাংস্কৃতিক বাস্তবতাটাকে বোঝার চেষ্টা তো কোনোদিনই সেই দেশগুলোর সংস্কৃতিবিদ্যার সঙ্গে এক হতে পারেনা যারা কোনোদিনই কলোনি ছিলনা। ভারতের বা ভারতীয়দের সংস্কৃতিকে বোঝার ব্যাকরণটা কখনোই আমেরিকার সঙ্গে এক হতে পারেনা। তাই এমন একটা শব্দ দরকার ছিল যা আজকের অকলোনি দেশগুলোর ভিতর আমাদের আলাদা জায়গাটাকে চিহ্নিত করে দেয়। যা একসময় কলোনি ছিল কিন্তু এখন আর নেই — সেটাই পোস্টকলোনি। 'উত্তরউপনিবেশ' হল সেই অভিধা যার ভিতর উপনিবেশ একইসঙ্গে নেই এবং আছে।

আজকের চালু কালচারাল স্টাডিজে, সংস্কৃতিবিদ্যার আলোচনায় এই কলোনাইজার-হীন কলোনাইজড-হীন পৃথিবীর সাম্যের জোয়ার। এবং, সত্যি কথা বলতে কী, আমাদের কোনো আপত্তিও নেই সমসাময়িক এই উত্তরআধুনিক উত্তরঔপনিবেশিক সংস্কৃতিবিদ্যায় আমাদের এই বিদেশী-দেশী সহকর্মীদের (ধরুন, ভাভা বা এসকোবার বা অন্য আরো অনেকে) এই সাম্যময় গনতান্ত্রিক ধারণার শরিক হতে। আর গনতন্ত্র তো অতি উপাদেয় জিনিষ, তাতে আর সন্দেহ কী। এবং এদের একটি অবস্থান অন্তত দ্বিধাহীন ভাবে প্রশংসনীয় — এই পরিবর্তমান পৃথিবীর সাড়ে-বত্রিশ-ভাজা সংস্কৃতিতে 'হাইব্রিড' বা 'সঙ্কর' ব্যাপারটি যে নিন্দনীয় কিছু নয়, সাড়ে বত্রিশ ভাজা খাবারটি যে কোনমতেই বিশুদ্ধ গব্য ঘৃতে সদ্যভর্জিত নুচিমালা থেকে ন্যূন কিছু নয়, কম উমদা কিছু নয়, এই আত্মবিশ্বাসটি আজকের পৃথিবীর সংস্কৃতিবিদ্যায় খুব জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন এরাই। আমাদের মেজরিটির তো সাতকেলে অবস্থান ছিল একদম গীতার অর্জুনের মত, যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আপত্তিটাই করেছিল এই যুক্তিতে যে যুদ্ধ করলে কুলধর্মনাশ, কুলক্ষয়, তার মানে কুলস্ত্রীগণ ব্যাভিচারিণী (পুরুষের সংখ্যা তো কমে যাচ্ছে, সে বেচারারা আর কী-ই বা করবে?) — তার মানে বর্ণসঙ্কর — সে এক

সমূহ কেলো, সব গোল্লায় যাওয়া। "দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ। উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।।" আজকের পৃথিবীর সংস্কৃতিবিদ্যার কুরুক্ষেত্রেও, আজো, এমনি লাখ লাখ পিস অর্জুন। ক্রিস্টোফার নরিস কী ভীষণ গোঁসা করেছেন বারংবার, দেরিদাকে তোরা আবাগির বেটাবেটিরা সব গোল্লায় দিলি রে, এসব দেরিদা নয় রে, বুঝতে হলে হাসেরল লেভিনাস হাইডেগার ইপোলিত পড়। অর্থাৎ, কুলীনকে জানো, কুলীনকে বুঝতে বুঝতে একসময় কুলীনের ঘরে তুমি বাসন মাজতে পারবে, তারপর একসময়, সবার না, কারুর কারুর, খুব কম কারুর কারুর, সুযোগ এসে যাবে কুলীনের বিছানায় শোবার, মানে, জন্মসূত্রে না হলে কী হয়, অনুলোমসূত্রে তুমি কুলীন হয়ে যাবে। দেখেননা, শীতের কনসেশনের প্লেনের টিকিটে এরকম অনেক বাই প্রোমোশন কুলীন আমাদের ইউনিভার্সিটিতে অ্যাকাডেমিতে বেড়াতে আসে। যারা ডিফল্ট সেটিং-এই কুলীন, কোন দুঃখে তারা মরতে আসবে এই পোড়া দেশে?

এই কুলীনতার, বিশুদ্ধতার, আগমার্কার প্রতি একটা বাড়তি ঝোঁক কমবেশি কাজ করে চলে প্রায় প্রতিটি তাত্ত্বিক অবস্থানেই। এমনকী ঘোষিত ভাবে ব্রাত্যের অন্তজের তত্ত্ব যেগুলো সেগুলোতেও দেখবেন কী প্রচণ্ড এই রগদারগদি। এরকম লেখা-প্রতিলেখা-প্রতিপ্রতিলেখা আমি বহুবার দেখেছি ঘোষিতভাবে বামপন্থী কাগজগুলোতেও। তুই বেটা লেনিনের হাই গুনেছিস কখনো? গুনে দেখ, দেখবি ডায়ালেক্টিকাল নিয়মে সাজানো। তাতে অন্যজন উত্তর দিল, কই বেলিন (মানে লেনিনের সবচেয়ে অথেনটিক পুত্তুর) তার মাসকাবারী হিশেবের খাতায় বাঁকোণে আলগোছে লিখে গেছেন, হাই দিয়ে কিছু বোঝারই মানে হয়না। তার মানে তোর তত্ত্ব ভুল, তুই ভুল, তোর আন্দোলন ভুল, তোর গোটা জীবনটাই ভুল। বিশুদ্ধ লেনিনকে জানো, বিশুদ্ধ মার্কসকে জানো, বিশুদ্ধ ফুকো দেরিদা লাকাঁকে জানো, বিশুদ্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীত গাও, বিশুদ্ধ বিপ্লবী হও। ইত্যাদি। যা করো যেখানে করো তাতেই বিশুদ্ধতার চর্চা। বিশুদ্ধতা মানে ভালো, মিশ্র মানে খারাপ। বিশুদ্ধ উঁচু, সঙ্কর নিচু।

উত্তরআধুনিক উত্তরঔপনিবেশিক তত্ত্বচর্চার এই ভাভা এসকোবার আপ্পাদুরাইরাই প্রথম ঘোষণা করলেন, না সঙ্কর বা হাইব্রিড মানেই কোনো অপমান বা লজ্জা না। সংস্কৃতির হাইব্রিডিটি মানে যেখানে বিভিন্ন সংস্কৃতি তাদের নিজের নিজের পার্থক্য বজায় রেখেই পরস্পরের সঙ্গে দরকষাকষি করছে। হাইব্রিডিটি মানে এই দরকষাকষি বা নেগোশিয়েশন। বিশুদ্ধতাপন্থী অবস্থানগুলো এই নেগোশিয়েশনকে বুঝতে পারেনা। তারা সবকিছুকেই ভাবতে চায় নেগেশন বা নাকচ করার ভিত্তিতে। সাদাকে কালো নাকচ করে, ভালোকে মন্দ, থিসিসকে অ্যান্টিথিসিস। এই দিত্ব বা বাইনারির মডেল, যেখানে দুই বিপরীত মেরুর নিরিখে আমাদের বাস্তবতাকে বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছে এটা মানুষের চিন্তাপ্রক্রিয়ার একটা চিরাচরিত কাঠামো। সব দেশে সব ধর্মেই আছে। ঈশ্বর আর শয়তান, শুভ আর অশুভ, অ্যাপোলোনিয়ান আর ডায়োনিজিয়ান। হেগেলের আগাপাশতলা তত্ত্বকাঠামোটাই গড়ে উঠেছে এই দিত্বের পর দিত্বের, বাইনারি অপোজিশনের পর বাইনারি অপোজিশনের শেকল জুড়ে জুড়ে।

কিন্তু আমরা তো বসবাস করি একটা উত্তরআধুনিক পৃথিবীতে যেখানে শুধু সাদা আর কালোই নেই, আছে ধূসরও। যেখানে একটি সত্তা আর একটা সত্তাকে শুধু নাকচই করেনা, তারা পরস্পর দরকষাকষিও করে। শাস্ত্রীয় মার্কসবাদের থিসিস অ্যান্টিথিসিসের আমরণ দ্বৈরথের জগত আর নয় সেটা, যেখানে থিসিস আর অ্যান্টিথিসিস এ অন্যকে শুধুই নেগেট করে আক্রমণ করে নিশ্চিহ্ন করে। এই অতিনির্ণীত বা ওভারডিটারমিন্ড পৃথিবীতে যেকোনো দুটি সত্তার মত থিসিস আর অ্যান্টিথিসিসও দুজনেই দুজনকে ওভারডিটারমিন করে। মানে, নির্ণয় ও নির্মাণ করে। দুজনেই দুজনের মধ্যে বসবাস করে। সাদার মধ্যে কালো, কালোর মধ্যে সাদা। ভুতুড়ে সর্ষে আর সর্ষেবীজের ভুতেদের সে এক সম্মিলিত ধূসরতার জগত। যে জগতের সাংস্কৃতিক ভূমিগুলোকে ভাবা ডাকলেন থার্ড স্পেস বা তৃতীয় ভূমি বলে।

থার্ড স্পেস একটা 'ইন-বিটুইন স্পেস'। ধরুন, একটা 'মধ্যিখানে চর'-এর মত, যা দুই পারের দুটো 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'-র কোনোটাই না। না পূর্ব, না পশ্চিম, না উত্তর, না দক্ষিণ। যেখানে প্রত্যেকেই শাসন করে, তাই, ফলতঃ, অন্য প্রত্যেকের দ্বারা শাসিতও হয়। তাই শাসক আর শাসিত এখানে জমাট দ্রবীভূত এক। (আমরা এর বিশদ আলোচনায় এখনি আসছি, এটা কিন্তু আমাদের অবস্থান থেকে পৃথক,

আমরা শাসক-শাসিত-র এক হয়ে যাওয়ায় বিশ্বাস করিনা। ভাভার থার্ড স্পেসের ওভারডিটারমিনেশন আমাদের ওভারডিটারমিনেশন ধারনার থেকে আলাদা।) ভাভার এই থার্ড স্পেসে কেউ কারুর উপরে নয়, তাই, কেউ কারুর নিচেও নয়। গুরুত্ব পাওয়ার মাপকাঠির কোনো হায়েরার্কি বা ক্রম নেই, যাতে সেই হায়েরার্কির উঁচুতে অবস্থানকারী কেউ নিম্নতর কাউকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, বা তার আজ্ঞা বহন করাতে পারে। এই থার্ড স্পেসে কেউ কাউকে আর ডিটারমিনই করেনা, প্রত্যেকেই অন্য প্রত্যেককে ওভারডিটারমিন করে। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে ওভারডিটারমিন করছে মানেই একটা সাম্যের আবহাওয়া। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সমান। ভাভার থার্ড স্পেস একটা আলোচনাগত ভূমি বা ডিসকার্সিভ স্পেস, যে আলোচনায় প্রতিটি ধারণা অন্য প্রতিটি ধারণার সমান। কেউ কারুর চেয়ে উপরে বা নিচুতে নয়।
ভাভার থার্ড স্পেসের সঙ্গে খুব নিকট প্রতিতুলনায় আসতে পারে আমাদের 'সিন্থেটিক স্পেস'-এর ধারণা। কিন্তু সেখানে কিছু সুস্পষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যের জায়গাও থাকে। সেই আলোচনায় আসার আগে আমরা সিম্পল কমপ্লেক্স এবং সিন্থেটিক হেজেমনি এবং ওভারডিটারমিনেশন আর তার মিমিক্রি সম্পর্কে একটু আলোচনা করে নিই। যা আগেই অন্যত্র অনেক বিশদভাবে করেছি আমরা। যারা আমাদের ব্যবহৃত এই ধারণাগুলোর সঙ্গে পরিচিত তারা অনায়াসে এই দুই নম্বর সেকশনটাকে বাদ দিয়ে যেতে পারেন।

## ২।। সিম্পল, কমপ্লেক্স, এবং সিন্থেটিক হেজেমনি

সিম্পল এবং কমপ্লেক্স স্পেস এর বিপরীতে সিন্থেটিক স্পেসকে আমরা খাড়া করি হেজেমনির বিশিষ্ট আকারের নিরিখে। হেজেমনি বলতে বোঝায় প্রজার উপর রাজার সর্বাঙ্গীন শাসন। রাজার পেয়াদার ডান্ডার ভয়ে রাজাভজা নয়, যখন প্রজারা রাজার নামে গান লিখে সুর দিয়ে গিটার বাজিয়ে পাড়ায় পাড়ায় গেয়ে বেড়ায় তখন আমরা বলি হেজেমনির হদ্দমুদ্দ — চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয়েছে প্রজার উপর। পেয়াদার ডান্ডা তার শরীরকে আর ওই গানের সুর তার মনকে শাসন করছে, রাজার নিয়ন্ত্রণে রাখছে। হেজেমনি বস্তুটা যেকোনো দেশের যেকোনো সময়ের যে কোনো রাজার কাছেই খুব পেয়ারের জিনিষ। খুব ইকনমিকও বটে। ধরুন, এর একটা মজার উদাহরণ দাসব্যবস্থা মানে স্লেভারি। যা ভারত কখনো দেখেনি, অন্তত মোড অফ প্রোডাকশনের আকারে দেখেনি। দাস যদিও কিছু ছিল তার ইতিহাসে। এমনকী দিল্লির মসনদেও তো ছিল। কিন্তু ইউরোপের ইতিহাসে দাসব্যবস্থা মোড অফ প্রোডাকশন হিশেবেই ছিল। মোড অফ প্রোডাকশন মানে এক কথায় একটা সমাজে চালু উৎপাদন ব্যবস্থা, তার সমস্ত উপাদানকে মিলিয়ে। গ্রীক, রোমান ইতিহাসে দাসব্যবস্থার ব্যাপকতা ভাবুন। দাসবিদ্রোহের নেতা স্পার্টাকাসকে ভাবুন। দাসদের অবস্থা কী ছিল তা আমরা সবাই জানি। খাদ্য বস্ত্র আহার্য সবকিছুতেই। তার অর্থনৈতিক অর্থ তো এই যে দাসমালিকের তরফে ব্যয় মানে কস্টটা ছিল অত্যন্ত কম। আর সব অর্থনৈতিক কাঠামোই তো চায় তার কস্টটাকে যতদূর সম্ভব কমিয়ে আনতে। সেদিক থেকে, কস্টের নিরিখে, দাসব্যবস্থা, মোড অফ প্রোডাকশন হিশেবে বেশ ভালো এফিশিয়েন্ট।

মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুযায়ী, এই মোড অফ প্রোডাকশন বা উৎপাদন কাঠামোকে ঘিরেই একটা সমাজের গোটা ব্যবস্থাটা গজিয়ে ওঠে। উৎপাদন থেকে উৎপাদন সম্পর্ক থেকে সম্পত্তি সম্পর্ক। মানে উৎপাদিত সম্পদের উদ্বৃত্ত অংশটা — ভোগের প্রয়োজনের পরে যা হাতে রইল — সেটা কে নেবে। দাসব্যবস্থায় যে নেয় সে হল দাসমালিক, আর উৎপাদন করেও সেই উদ্বৃত্তের ভাগ থেকে বঞ্চিত হয় দাস। ওই উদ্বৃত্ত সম্পদের ভিত্তিতে নতুন বাড়ি গাড়ি গরু এবং তরোয়াল হয় দাসমালিকের। নতুন সম্পত্তি। এখান থেকেই তৈরি হয় সামাজিক সম্পর্ক। যার দুটো গাড়ি দুটো তরোয়াল সে পৃথক হয় তাদের থেকে যাদের একটা গাড়ি একটা তরোয়াল। আর বেচারা দাসেরা — তারা ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ভোগের মানে তাদের সাবসিস্টেন্স কনজাম্পশনের পর, গরু-তরোয়ালের গল্প তো ছেড়েই দিন, এমনকী কাঁচকলাটুকুও পায়না। কাঁচকলার কোপ্তা খায় ওই দাসমালিকই। মার্ক্সবাদী লজিক এবার আমাদের জানায় যে ওই উৎপাদন ব্যবস্থা তাই তাকে ঘিরে সমাজব্যবস্থা ততদিনই চলতে পারে যতদিন সেটা তার সময়ের উৎপাদিকা শক্তি — মানে পুরো শ্রমিক শ্রম প্রকৌশল জ্ঞানবিজ্ঞান এই পুরোটার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। যখনি দেখা যায় পুরোনো ব্যবস্থা

আর এটার সাথে এঁটে উঠতে পারছেনা, তার দক্ষতায়, এফিশিয়েন্সিতে আর কুলোচ্ছে না, তখন সেটা বদলায়। এই ব্যবস্থাবদল যদি ব্যাপক বলপ্রয়োগের ভিত্তিতে হয়, তাকে আমরা বলি বিপ্লব। যেমন, দাসব্যবস্থার দক্ষতায় আর এঁটে ওঠা যাচ্ছিল না, তাই তার জায়গায় এলো সামন্তব্যবস্থা, যা, অবভিয়াসলি, দাসব্যবস্থার চেয়ে আরো এফিশিয়েন্ট।

কিন্তু, এইমাত্তর আমরা যা বললাম, দাসদের ক্ষেত্রে ওই সাবসিস্টেন্স কস্ট বা টিকে থাকার খরচ ছিল নামমাত্র। সেই কস্টের নিরিখে দাসব্যবস্থা বেজায় দক্ষ। তাহলে ক্যাঁচালটা ঘটল কোথায়? যে সমস্যাটা দাসব্যবস্থাকে খেয়ে ফেলছিল, এবং শেষ অব্দি পুরো হজমই করে দিল, সেটাকে আমরা হেজেমনির অভাবের খরচ বলে ডাকতেই পারি। এবং দাসব্যবস্থা আর আজকের পুঁজিসমাজের শ্রমব্যবস্থাকে যদি আমরা তুলনা করি, তাহলে তফাতটা স্পষ্ট হয়। একজন দাসকে ভাবুন। সে কী জানে? সে জানে, মালিকের বাড়ি গাড়ি গরু এবং তরোয়ালের মত, সে দাস নিজেও মালিকের একটা সম্পত্তি। মালিকই চাইবেনা, তার দাস মরে যাক, তার সম্পত্তি কমে যাক। তাই তাকে বাঁচিয়ে রাখার দায় মালিকেরই। তার নিজের কোনো তাগিদই নেই কাজ করার, আভ্যন্তরীন কোনো আত্মরক্ষার দায়, যা থাকে পুঁজিব্যবস্থার শ্রমিকের, কারণ সে জানে তাকে খেতে পরতে গেলে, বেঁচে থাকতে গেলে, কাজ করতেই হবে, কাজ মানেই মজুরি মানে টাকা মানে বেঁচে থাকা।

দাসের মনোপ্রক্রিয়ার উপর এই শাসনটা, এই হেজেমনিটা দাসমালিকের ছিলনা, তাই তাকে গোটা শাসনটাই করতে হত দাসের দেহের উপর। তাকে চাবুক মেরে কাজ করাতে হত। এবার চাবুক মারার লোকের মজুরি দিতে দিতেই দাসমালিক ফৌত হয়ে যাচ্ছিল। আর এত চাবুক খেয়ে দাসের মধ্যেও জন্মাচ্ছিল বিদ্রোহ। এককথায়, দুইই দাসব্যবস্থার ইনএফিশিয়েন্সি। হেজেমনি হল একটা ব্যবস্থার মধ্যে শাসনের সম্পূর্ণতা। মনের শরীরের সংস্কৃতির ভাষার চিন্তার — সবকিছুর উপর শাসন। এই হেজেমনি বা তার আকার ব্যবস্থা থেকে ব্যবস্থায় বদলাতেই থাকে। পশ্চিম ইউরোপের ক্ষেত্রে সমাজবিবর্তনের যে ছক, মানে, আদিম সাম্যবাদ থেকে দাসব্যবস্থা থেকে সামন্তব্যবস্থা থেকে পুঁজিব্যবস্থা — এই পুরোটা জুড়েই, প্রতিটি ব্যবস্থাতেই কিন্তু হেজেমনির আকার বদলেছে। (একটা কথা এখানে উল্লেখ করে রাখা ভালো, এশিয়ার সমাজবিবর্তনের সময়পথ কিন্তু স্বীকৃত ভাবেই এর থেকে আলাদা। এশিয়ার ক্ষেত্রে আমরা দাসব্যবস্থাকে সেভাবে পাইনা। আবার এশিয়ার ক্ষেত্রে আমরা এশিয়াটিক মোড অফ প্রোডাকশন বা এএমপিকে পাই, যা ইউরোপে পাইনা। যদিও পূর্ব ইউরোপের অভিজ্ঞতায় আবার পার্থক্য আছে। আছে জার্মানিক মোড অফ প্রোডাকশনের ক্ষেত্রেও। স্পেনও বেশ অনেকটাই পৃথক। যাকগে।) আজকের পৃথিবীতে তার যে শেষতম রূপ আমরা পাই তা পুঁজির হেজেমনি। আর আজকের আমাদের প্রতিরোধের বা সমাজবদলের ব্যাকরণও তার বিপরীতেই নিজেকে গড়ে তোলে। তাই আমাদের কাছে, এই মূহূর্তে, হেজেমনি মানে পুঁজির হেজেমনি।

একটা ব্যবস্থাকে যদি আমরা একটা সমগ্র বলে ভাবি, তাহলে ব্যক্তিমানুষেরা হল সেই ব্যবস্থার ক্ষুদ্রতম অংশ। এই অংশের উপর সমগ্রের শাসনের চূড়ান্ত রূপই হল হেজেমনি। এই হেজেমনি কিন্তু তার অংশগুলোর মধ্যে চারিয়ে যায় নানা কায়দার। প্রাথমিক ভাবে সেই কায়দাগুলোকে দুটো বড় ভাগে ভাগ করা যায়। পারসুয়েশন বা বশীকরণ আর কোয়েরশন বা নিপীড়ন। আমাদের একটু আগের উদাহরণটার কথা ভাবুন। দাসব্যবস্থার শাসন পুঁজির শাসনের চেয়ে অনেক অনেক কম দক্ষ। পুঁজি তার হেজেমনি রচনায় এতটাই দড় যে অনেকে তো পুঁজিব্যবস্থার আগে অব্দি হেজেমনির উপস্থিতিই মানতে চাননা। এই হেজেমনিকে দেখার আর একটা উপায় শাসিত মানুষের চিন্তাপ্রক্রিয়ার উপর শাসকশ্রেণীর শাসন হিশেবে, শাস্ত্রীয় মার্ক্সবাদ যেভাবে দেখে আর কী, তার শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে। যে ব্যবস্থায় যত বেশি কোয়েরশন সেই হেজেমনি তত কম দক্ষ, যেমন দাসব্যবস্থার চাবুকের শাসন — পুরোটাই শারীরিক — কোথাও কোথাও কিছুটা ধর্মের চাপ, মানে কাজে ফাঁকি না দেওয়া ইত্যাদি, থাকতে পারে। আবার, আমাদের চারপাশে, কোনো কথা উঠতে না উঠতেই, একবাক্যেই লোকে যখন প্রাইভেটাইজেশনের কথা, এফিশিয়েন্সির কথা এক নিশ্বাসে বলে না ফেলতে পারলে স্বস্তি পায়না, সেটা আর এক রকমের হেজেমনি। বাজেটের পরেরদিন

খবরের কাগজের পাতায় নানা রকম দেশি, বিদেশি, দোঁআশলা পেডিগ্রির প্রবন্ধ, বাজেটকে অভিনন্দন জানিয়ে, আধুনিকীকরণের প্রাইভেটাইজেশনের বন্যার এবার বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, ভাঙোওওও, সেটা কিন্তু নিপীড়ন থেকে কোয়েরশন থেকে আলাদা, সেটা পারসুয়েশন, বশীকরণ। লোকের মধ্যে এই মতামত সৃষ্টি করা, এই মতাদর্শে তাদের বশ করে ফেলা।

এবার ফিরে আসা যাক আমাদের সিন্থেটিক স্পেসের আলোচনায়। সিন্থেটিক স্পেসকে আমরা আলাদা করি সিম্পল স্পেস বা কমপ্লেক্স স্পেস থেকে — তা ওই হেজেমনির ভিত্তিতেই। মানে, হেজেমনিটাকে আমরা কীরকম মনে করছি? সেটা কি সিম্পল না কমপ্লেক্স? আবহমান মার্ক্সবাদ, যেমন বলেছি আগেই, বা আমরা সকলেই জানি, সমাজকাঠামোর গতিবিজ্ঞানকে, ডিনামিক্সকে বোঝে একটা ঋজুরৈখিক থিসিস-অ্যান্টিথিসিস-এর মডেলে। কোনো ধূসরতা নেই সেখানে। থিসিস এবং অ্যান্টিথিসিস, সাদা এবং কালো, স্পষ্ট বাইনারি বৈপরীত্য, দুই মেরুতে সন্নিহিত সম্পূর্ণ মেরুকরণের পৃথিবী। 'দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন' ভারি আবেগপ্রবণ একটি বই, রাজনীতি করার দিনগুলোয় আমরা খুব ব্যবহার করতাম তার একটা উদাহরণ, হঠাৎ লিখতে লিখতে সেটা মনে পড়ল। একটি ছাত্রর সঙ্গে একটি চাষীর তর্ক হচ্ছে, রুশ বিপ্লব তখন চলছে, ছাত্রটি চাষীটির বিপ্লবদরদী সব কথাবার্তা শুনে বলছে, 'তুমি আর কী বলছ, তোমরা তো কদিন আগে জারের হয়ে আমাদের উপর গুলি চালিয়েছো'। চাষীটি বারবার একই কথা বলে চলেছে, 'ওসব বলে কোনো লাভ নেই, হয় তুমি এ পক্ষে, নয় তুমি ও পক্ষে, আর কিছু হয় না। বলো তুমি কার পক্ষে, আমাদের না জারের?' শব্দগুলো একটু আলাদা হতে পারে, ব্যাপারটা মোটামুটি এরকমই ছিল।

একটা আপতকালীন সময়ের একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে দাঁড়িয়ে হয়ত কথাটা খুব ভুল নয়, কিন্তু ক্রমে এই বিন্দু দিয়ে বোঝার ধাঁচটা চারিয়ে যায় মার্ক্সবাদী মনোপ্রক্রিয়ার গোটা এলাকাতেই। একটা নির্দিষ্ট ভ্যারিয়েবল বা চল স্থির করে নিলাম। এবার হয় সেটা সত্যি নয় সেটা মিথ্যে, হয় আছে নয় নেই। ঠিক কম্পিউটারের সার্কিটে বিদ্যুৎ থাকা বা না-থাকার মত। যে কারণে কম্পিউটারও সবকিছু বোঝে বাইনারিতে, মানে ০ আর ১ দিয়ে। ১ যখন বিদ্যুৎ আছে, আর ০ যখন নেই। ঠিক দুটো স্পষ্ট বিপরীত মেরুতে পুরোটাকে নামিয়ে আনার এই খর্বীকরণ বা রিডাকশনিজম নিয়ে অন্যত্র প্রচুর আলোচনা হয়েছে, আর থাক। মার্ক্সবাদী লজিকে থিসিস আর অ্যান্টিথিসিসও তাই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বিশ্লিষ্ট কর্তিত দুই সত্তা। দুটো জল-অচল বর্গ, ওয়াটারটাইট কম্পার্টমেন্ট। এই লজিক মোতাবেক, হেজেমনিও প্রতিষ্ঠিত হয় এই দুই পরস্পরবিরোধী বিপরীত সত্তার ভিত্তিতে। এই কাঠামোয়, থিসিস আর অ্যান্টিথিসিস দুজনেই দুজনকে শুধুই আক্রমণ করে। নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা চালায়।

সমাজবিবর্তনের যে ছকের কথা বললাম আমরা, তার মত করে সামন্তব্যবস্থা থেকে পুঁজিব্যবস্থায় রূপান্তরকে ভাবুন। এখানে ভ্রূণ পুঁজিব্যবস্থা বা থিসিস তার অ্যান্টিথিসিস প্রাকপুঁজি সামন্তব্যবস্থাকে নিশ্চিহ্ন করে একটা পূর্ণাঙ্গ পুঁজিব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়। থিসিস অ্যান্টিথিসিসকে সম্যক বিনাশ করার পর সংশ্লেষ বা সিন্থেসিসটা হল পূর্ণগঠিত পুঁজিতন্ত্র। পুরোনো সমগ্র বা সামন্তব্যবস্থা মুছে গেল, তার জায়গা নিল নতুন সমগ্র বা পুঁজিব্যবস্থা। যে তার উপাদানগুলোকে টেনে আনল একটা নতুন হেজেমনির আওতায়। যারা এতদিন সামন্ত প্রভুর, মানে রাজা বা জমিদারের রায়ত ছিল, তারা হয়ে দাঁড়াল পুঁজিব্যবস্থার শ্রমিক। সামন্ত হেজেমনির জায়গায় পুঁজি হেজেমনি। থিসিস আর অ্যান্টিথিসিসের সম্পর্কটা এখানে দ্বিধাহীন আক্রমণের। এটা সিম্পল হেজেমনির মডেল, সিম্পল স্পেস। তার মানে, এই মডেলে, সমাজবাস্তবতায় কোনো প্রাকপুঁজি উপাদান বা এলাকা রয়ে যাওয়াটা পুঁজির হেজেমনির একটা অসম্পূর্ণতা বলে ঘোষিত হবে। একটা অপারগতা, ত্রুটি, অক্ষমতা। ধরুন, যদি দেখা যায়, পুঁজিব্যবস্থার নায়কেরা সামন্তব্যবস্থার পুরোনো প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোনো রকম একটা মিত্রতায় বা সন্ধিতে আসছে, সেটাকে আমরা এই সিম্পল হেজেমনির মডেল মোতাবেক পুঁজির একটা অক্ষমতা বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হব। এই মডেলে ওই পুরোনো সামন্ততন্ত্রের মরে যেতে না চাওয়া উপাদানগুলোকে ডাকা হবে অবশিষ্ট বলে, রেসিডুয়াল বলে, রেমনান্ট বলে। লুপ্ত হয়ে যাওয়া চেশায়ার বিড়ালের ভেসে থাকা মায়া-হাসির মত।

কমপ্লেক্স হেজেমনির মডেলে এই অক্ষমতাটা ফেরত আসে আর এক রকমের ক্ষমতার আকারে। মানে আমরা তখন আর অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটি বলে ভাবিনা, পুঁজিবিকাশের আর একটা রকম, আর একটা পথ, আর একটা উপায় বলে ভাবি। কমপ্লেক্স হেজেমনির ধারণা সিম্পল হেজেমনির তুলনায় আরো বেশি জটিলতাকে ধরতে পারে, আরো একটু গভীরতায়। এই ধারণা অনুযায়ী, সমাজবিকাশের খুব স্বাভাবিক নিয়ম মেনেই এমন অবস্থা সহজেই আসতে পারে যখন সমগ্র আর সৃষ্টি হচ্ছেনা। এ খেলা চলছে নিরন্তর — আমাদের চারপাশেই। ধরুন রাষ্ট্র বা নেশন একটা সমগ্র। সেই রাষ্ট্র গঠনের একটা ইতিহাসকে ভাবুন। আমরা জানি ব্যবসায়ীদের শ্রেণী-অবস্থান, মানে পুঁজি সে থিসিস। সে নিশ্চিহ্ন করতে চায়, অন্তত তার নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাওয়ার কথা প্রাকপুঁজি সামন্ততন্ত্রকে। অথচ, ভারতীয় রাষ্ট্রের গঠনে পুঁজি সেই পথে গেলই না, বরং সে একটা মৈত্রীর সম্পর্কে চলে এলো গ্রামে কৃষিক্ষেত্রে বিরাজমান সামন্ততন্ত্র তথা সামন্তপ্রভুদের সঙ্গে। যে পুঁজি রাষ্ট্র ঘটে ওঠার কথা ছিল, সেটা ঘটল না, তার জায়গায় ঘটানো হল পুঁজি আর সামন্ত অবস্থানের মৈত্রীভিত্তিক সারোগেট রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের বা সারোগেট সমগ্রের বাস্তবতাই কমপ্লেক্স হেজেমনি। ভারতীয় রাষ্ট্রের ইতিহাসকে যদি কেউ এইভাবে দেখে, সে আসলে হেজেমনিকে আর সিম্পল হেজেমনি হিশেবে দেখছে না, দেখছে কমপ্লেক্স হেজেমনির আকারে। প্রাকপুঁজিকে হাপিস করে দেওয়ায় পুঁজির অক্ষমতাটা তার কাছে তখন আর অক্ষমতা বলে মনে হচ্ছে না, বরং সে মনে করছে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আরো দক্ষ এবং আরো দূরদর্শী রকমে পুঁজি এই সারোগেট সমগ্র নির্মাণ করছে। সে জানে সামন্ত প্রথাকে নিশ্চিহ্ন করার সামাজিক প্রক্রিয়া এমন এক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার জন্ম দেবে যা শেষ অব্দি পুঁজিকেও অনাক্রান্ত রাখবে না। পুঁজি আর প্রাকপুঁজি মিলে এখানে একটা নতুন বর্গ তৈরি হচ্ছে — যার নাম ক্ষমতা বা পাওয়ার। সে তার নিজের সারোগেট হেজেমনিতে নিয়ে আসছে সারোগেট সমগ্রের এই রাষ্ট্রকে। এবং দেখুন, এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখা মাত্র, কৃষিক্ষেত্রে বিরাজমান ওই সামন্ততন্ত্রকে আর কিন্তু ক্রমক্ষীয়মান অবশেষ বলে ঘোষণা করা যাচ্ছেনা। সে এই জ্যান্ত রাষ্ট্রের একটা জ্যান্ত উপাদান। ক্ষমতার একটা শরিক। তাকে আর পুঁজিকে মিলিয়েই এখন নতুন রাষ্ট্রের নতুন ক্ষমতা।

সিম্পল হেজেমনির চেয়ে দেখার পদ্ধতিকে আর একটু গভীর, আর একটু জটিল করে তুলেছিল কমপ্লেক্স হেজেমনি। আমরা সেই জটিলতাটাকে আরো অনেকটা বাড়িয়ে তুলেছি আমাদের সিন্থেটিক হেজেমনির ধারণায়। কমপ্লেক্স হেজেমনির মধ্যেও দুই মেরুর ধারণা উপ্ত অবস্থায় আছে। দুটো মেরু যখন দুজনে দুজনের থেকে স্বতন্ত্র এবং আলাদাই থাকছে, শুধু শত্রুতার জায়গায় একটা বন্ধুত্বকে নিয়ে আসছে তাদের আভ্যন্তরীন সম্পর্কে। আর সিন্থেটিক হেজেমনি আর একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন রঙের কাঁচের ভিতর দিয়ে বাস্তবতাটাকে দেখায় যেখানে কোনো সাদা আর কালো পরস্পর বিপরীত মেরুই নেই। সাদা আর কালো নয়, যেখানে সবই ধূসর, কেউ একটু ঘন ধূসর, কেউ একটু ঝুঁঝকো, আবছা। যেখানে পুঁজিতন্ত্র আর সামন্ততন্ত্র দুজনেই দুজনের মধ্যে রয়ে যাচ্ছে, দুজনেই দুজনকে নির্মাণ ও নির্ণয় করছে। দুজনের স্পষ্ট আলাদা আর কোনো সত্তাই নেই আর। শুধু এই দুজন কেন, সিন্থেটিক হেজেমনির সমগ্রে প্রতিটি উপাদানই অন্য প্রতিটি উপাদানকে নির্ণয় ও নির্মাণ করে। এবং সমগ্রটাও কোনো অটুট সমগ্র নয় আর। ফাটা ভাঙাচোরা তাপ্পিমারা।

সিন্থেটিক হেজেমনির দুনিয়া ইতিমধ্যেই উত্তরআধুনিক হয়ে গেছে। সেখানে নিখুঁত কোনো সমগ্র নেই, নিখুঁত কোনো ক্রম বা হায়েরার্কি নেই, নিখুঁত কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। যেখানে অটুট সমগ্র বলেই আর কিছু হয়না। সমগ্রগুলো সবই কাজ-চালানোর সমগ্র, মানে সমগ্র না। তাদের শরীরে তালি আর তাপ্পি। তাদের চালানো হচ্ছে সমগ্র বলে। আসলে সেটা রূপকথা। মায়া। সমগ্র নামক ধারণাটাই যেখানে একটা মায়া। সেখানে মেরু নেই, সমগ্র নেই। সাদার মধ্যেই সেখানে কালো রয়েছে। পুঁজির মধ্যেই প্রাকপুঁজি। মডার্নিজমের মধ্যেই ট্রাডিশন। আধুনিকতার মধ্যেই ঐতিহ্য। এই কালোর মধ্যেই সাদা মিশে থাকার অন্য নাম অতিনির্ণয় বা ওভারডিটারমিনেশন। যে ধারণা আসলে চ্যালেঞ্জ করে কার্যকারণ বা কজালিটির সম্পর্ককেই।

কারণ কার্যকে নির্ণয় করে, এটাই কার্যকারণ সম্পর্ক। জল পড়লে পাতা নড়ে, জল পড়া হল কারণ, পাতা নড়া হল কার্য। নিটশে এটাকে প্রথম অন্য ভাবে দেখিয়েছিলেন। পাতা নড়ল, দেখলাম সেটা চেয়ে চেয়ে, আরিববাস পাতাগুলো হেভি নড়ছে তো। কিন্তু, নড়ছে কেন? পাতাদের কি আদৌ এরকম নড়ার কথা? এমনি এমনি কি নড়তে পারে? নিশ্চই না, তাহলে? ভাবতে ভাবতে ভাবতে উত্তর পেলাম, সমস্যাটা জল হয়ে গেল, জলই পড়ছে, সেই কারণেই নড়ছে। তাহলে, আমাদের যৌক্তিক অনুসন্ধানের গতিপথটা কী হল? আমরা পাতা নড়া নামক অভিজ্ঞতা থেকে, কার্য থেকে কারণে পৌঁছলাম। কিন্তু কার্যকারণ সম্পর্ক তো তা বলেনা। বলে কারণ থেকে কার্যে পৌঁছনোর কথা। যা আগে তা কারণ, যা পরে তা কার্য। তাহলে পাতা নড়া হয়ে দাঁড়াল কারণ, তার থেকে যৌক্তিক অনুসন্ধানের বিদ্যাচর্চার প্রক্রিয়ার ফলাফল পেলাম জল পড়া।

কার্যকারণ সম্পর্কের এই ঘেঁটে যাওয়াটা আসলে আর কিছুই না, আমাদের চিন্তাভাবনার জগতের চারপাশে বাস্তবতার পৃথিবীটা নিয়ত বদলে যাওয়ার থেকে আসছে। চিরাচরিত ভাবনার মডেলগুলো দিয়ে আর ভেবে ওঠা যাচ্ছেনা নিয়ত-পরিবর্তমান বাস্তবতা, কখন কোন রুমাল বিড়াল হয়ে যাচ্ছে, আবার কখন কোন বিড়াল বিড়ালের প্রিন্ট হয়ে রুমালে শোভা পেতে চাইছে তার ব্যাকরণটা নিয়ত বদলে যাচ্ছে। আবার এই ব্যাকরণটা হল আমাদের ভাবনার জগতের, বিদ্যাচর্চার, এপিস্টেমলজিকাল। তার নিয়মে আমাদের এপিস্টেম বিদ্যাভূমি বিদ্যাচর্চা চলে। বাস্তবতার, আমাদের অস্তিত্বের, অন্টলজির কোনো দায় নেই এপিস্টেমলজির নিয়মকানুনের পরোয়া করার। সে তার নিজের মত করে বদলায়। সেই বদলকে আমরা ধরার চেষ্টা করি আমাদের চিন্তাকাঠামোয়, আমাদের এপিস্টেমলজি দিয়ে। কিন্তু যে চিন্তাকাঠামোই হোক না কেন, তা তো কিছু মানুষের, কিছু সময়ের অভিজ্ঞতা। তা তো কখনোই সমগ্র নয়।

ধরুন মার্ক্সবাদ। এই চিন্তাপ্রক্রিয়াটা এই বিশিষ্ট এপিস্টেমলজিটা একটা বিরাট সংখ্যক মার্ক্সবাদী মানুষের চিন্তার অভিজ্ঞতার সম্মিলিত সমগ্র। তাদের নানা ইতিহাস, নানা ভূগোল। কিন্তু যতই বিপুল হোক সেই ভিন্নতা, তা কখনোই মোট মানুষের মোট অভিজ্ঞতার সমান না। মানবপ্রজাতির বিসমিল্লা থেকেও যদি শুরু করি আমরা, তাহলেও সেই মোট ভৌগোলিক বৈচিত্রের মোট ইতিহাসের মোট মানুষের অভিজ্ঞতার থেকে তা অনেক অনেক ন্যূন। দুই, প্রতিমূহুর্তে বস্তুজগত নতুন নতুন ঘটনা, তাই আরো আরো নতুন ঘটনার সম্ভাবনা যুক্ত করে চলেছে আমাদের সামনে। তা কখনোই চিন্তাপ্রক্রিয়ায় আনা সম্ভব না। এমনকি সেটা যদি আনা সম্ভব হত, কোনো সুপারকম্পিউটারে, তাহলেও অনেক ব্যথা থাকত সেখানে, কিছুতেই চিন্তার মডেল দিয়ে বাস্তবতাকে পুরো বুঝে ওঠা সম্ভব হত না। (এই নিয়ে বিশদ আলোচনা অন্যত্র হয়েছে, এখন আর থাক।) তাই চিন্তার মডেল দিয়ে বাস্তবতাকে বোঝার চেষ্টাটা সবসময়েই, সংজ্ঞাগত ভাবেই একটা অনিবার্য সীমাবদ্ধতায় আটকা পড়তে বাধ্য। দেখুন, তার মানেই, যত ভালো ভাবেই ব্যাখ্যা বা তাত্ত্বীকরণ করা হোক না কেন, যত বিশদ ভাবেই, তাতে ত্রুটি থাকবেই। গর্ত থাকবেই। ভাঙচুর থাকবেই। কত সহজে এই আগের বাক্যটা আমি লিখে ফেললাম এখানে, মাত্র একশো পঁচিশবার চাবি টিপেই, তার মধ্যেও উনিশবার আবার শুধু স্পেসবার, কিন্তু উনিশ কুড়ি একুশ খানা খেরেস্তান শতাব্দী জুড়েও তো গোটা মানবজাতি এটা শিখে বা বুঝে উঠতে পারল না। বা ধরুন তার আগের তিন হাজার খানা শতাব্দীও জুড়ে দিতে পারেন এর সঙ্গে, যদি ইথিওপিয়ার আওয়াশ উপত্যকায় প্লায়োসিন যুগের শেষ দিকে থাবার বদলে বুড়ো-আঙুল-সহ হাতের অস্ট্রালোপিথেসান থেকে আমরা মানব নামক শিশুর প্রথম পদক্ষেপ বলে ধরি। যার ছুড়ে দেওয়া হাড় থেকে মহাশূন্যে ধাবমান স্পেসশিপে জাম্পকাট করেছিলেন স্ট্যানলে কুব্রিক, টুথাউজেন্ড ওয়ান স্পেস ওডেসিতে, ফিল্মের ইতিহাসে বিখ্যাততম, এবং সময়ের মাপে অবশ্যই নাটকীয়তম জাম্পকাট। তাও তো নিয়তই এখনো একটা চিন্তা দিয়ে গোটা বাস্তবতাকে, সমস্ত মানুষের সমস্ত চিন্তাকে বুঝে ফেলার সাধ করে যাচ্ছে মানুষ।

অর্থাৎ, চিন্তা দিয়ে বাস্তবতাকে বোঝা যায়না। আবার বোঝা মানে তো চিন্তাই। তাই চিন্তা দিয়েই তো বুঝতে হবে। এই যে বোঝা না যাওয়ার কেলোটা এটাও তো আমরা বুঝছি চিন্তা দিয়েই। আঙ্কিক লজিকের সেই বিদঘুটে নকলে বলা যায় আমাদের সমস্যাটা এখানে একটা কার্ডের মত, যার এক পিঠে লেখা আছে, এটা দিয়ে কিছু বোঝা যায়না, আর অন্য পিঠে লেখা আছে, এটা দিয়েই একমাত্র বোঝা যায়। যদি ১নম্বরটা

ঠিক হয় তাহলে আমরা ২ নম্বর দিকটাও বুঝতে পারছি, মানে আমরা বুঝছি যে কিছু বোঝা যায়না, অর্থাৎ ১ নম্বরটা ভুল। কিন্তু বোঝা যে যায়না এটাও তো আমরা বুঝছি, অর্থাৎ ১ নম্বর ঠিক, তার মানে ২ ঠিক, তার মানে ১ ভুল, যা ঠিক হতে বাধ্য, যদি ২ ঠিক হয়।

চিন্তা দিয়ে বোঝা যায় না, আর সেটুকুও বুঝতে হয় চিন্তা দিয়েই, এখান থেকেই গজিয়েছে আমাদের বিদ্যাচর্চার এবং অস্তিত্বের পারস্পরিক সম্পর্কের সমস্ত সমস্যা। একেই আর একভাবে দেখতে চেয়ে দেরিদা বানিয়েছিলেন তাঁর দিফেঁরস নামের নামের বর্গ। যা প্রতি মুহূর্তে এপিস্টেমলজির থেকে অন্টলজির পিছলে যাওয়াটাকে চিহ্নিত করে শব্দ এবং তার অর্থের পারস্পরিক সম্পর্ক দিয়ে। একটা শব্দকে একটা অর্থে আমি ব্যবহার করলাম, লিখলাম, সেটা হয়ে দাঁড়াল অর্থের একটা কফিন। ওই মুহূর্তের আমার বিদ্যাচর্চা নিয়ত বদলাতে থাকা যে অর্থকে হত্যা করে, স্টাফ করে, প্রিজারভেটিভ দিয়ে ওই কফিনে পুরে দিয়েছে। কিন্তু, বিদ্যাচর্চার বাইরে, অস্তিত্বের জগতে সেই অর্থ কিন্তু চীৎকার করে বেঁচে আছে এবং ধ্যাড়াধধ্যাড় বদলাচ্ছে। তাই শব্দের জ্যান্ত অর্থটা শুধুই পিছলে যাচ্ছে ওই কফিনিত অর্থের থেকে। যাকগে, সে অন্য কথা।

মোদ্দা ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে, কোনো চিন্তাকাঠামোর মধ্যেই পুরোটা কখনো আসতে পারেনা। তাই সেই চিন্তাপ্রক্রিয়ায় একদম আভ্যন্তরীন কিছু গোলযোগ একদম সংজ্ঞাগতভাবেই থাকতে বাধ্য। তাই এই চিন্তনকাঠামো দিয়ে যে যে জিনিষকে যে যে ভাবে বুঝছি, তাদের মধ্যেই বহু খোঁচ রয়ে যাবে, যাবে, যাবে-ইই, যে ঘাটেই কেন নোঙর ফেলো না, সাগর তবুও ডাকবেই। যে রঙে তাদের রঙ করলাম তার মধ্যেই রয়ে যাবে তাদের বিপরীত নানা রঙ, সাদার মধ্যে কালো, কালোর মধ্যে সাদা। কারণের মধ্যেই রয়ে যাবে কার্যের গোপন উপকথা, বুঝো লোক যে জানো সন্ধান, কার্যের মধ্যেই বসবাস করবে কারণ। নিটশে তাই, হেভি প্রতিভাবান লোকেরা যেমন হয়, বেশ অনেকটা আগে থেকেই তার কার্য-কারণ-কেলেঙ্কারির মধ্যে আগামী দিনের, মানে আজকের পোস্টমডার্ন চিন্তাভাবনার কিছু মৌল উপাদান দিয়ে যাচ্ছিলেন। কার্য-কারণ সম্পর্ক নিয়ে এই আলোচনা আসলে যাকে আক্রমণ করে তা ওই রিডাকশনিজম, যার কথা আমরা আগেই বললাম, যন্ত্রের মত করে বোঝা, শুধু ১ আর ২ দিয়ে। ধূসরদের ভুলে যাওয়ার যান্ত্রিকতাকে ভাঙতে চায় এই আলোচনা। এই রিডাকশনিজম আর কিছুই না, একটু নিরাপত্তা খুঁজতে চাওয়া। বাচ্চারা যেমন করে বাবা খোঁজে, মা খোঁজে, গরীবলোকেরা খোঁজে বাবাঠাকুরদের। এমন একটা কাউকে, কিছুকে, যাকে দেখা মাত্তরই সব জলের মত সহজ হয়ে যাবে। আর কিছু খুঁজতে হবে না, আর কোনো জটিলতা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। আরো আরো জটিল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবেনা। সাদা কালো ভালো মন্দ শ্রমিক মালিক সংস্কৃতি অপসংস্কৃতি — একটা খাঁচায় ঢোকাতে পারলেই ভারি আরাম, ঝঞ্ঝাট পাকানোর আর কোনো চান্সই থাকে না।

ফোটোগ্রাফির একদম প্রাথমিক পাঠেই যেমন শেখায়, বড় কোনো ল্যান্ডস্কেপ তুলছ, ফোর গ্রাউন্ডে একটা কোনো হিউম্যান ফিগার রেখে দাও, হিউম্যান একান্ত না পেলে কোনো চেনা অবয়বের চেনা সাইজের কিছু একটা, সে ছাই একান্ত দুর্লক্ষ্য হোক, অফ ফোকাসে হোক, যেমন হোক, কিন্তু রেখো। কারণ, ওই চেনা সাইজটা, হিউম্যান ফিগারটা আমাদের মগজে একটা স্কেল ফিট করে দেবে। কতটা বড়, কতটা পরিসর, কতটা গভীরতা, তার একটা বোধ ধারণা পরিমাপ আমাদের মাথায় আপনা থেকেই এনে দেবে। প্রতিটি তত্ত্বের মধ্যেই এক একটা নিজস্ব গুরুত্বপ্রদানের মাপকাঠি রয়ে যায় — ওই তত্ত্ব কোনটাকে ভালো আর কোনটাকে মন্দ বলছে, কোনটাকে বড় আর কোনটাকে ছোট করছে। দেরিদার ডিকন্সট্রাকশন আসলে এই গুরুত্বপ্রদানের মাপকাঠিটাকে বদলে বদলে একই টেক্সট-এর আলাদা আলাদা অর্থে পৌঁছনোর চেষ্টা।

আসুন এবার ফেরত আসা যাক আমাদের সিন্থেটিক স্পেসের প্রাথমিক আলোচনায়। আমরা বলেছিলাম সিন্থেটিক স্পেস মানে যেখানে নিয়ন্ত্রণ বা হেজেমনিটাও সিন্থেটিক। মানে যেখানে শাসক এবং শাসিত, কারণ এবং কার্য দুই-ই অতিনিয়ন্ত্রিত বা ওভারডিটারমিন্ড। এই অব্দি ভাভার থার্ড স্পেসের সঙ্গে আমাদের সিন্থেটিক স্পেস এক, তবে পুরোপুরি না, সেম বাট নট কোয়াইট। আমরা এই ওভারডিটারমিনেশনকে বুঝি তার নকল বা মিমিক্রি দিয়ে। ভাভা যেমন ঔপনিবেশিক সংস্কৃতিকে বুঝেছিলেন মিমিক্রি দিয়ে — মিমিক্রি যা নকল এবং মুখ-ভ্যাংচানো দুই-ই একসঙ্গে। ভাভা ঔপনিবেশিক মানুষকে দেখেছিলেন মিমিক্রি দিয়ে,

তারা সাহেবদের নকল করে, যা তাদের আরো না-সাহেব করে, সেটাই সাহেবের সঙ্গে তার পার্থক্য গড়ে দেয়, কারণ সাহেব তো আর সাহেব হওয়ার জন্যে সাহেবকে নকল করে না। আর মুখ ভ্যাংচানোর জায়গাটা খুব সহজ করতে হলে আমাদের দেশপ্রেমের বিদেশী মডেলের কথা মনে করুন, কত বড় মুখ করে ঘরেবাইরের সন্দীপ তার প্রেয়সী বিমলাকে জানিয়েছিল, আমাদের আন্দোলনের গান, চল রে চল সবে ভারতসন্তান, লেখা হয়েছে মার্সাই গানের অনুপ্রেরণায়, তার সুরে। এই মুখ ভ্যাংচানোর প্রশ্নে আমরা পরে আবার আসব, যখন ভাভার তাত্ত্বিক বর্গগুলোর উপর লাকাঁর প্রভাবের প্রসঙ্গে আসব আমরা। এই মিমিক্রি দিয়েই আমরা আমাদের চারপাশের বাস্তবতার ওভারডিটারমিনেশনকে অতিনিয়ন্ত্রণকে বুঝি। আমরা মনে করি এই উত্তরঔপনিবেশিক পৃথিবীতে তৃতীয় বিশ্ব ঠিক সেই ভাবে ওভারডিটারমিন করেনা প্রথম বিশ্বকে যেভাবে প্রথম বিশ্ব তাকে করে। ওভারডিটারমিনেশনের তত্ত্বের মধ্যে উপ্ত যে সাম্য ধারণা তা আমাদের এই কাঠামোয় অনুপস্থিত। আমরা মনে করি, আমাদের সিন্থেটিক হেজেমনি সেইরকমই একটা শাসনকে দেখায় যেখানে প্রথম আর তৃতীয় বিশ্ব, আমেরিকা আর ভারত, তাদের দ্বিমুখী ওভারডিটারমিনেশনের প্রক্রিয়ার ভিতর পরস্পর পরস্পরের সমান, তবে পুরোপুরি না, সেম বাট নট কোয়াইট। এটাই আমাদের মিমিক্রি অফ ওভারডিটারমিনেশন। মিমিক্রি মানে একটা আসল বা রিয়াল থাকা, যার আদলে নকলে অনুকরণে মিমিক্রি তৈরি হয়। মিমিক্রি কখনোই রিয়াল বানাতে পারে না। রিয়ালের চেয়ে ন্যূন। মিমিক্রি অফ ওভারডিটারমিনেশন-ও ওভারডিটারমিনেশনের চেয়ে ন্যূন। কম। এবং পরে আমরা বিশদ আলোচনায় দেখব এই ন্যূন হওয়ার কম পড়ার খামতির বোধ থেকেই, ল্যাক থেকেই তৈরি হয় বাসনা বা ডিজায়ার, যা মিমিক্রিকে ঘটিয়ে চলে।

শুধু ভাভা কেন, উত্তরআধুনিকতার অন্যান্য ঘরানাগুলোর সঙ্গেও আমাদের অত্যন্ত প্রাথমিক একটা পার্থক্যের জায়গা এটা। উত্তরআধুনিকতার তত্ত্বগুলো তাদের সামনে প্রদত্ত সমস্ত হায়েরার্কিকে অস্বীকার করতে করতে শাসক শাসিতের হায়েরার্কিকেও অস্বীকার করে বসে। কোনো সমগ্র নেই, কোনো হায়েরার্কি নেই, তাই কোনো ক্ষমতা বা পাওয়ারের উপস্থিতিও একভাবে অস্বীকৃত হয়ে পড়ে। আর ক্ষমতা যদি না থাকে, তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধও তো থাকতে পারেনা। এর প্রাথমিক বিরাট ধাক্কা পড়ে বিপ্লবী তত্ত্বগুলোর উপরে। আন্দোলনের কোনো তত্ত্ব সংজ্ঞাগত ভাবেই অসম্ভব হয়ে পড়ে, অন্তত অনেকদূর অব্দি।

আধুনিকতা বা মডার্নিজম একভাবে মানুষের মধ্যে ফরাসী বিপ্লবের স্লোগান, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা আনতে চেয়েছিল, তার বিজ্ঞান তার পুঁজি তার রিজন দিয়ে। একটা ধনাত্মক বা পজিটিভ সাম্য। সবাই আইনের অধিকার পায় তাই সবাই সমান, সবাই শ্রমশক্তি এবং উৎপন্ন দ্রব্য বেচতে বা কিনতে পারে, তাই সবাই সবাইয়ের সমান। গত শতাব্দীর আমাদের তৃতীয় বিশ্বের তাত্ত্বিক চিন্তাজগতের দাদাঠাকুরদারা সে মাল খেয়েও গেছিলেন। তৈরি হয়েছিল এক যন্তর জিনিষ — ঔপনিবেশিক সাম্য, কলোনিয়াল ইকুয়ালিটি। (এই প্রবন্ধের একদম শেষে আমরা যাব সেই আলোচনায়) পরে, কেরমে কেরমে আমরা দেখলাম, সাম্যের নামে এ কী জিনিষ ছড়িয়েছো গুরু। এই তোমার সাম্য? পেয়াদার হাতে গদা, আর কবির হাতে ঘেঁটু? একদম উল্টো আর একটা পথে, কিন্তু সেও সেই সাম্যই, সাম্যের ধারণা — তাকে পয়দা করে উত্তরআধুনিকতা। কোথাও কোনো স্থিত ধারণা নেই, কোনো হায়েরার্কি নেই, কোনো গুরুত্বের ক্রমভেদ নেই, তাই ফলতঃ, উত্তরআধুনিক এই পৃথিবীর পথে কেহ নাই কিছু নাই গো। তাই, আমাদের কারোরই যদি কিছু স্থির সত্তা না থাকে, একটা ঋণাত্মক রকমে আবার আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের সমান হয়ে গেলাম। মডার্নিজমের পজিটিভ সাম্যের জায়গায় পোস্টমডার্নিজমের নেগেটিভ সাম্য। সমান তোমায় হতেই হবে। আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্টমডার্নতা ভারতীয়দের আর আমেরিকানদের সমান করে তবে ছাড়বে। শালা, পালাবি কোথায়? তুই সমান হবি না, তোর বাপ হবে। পজিটিভ না হলে নেগেটিভ রকমে হবে। যাবি কোথায়?

মডার্নিজমের সবকিছুকে স্থিত প্রদত্ত অনড় সংজ্ঞা দিয়ে বোঝার চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিশেবে এল স্থির প্রদত্ত এসেন্সকে অস্বীকার করা, সম্পূর্ণ অপ্রশ্নিত নিঃসঙ্কোচ অস্বীকার। এখানে আমাদের অবস্থানও অস্বীকারের, তবে পুরোপুরি না, নট কোয়াইট। রেজনিক উলফের কৌশলমূলক সারবাদ বা স্ট্র্যাটেজিক এসেনশিয়ালিজমের ধারণাকে ব্যবহার করে আমরা বলি, একটা এসেন্স তো থাকেই, নইলে তো তুমি আর

আমি গপ্পই করতে পারব না ভাই, যদি শব্দগুলোর কোনো এক ধরনের কোনো সর্বগ্রাহ্য অর্থ যদি একটুও না থাকে। একটু, ছোট করে, ব্যক্তিগত একপিস এসেন্স না থাকলে কি অভিসার ভালো লাগে ভাই, গায়ে ঘামের দুর্গন্ধ নিয়ে? তবে, একটা আত্মসচেতনতার জায়গাও তো থাকছে, আমি জানছি, আমার জামায় এটা এসেন্সের গন্ধ, আমি জানছি যে আমি কোনো অতিপ্রাকৃত কস্তুরী হরিণ নই। আমি জানছি যে আমার তত্ত্বের একটা সীমা আছে। এটা একটা ব্যক্তিগত তত্ত্ব। আরো কোনো কোনো ব্যক্তিরও, আমার মতই, এই তত্ত্বে কাজ চলে যেতে পারে, কিন্তু অন্য আর কারোর কারোর আদৌ না চলতে পারে। আমি যেখানে শ্রেণী দেখছি, ক্লাস, অন্য কেউ সেখানে ক্লাসঘরের জানলা পেরিয়ে মাঠ পেরিয়ে খালপারের বাঁশবাগানে বাঁশফুলের রাসলীলা দেখতে পারে। পারেই, হরদম পারে। এবং শুধু তাই না, আমার ক্লাসে অন্য কারুর বাঁশ থাকবেই এটা আগে থাকতে জেনে রাখাই হল এই আত্মসচেতন কৌশলগত এসেনসিয়ালিজম। তাই অন্য আর একদিক থেকে দেখলে, এটা এসেনশিয়ালিজম তবে পুরোপুরি না, নট কোয়াইট।

তাহলে, আমরা আমাদের সিন্থেটিক শাসনের ভেতরে কী পেলাম? একটা ওভারডিটারমিনেশন, যা আসলে মিমিক্রি। তাই প্রথম বিশ্ব আর তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে একটা আপাত সমানতা আছে, কিন্তু পুরোপুরি না। তাই তৃতীয় বিশ্ব একটা আছেই। উত্তরআধুনিক ওভারডিটারমিনেশনের উদ্দাম সাম্যে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় বলে আর কিছু থাকছিল না। আমাদের মিমিক্রি অফ ওভারডিটারমিনেশন আবার সেই ভিঁটেমাটি চাঁটি হয়ে যাওয়া তৃতীয় বিশ্বকে একটা মরিচঝাঁপি পুনর্বাসন দিল। রিফিউজি হোক অন্তত একটা কলোনি। সেখানে সাম্য আছে, আবার নেই-ও। রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশনের পর্চা যেটা তারা পাবে সরকারের কাছ থেকে তা জমির উপরে স্বত্ত্বই, কিন্তু আবার দলিলও তো নয়। ভারত আর আমেরিকা মনের সুখে দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবেনা ফিরে, কিন্তু কী দিবে, আর কী নিবে তার সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। প্রথম বিশ্বে তৃতীয় বিশ্ব গিয়ে হাজিরা দেবে তার শারীরিক প্রতিনিধিত্বে, তার মেটাফরে। কিন্তু, তৃতীয় বিশ্বে প্রথম বিশ্বের উপস্থিতি তার মেটনিমে। যা ক্ষীণ, লঘু, খর্বীকৃত। রবিশঙ্কর তার সেতার মেতার নিয়ে হাজিরা দেবেন আমেরিকায়, আর মাইকেল জ্যাকসনের ভিডিওই এখানে তর করে দেবে আমাদের। আমাদের অ্যাকাডেমিকদের একটা অন্তত ডিগ্রি নিয়ে আসতে হবে আমেরিকা থেকে, নিদেন দেশে থেকেই পিএইচডি করতে হবে, তাতে বিদেশের কোনো পণ্ডিতের সই লাগবে। আর আমেরিকা থেকে আসবে শুধু পেপার আর পেপার, বই, তত্ত্ব। আমাদের দেশের সঙ্গে বাণিজ্য হবে আমেরিকার, এমএনসিরা এখানে কারখানা খুলবে, মাল বেচবে, মাল কিনবে, আমাদের শ্রমিকরা তাদের শ্রমশক্তি বেচবে মোবাইল রকমে, দেশে বিদেশে। এতো বাণিজ্য সম্পর্ক, চুক্তি মেনে, দুপক্ষই দুপক্ষের সমান, তাও আমাদের সারপ্লাস পাচার হয়ে যেতে থাকবে, দেশ থেকে দেশের বাইরে। আমরা আঙুল তুলে দেখাতেও পারব না, এই বেটা চোর, কিন্তু চুরি হতেই থাকবে। আমাদের শ্রমিকরা অনেক কম খেয়ে অনেক কম শুয়ে অনেক কম মাইনেতে অনেক বেশি কাজ করে দিতে পারবে, ওদের শ্রমিকদের চেয়ে। কিন্তু তাদের এই দক্ষতার ফসল পাওয়ার কথা আমার দেশের — সেটা চুরি হয়ে যাবে, অন্য কোথা অন্য কোনো খানে কোনো সাদা চামড়ার মানুষ অনেক বেশি খাবলা মাংস খাবে তাই দিয়ে, মিসাইল বানাবে, তাও আবার তাক করা থাকবে আমাদের দেশের দিকেই। সাম্য কী জিনিষ গুরু, বাজার কী জিনিষ।

আবার এতৎ সত্ত্বেও, কোনো বর্গকে কোনো নিখুঁত বর্গ বলে চিহ্নিত করা যাবেনা। থিসিস আর অ্যান্টিথিসিস কোনো বিশুদ্ধ বিচ্ছিন্ন পরস্পরবিরোধী সত্তা নয় আর। ধরুন মডার্নিজম আর ট্র্যাডিশন, আধুনিকতা আর ঐতিহ্য পরস্পর পরস্পরের মধ্যে মিশে থাকে, দুজনে দুজনকে ওভারডিটারমিন করে এখন। সিম্পল হেজেমনির পরস্পরকে খতমের রাজনীতি তো ছেড়েই দিন, এমনকি কমপ্লেক্স হেজেমনির শর্তাধীন বন্ধুত্বের প্রশ্নও থাকছে না এখন। বন্ধুত্বের প্রশ্ন আসতে গেলেই আগে তাদের দুই বিচ্ছিন্ন সত্তা হতে হয়। এখন তো আর তারা জলনিরুদ্ধ কামরা, ওয়াটার টাইট কম্পার্টমেন্ট নয় আর। মডার্নিজমের মধ্যেই ট্রাডিশন রয়েছে, আবার ট্রাডিশনের মধ্যে মডার্নিজম। ধরুন, বঙ্কিম। বঙ্কিম যখন ঐতিহ্যকে আলোচনা করছেন, সেটা করছেন কলকাতার বিদ্বৎসমাজের জন্যে। যারা নবজাগরণের প্রোডাক্ট। তাদের চিন্তার একটা বড় জায়গাই ওয়েস্ট, ওয়েস্টার্নাইজড, পশ্চিমী। ওয়েস্টার্নাইজড মনের জন্যে। তাই গোড়া থেকেই তার

মধ্যে পশ্চিম মানে আধুনিকতা মিশে থাকছে। পরে এটা নিয়ে আরো অনেক বিশদ আলোচনায় আসছি আমরা।

## ৩।। উত্তরঔপনিবেশিক তত্ত্ব এবং আমরা

মোদ্দা কথা, ভাভার থার্ড স্পেসের সঙ্গে আমাদের সিন্থেটিক শাসনের ভূমি সিন্থেটিক স্পেসের একধরণের একটা মিল একটা আত্মীয়তা থাকলেও তারা এক নয়। তাদের পার্থক্যের জায়গাগুলো এই প্রবন্ধের পরবর্তী আলোচনায় আরো অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রাথমিক তফাত এই যে, ভাভার থার্ড স্পেসের আবহাওয়ায় ওভারডিটারমিনেশনের যে উত্তরআধুনিক সাম্য আমাদের কাছে তা আসছে ওভারডিটারমিনেশনের মিমিক্রি হয়ে। প্রত্যেকেই অতিনিয়ন্ত্রিত, কিন্তু পুরোপুরি নয়। অতিনিয়ন্ত্রণের চিকের আড়ালে থেকে যায় পুঁজি, অদৃশ্য, দৃশ্যের বাইরে। মঞ্চ জুড়ে আমরা দেখি অতিনিয়ন্ত্রণের অভিনয়, মিমিক্রি অফ ওভারডিটারমিনেশন। পুঁজির দাঁতনখ আমরা দেখতে পাইনা, তাই দেখার বেদনাও আমাদের পেতে হয়না। পুঁজি কখনোই ওই চিকের আড়াল ভেঙে তার কুৎসিত মুখটা বার করেনা, তার অতিনিয়ন্ত্রণের অভিনয়ের খেলাটা চালিয়েই যেতে থাকে। উত্তরআধুনিকতার এত সাধের অতিনিয়ন্ত্রণকে পুঁজি একটা খেলা বানিয়ে তোলে। এটা শাসনের নিয়ন্ত্রণের হেজেমনির একটা সূক্ষ্ম সুচারু ললিত প্রকার। চিকের আড়ালে যেই থাকুক তাকেই তো নূরজাহান বলে মনে হয়। আরো আরো বাসনা গজিয়ে তোলে প্রতিমুহূর্তেই। (পরে আমরা দেখব, পুঁজির শাসন আসলে হয়ে দাঁড়ায় এই সামনে না-পাওয়া থেকে তৈরি বাড়তি বাসনা দিয়ে শাসন।)

এই হেজেমনি আমাদের উত্তরআধুনিক উত্তরঔপনিবেশিক পৃথিবীর, যা দিয়ে একটা ভৌগোলিক এলাকা আর একটা ভৌগোলিক এলাকাকে শাসন করে, নিয়ন্ত্রণ করে। এটাকে ইতিহাসের চেয়েও বেশি বুঝতে হয় ভূগোল দিয়ে। সময়ের অক্ষ এখানে অনেক সময়ই ক্রিয়াশীল থাকেনা, এই অর্থে যে, ভাভা ইত্যাদিরা সময়গত ভাবে যে নাটকীয় ছেদ টেনেছেন, কলোনি আর পোস্টকলোনিতে, উপনিবেশে আর উত্তরউপনিবেশে, কলোনিতে মিমিক্রি আর পোস্টকলোনিতে সাম্য, তা অর্থহীন হয়ে পড়ে। কলোনির আর পোস্টকলোনির ছেদ আদৌ অত নাটকীয় নয়। সময়ের মাপে এই ছেদ আনাটা একান্তই যান্ত্রিক। প্রত্যক্ষ কলোনাইজার সাহেবরা আমাদের দেশের পথে ঘোড়ার গাড়ি আর না হাঁকালেও, বা তার থেকে বাঁচতে হাটে যাওয়ার পথে আতঙ্কিত নালু পালদের রাস্তা থেকে নেমে আর নর্দমায় দাঁড়াতে না হলেও, কলোনির একটা ধারাবাহিকতা কন্টিনিউয়িটি রয়ে যায়। ইছামতীর একদম শেষে নালু পাল বেশ বিরাট ব্যবসায়ী, তার বংশধররা যদি ব্যবসায় থেকে থাকে আজো, তাদেরও মেনে চলতে হয় বিদেশী পুঁজির বিদেশী বাজারের আর মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনের শাসন। এই শাসনটা চলে সাহেবদের ঔপনিবেশিক শাসনের চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম র্দুলক্ষ্য একটা রকমে। আগে যেমন আঙুল তোলা যেত — এই ইংল্যান্ড আমায় গরীব করে দিল আর ওই ফ্রান্স তোমাকে, এখন এই উত্তরঔপনিবেশিকে আর তা যায় না। একটা নামহীন শাসন আমাদের শাসন করে চলে, আমাদের সম্পদ নিয়ে যায় আমাদের হাতের বাইরে। তাদের শাসনের এই সূক্ষ্ম রকম একটা হাওয়া ছড়ায়, ওরে সাম্য আসছে, আমাদেরও এবার রাঙা সাহেবদের মত রাঙিয়ে দেবে, বাতাসে একটা মায়া নির্মাণ করে যে, আলো ক্রমে আসিতেছে, রক্তিমতা প্রভাব বিস্তার করিবে, আমরা প্রাকৃতজনেরা পুষ্পের উষ্ণতা চিহ্নিত হইব। আলোকপ্রাপ্ত হওয়ার নব নব জাগরণের সেই মায়া। কিন্তু, আসলে, এ কেবলি অতিনিয়ন্ত্রণের অভিনয়ে নতুন নতুন দৃশ্য — কলোনি যায়নি মরে আজো, তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয়।

অথচ ইতিহাসের, সময়ের সীমার এই কুসংস্কার, ইতিহাসবাদ, হিস্টরিসিজম, কী ভীষণ ভাবে রয়ে যায় উত্তরঔপনিবেশিক তত্ত্বচর্চার প্রায় প্রতিটি স্কুলেই। 'পোস্টকলোনিয়াল' এই শব্দের 'পোস্ট' অংশটা বহন করে সময়ভেদের, ইতিহাসছেদের এই নাটক — কলোনির পরে, কলোনিকে অতিক্রম করে। একটা ঘননিবদ্ধ ক্রমানুসারী সময়সারণী। ডায়াক্রনিক সিকোয়েন্স। যেখানে প্রতিটি পর্যায়কে পুরো আঙ্কিক স্পষ্টতায়, একেবারে কম্পিউটারের ০ আর ১ এর মত করে চিনে নেওয়া যাবে, আলাদা করা যাবে অন্য প্রতিটি পর্যায় থেকে। উনিশশো সাতচল্লিশের পনেরোই অগাস্ট রাত এগারোটা উনষাট মিনিট ষাট সেকেন্ড

অব্দি কলোনি, আর ষাট মিনিট মানে বারোটা থেকে পোস্টকলোনি। কোনো হেলদোল নেই এর। এই উত্তরঔপনিবেশিক তত্ত্বচর্চাগুলোয় একটা স্পষ্ট ঐতিহাসিক অতীত, কোলোনিয়াল ঐতিহ্য, আর তার থেকে একটা স্পষ্ট ছেদ — পোস্টকলোনি। উত্তরঔপনিবেশিক তত্ত্বচর্চা মানে কিন্তু একটা না, হাজার হাজার মত, প্রচুর তাদের মতভেদ মতানৈক্য, কিন্তু আশ্চর্যজনক তাদের এই নাটকীয় ঐকমত্য। কলোনি আর পোস্টকলোনি — ০ আর ১। তাদের কোনো মতপার্থক্য নেই এই জায়গাটায় যে ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য থেকে পুরো ভেঙে বেরিয়ে আসে পোস্টকলোনি সদ্য স্বাধীনতা আর সার্বভৌমত্ব পাওয়া নতুন রাষ্ট্রের মত ।

আমরা এই ছেদটাকে, এই ভেদটাকেই জেরা করছি। আমাদের কাছে এই নাটকটা আসলে নিজেদের দুঃস্বপ্নের অতীত, ঔপনিবেশিক অতীতকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা। ঝেড়ে ফেলা মানে ভুলে যাওয়া, আর ভুলে গেলেই তাকে অতিক্রম করা হয় না — খেয়াল করুন এটা। আমাদের কাছে কলোনিটা আভি আউর ইঁয়াহা, এখানে এবং এখন। নাউ অ্যান্ড হিয়ার। যাকে নোহোয়ার করে দিতে চায় পোস্টকলোনিয়াল স্টাডিজ। এখন এই একবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও। আলোচনার বৈতরনীর, বর্ডার অফ ডিসকোর্সের অন্য পারে বসবাস এই কলোনির, আলোচনার জগতে অপাংক্তেয় পরিত্যক্ত সে, আলোচনার বাইরে আউটসাইডে সে — অঘোষিত অলিখিত অবিবৃত। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, পতন হয় তাদের সাম্রাজ্যের, কলোনিরা ক্রমে নেই হয়ে যায়, সেই ইতিহাস তো আমরা সবাই জানি, উনিশশো সাতচল্লিশের পনেরোই অগাস্ট ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই পুরোনো ঔপনিবেশিক শাসনের জায়গা নেয় ক্রমে আর এক শাসন, আলোচনার শাসন, তত্ত্বের শাসন, বিদ্যার শাসন, চিন্তার শাসন। জগত জোড়া আলোচনার ভূমি জুড়ে দেখা দেয় নানা নতুন নতুন চিন্তার কলোনি, যেখানে ওই পিতৃস্থানীয় শাসক আলোচনার নিয়মগুলো নিজেদের ছোট করে নিয়ে, আপাত-দুর্লক্ষ্য করে নিয়ে, নিজেদের মেটোনিমের মধ্যে দিয়ে, চালিয়ে নিয়ে চলে তাদের শাসনের রথ। রামের চেয়ে ক্ষুদ্রতর যেমন ছিল রামের পাদুকা, ভরতকে মানে ভারতকে শাসন করত, অযোধ্যাকে (অযোধ্যাই তো ভারত, বাবরি মসজিদের পরে আপনার আর সন্দেহ আছে? আপনার থাকলেও আরএসএসের থাকবেনা, যেদিন ওরা আপনার অন্য সবকিছু ভাঙবে — মনে রাখবেন ভারতবর্ষে আজ অব্দি বচ্চনের চেয়েও জনপ্রিয় একমাত্র মানুষটিকে খুন করেছিল এই আরএসএস, আজো সেই খুনের জন্যে ওরা গর্ববোধ করে)। আর এই শাসনের বাইরে, আউটসাইডে বেঁচে থাকে তৃতীয় বিশ্ব, যার অঘোষিত ঘোষণাকে লিপিবদ্ধ করতে চায় মার্জিন অফ মার্জিন।

কিন্তু, তার মানেই তো এই যে আমরা কলোনি বলতে কী বুঝছি সেটা অন্য অনেকের থেকেই পৃথক হচ্ছে, অন্যরা যেখানে একটা নাটকীয় ছেদ খুঁজে পাচ্ছে, আমরা সেখানে একটা ধারাবাহিকতাও পাচ্ছি। তাই আমাদের কাছে 'কলোনি' ধারণাটা ঠিক কী সেটা স্পষ্ট করা যাক। আমরা কলোনিকে বুঝতে চাই তার শ্রেষ্ঠ সংস্করণে, মানে ব্রিটিশ কলোনি দিয়ে। চমকাবেন না, কলোনি হিশেবে, কলোনিকুলশ্রেষ্ঠ অবশ্যই ব্রিটিশ কলোনি, এটা স্বীকার করে নেওয়া ভালো — এমনকী শয়তানেরও তার প্রাপ্যটুকু পাওয়া উচিত। কলোনি একটা সীমানাকে সূচিত করে। একটা আলোচনাগত ভূমি, ডিসকার্সিভ স্পেস, যেখানে ক্ষমতাসীন শাসক আলোচনার স্বীকৃত এবং লিপিবদ্ধ ব্যাকরণটা বদলে যায়। তার বদলে আসে একটা বদলি বিকল্প ব্যাকরণ, বিকল্প কিছু নিয়মের প্রদর্শন। দেখা যাক এই নিয়ে জন স্টুয়ার্ট মিল কী বলেছিলেন।

> নিযুক্ত অফিসারদের কাছে প্রদত্ত প্রতিটি নির্দেশের এবং তাদের প্রতিটি ক্রিয়ার লিখিত বিবরন রাখা হয় ... ভারতবর্ষে এমন কোনো কাজ করা হয়নি যার সম্পূর্ণ যুক্তি নির্দিষ্ট ভাবে নথীবদ্ধ নেই। ভালো শাসনের জন্য এটা সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা বলে আমার মনে হয়, পৃথিবীর অন্য যে কোনো শাসনব্যবস্থায় যা আছে তার চেয়ে, কারণ আর কোথাওই এত সম্পূর্ণ একটা নথী-প্রক্রিয়া নেই।

তাই, এখানে নথী-প্রক্রিয়া সেই সিংহাসনে সমাসীন যেখানে, আদতে, পেছন ঠেকানোর কথা কলোনিয়াল শাসন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার। ঔপনিবেশিক হেজেমনিকে একখানি নবীন কদলীর কাঁদি উপহার দিয়ে সিংহাসন থেকে সরিয়ে নিজেকে এখানে গুঁজে দিচ্ছে লেখা, টেক্সট — লিখিত বিবরণ রাখার ওই পদ্ধতি। আর এই করতে গিয়ে জন্ম দিচ্ছে একপাল নতুন মেটোনিমের। ওই ঔপনিবেশিক শাসনেরই তারা মেটোনিম। কিন্তু তারা তাদের পিতার চেয়েও দড় উপনিবেশ শাসনের কাজে। কারণ এই মেটোনিমদের জন্ম হয়েছে

উপনিবেশের ভদ্রসমাজে, আলোকপ্রাপ্ত সংস্কৃতিতে। তাদের বাবারা যেখানে কলকাতার গরমে গলে যায়, কলকাতার জলে তাদের পেট ছেড়ে দেয়, এই মেটোনিমরা সেখানে কী ভীষণ কলকাতার নিজের। পুরো কলকাতার ভাষায় কথা বলে — শুনলে বোঝাই যায়না বাবাদের কথাই বলছে, শুধু ভিন্ন আর তাই দক্ষতর কণ্ঠস্বরে। খ্রীষ্টান মিশনারিরা যে কাজ করতে পারেনি, তাদের ফড়ে ব্রাহ্ম মিশনগুলো কী অনায়াসে তা করেছে। ইংরাজ মাস্টারমশাইরা হিন্দু কালেজে বেত পেদিয়ে যে খেরেস্তান ভয় ও পাপবোধ বাঙালী হৃদয়ে পয়দা করতে পারেনি, কী চমৎকার তা পেরেছে ব্রহ্মসঙ্গীত , আমাদের লাস্যময় চ্যাংড়া সেক্সি ঈশ্বর ত্রিভঙ্গমুরারিকে সোয়াপ করা হল, বদলে ফেলা হল একজন পেয়াদা ঈশ্বরে, রক্তচক্ষু দোর্দণ্ডপ্রতাপ পর্যবেক্ষক শাস্তিদাতা। যাইহোক, এসব কথায় পরে আসছি।

অর্থাৎ, একটা মসনদ বদল হল। নবজাগরণ এনলাইটেনমেন্টের হেজেমনির জায়গায় এলো তারই সব উপগ্রহেরা, মানে মেটোনিমেরা, তার বদলিরা। কিন্তু এই বদলের একটা সুদূরপ্রসারী ফলাফল থাকার কথা। কোলোনাইজার লর্ড মানে ঔপনিবেশিক প্রভুর আমলে সবকিছুর একটা সোজাসাপ্টা দিক ছিল, বাঘকে স্পষ্ট হলুদ কালোতে চেনা যেত বাঘ বলে, আবার গরুকেও খুঁজে পেতে অসুবিধে হত না। ওই জন স্টুয়ার্ট মিলের নথীতে যেমন, সবকিছুরই সাদা-কালো অক্ষরে একটা পরিচয় ছিল। ইংরাজশাসনের 'আন্ডার দি সুদিং ইনফ্লুয়েন্স অফ দি বিগ রড' ('দোর্দণ্ডশাসনের সুশীতল ছায়ায়' — অনুবাদ রাজশেখর বসু) বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাওয়াকালীনও ঘাটের কেরানি কাম হিসাবরক্ষক তার তালিকায় বাঘের দাগ বাঘের ঘরে আর গরুর দাগ গরুর ঘরেই মারত। সবকিছুই নজরে থাকত ইংরাজ প্রভুর। তার দৃষ্টির, অবেক্ষণের, গেজ-এর, প্যানঅপ্টিকনের তলায়। তার লিপিলিখনও চলত, রেকর্ডেশন, নিখুঁত বাঘ গরু আর নেটিভের সুমারি। তাই, সদাসর্বদাই, কলোনিকে, নেটিভদের কালো মাতৃভূমিকে, শ্যামা মাকে, গোপনে হৃদয়ে রেখে চলতে হত ইংরাজ প্রভুদের। কলোনিকে ভোলার কোনো উপায় ছিল না, তার শাসনের, দৃষ্টির, সংস্কারের সীমাকে। তার সকল সভ্যতা ও সৌজন্য যেখানে ভেঙে পড়ত। ঔপনিবেশিক শাসনজনিত নিজের পাপবোধকে ভোলার উপায় ছিলনা। সদাজাগ্রত সেই পাপবোধ ভোলার চেষ্টায় ঔপনিবেশিক প্রভুর আমদানি করতে হয়েছিল 'সাদা মানুষের দায়' — হোয়াইটমেনস বার্ডেন-এর ধারণা। যা দিয়ে সে যুক্তি তৈরি করত, র‍্যাশনালাইজ করত নিজের সেই ব্যবহারকে — নিজের সংবেদনশীলতা দিয়েই যাকে মানাতে অসুবিধা হত তার। যদি এটাকে বোকা কালো হিদেন নেটিভদের অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসার দায়িত্ব বলে ভাবা হয়, একটা পবিত্র কর্তব্য বলে, তাতে নিজের কাছেই নিজেকে একটু স্বাভাবিক লাগে বৈকি।

এবার, আমাদের সঙ্গে অন্যান্য উত্তরঔপনিবেশিকদের পার্থক্য এই যে আমরা এই পোস্টমডার্ন পোস্টকলোনিয়াল পৃথিবীর পোস্টকলোনিগুলোকে দেখতে চাইছি আর এক রকমের উপনিবেশ বলে, শুধু ওই নথী আর রাখা হচ্ছেনা। নথীহীন বিবরণহীন অলিখিত অঘোষিত কলোনি।

তাই বদল ঘটে গেছে কলোনিয়াল প্রভুর ওই উদ্ধত ভোঁতা নেপালী ভোজালির মত স্পষ্টতাতেও। কলোনিকে, তার অস্তিত্বকে, বেমালুম ভুলে যেতে পারে, ভুলে যায়, উত্তরআধুনিক পৃথিবীর নয়া প্রভুরা। তাদের লিখনে, তাদের নথীতে, তাদের আলোচনায়, তাদের ডিসকোর্সে শর্তহীন শব্দহীন স্মৃতিহীন শ্রুতিহীন অবলোপ ঘটে কলোনির। কলোনি বেচারাই তো নেই আর, তার ঘাটে পরঘাটায় আঘাটায় বাঘ গরু আর ব্যাঙাচির হিশেব কেন আর রাখতে যাবে? জন স্টুয়ার্ট মিলের ওই নথীবদ্ধতার শাসনতন্ত্রকে যদি আমরা ব্রিটিশ কলোনি বলে ডাকি, তাহলে পোস্টকলোনিকে ডাকতে পারি অব্রিটিশ কলোনি, আর এক রকমের কলোনি, উপনিবেশেরই আর একটা রকমফের। তখন উত্তরউপনিবেশ আর কোনো নাটকীয় ছেদ থাকেনা, হয়ে দাঁড়ায় উপনিবেশেরই একটা উত্তরআধুনিক প্রকার। একটা আলোচনাগত ভূমি, ডিসকার্সিভ স্পেস, যেখানে কলোনিগুলো স্মৃতি থেকে বহিষ্কৃত হল, অবরুদ্ধ হল, গুম হল অনালোচনায়, নিষ্পেষিত হল বিস্মৃতির ভারে।

কিন্তু, আমরা তো জানি প্রতিটি অবরুদ্ধের, নিষ্পেষিতেরই পুনরাগমন হয়, রিটার্ন অফ দি রিপ্রেসড, সে ফেরত আসা বিস্মৃতির গহ্বর থেকে। ফিরে আসে ওই অবরোধের নিষ্পেষণের সিম্পটম হয়ে। আমাদের

তৃতীয় বিশ্বকে আমরা দেখি এইরকম এক সিম্পটম বলে, উত্তরআধুনিকতার আলোচনায় বহিষ্কৃত সংগুপ্ত কলোনিদের সিম্পটম — এটাই পোস্টকলোনি।

এটা খুব স্পষ্ট যে পোস্টকলোনি বিষয়ে আমাদের এই ধারণাটা চালু উত্তরঔপনিবেশিক তত্ত্বচর্চা থেকে বেজায় আলাদা, বা বেধড়ক আলাদা আমাদের তৃতীয় বিশ্বকে দেখার এই কিসিম। কিন্তু মাল আলাদা হলে মালের কৌটোও তো আলাদা করতে হবে। উত্তরঔপনিবেশিক তত্ত্ব বেচার আমাদের এই ঠোঙার নাম মার্জিন অফ মার্জিন।

## ৪।। কেন্দ্র ও পরিধি

'মার্জিন অফ মার্জিন' শব্দবন্ধটাকে একটু ভেঙে ভাবুন। 'মার্জিন' বা 'পেরিফেরি' বা 'পরিধি' ব্যাপারটার এই পোস্টকলোনিয়াল তত্ত্বের বাজারে একটা আলাদা অর্থ আছে। সেন্টার-পেরিফেরি বা কেন্দ্র-পরিধি মডেল অনেকগুলো আছে চারদিকে, যেখানে মার্জিন বা পেরিফেরি একটা চালু ধারণা। এই সেন্টার-পেরিফেরি মডেলগুলো, একভাবে দেখলে, একটা ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য। এই যে নানা আলাদা আলাদা কায়দায় পেরিফেরিকে বোঝা হয়, তার সবগুলোই কোনো না কোনো ভাবে কলোনিরই একটা ধারাবাহিকতা, কলোনিরই একটা রকমফের। শুধু চারপাশের বাস্তবতাটা যেখানে বদলে গেছে, অভ্যস্ত অর্থে যখন আর কোনো কলোনি নেই কোথাও, সবই এক একটা সার্বভৌম স্বাধীন দেশ। এই উত্তরঔপনিবেশিক পরিপ্রেক্ষিতে, তাই, সঠিক অর্থে কলোনি তো থাকতে পারেনা। যা থাকে তাকেই বোঝার জন্যে সেন্টার-পেরিফেরি মডেলগুলোয় পেরিফেরি বা মার্জিন-এর ধারণাটাকে আনা হয়। ভারত বা পাকিস্থান বা নাইজেরিয়া তো, ছাই স্বাধীন হোক আর সার্বভৌম, ব্রিটেন বা আমেরিকা বা ফ্রান্স হতে পারেনা। কেন্দ্র হতে পারেনা, ম্যাক্সিমাম যা পারে তা ওই পরিধি বা পেরিফেরি হতে। কিন্তু, সেন্টার পেরিফেরি মডেলের তত্ত্বগুলো বেজায় সারবাদ বা এসেনশিয়ালিজমে আক্রান্ত। আর এম্পিরিসিজম। অভিজ্ঞতাবাদ।

অভিজ্ঞতাবাদ নিয়ে অন্যত্র অনেক আলোচনা করেছি। ধরুন, চ্যাংড়ামি করে বলা যায়, চূড়ান্ত অভিজ্ঞতাবাদী হল সে-ই যে পরপর দুদিন খবরের কাগজে দুটো 'ফুটপাথ ধরে যেতে যেতে লরির চাকায় পথচারীর মৃত্যু' পড়ার পর ফুটপাথ ছেড়ে মাঝরাস্তা দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। এম্পিরিকাল এভিডেন্স দিয়ে বাস্তবতাকে বুঝতে যাওয়ার সমস্যাটা থাকে এইখানে, যখন কেন ঘটছে সেটা না ভেবে শুধু ঘটাটাকে দিয়ে আমরা গোটাটাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি। অভিজ্ঞতায় আমি দেখছি, ইয়ে আজাদি সত্যিই অনেক জায়গায় ঝুটা হ্যায়, তার মানে, এককথাতেই আমি ধরে নিলাম, কলোনি ঠিক একই ভাবে রয়েছে। শুধু একটু রিফাইন্ড হয়েছে, একটু পরিশীলিত হয়েছে মাত্র। খাড়া করে ফেললাম আমার সেন্টার-পেরিফেরি মডেল। তাতে পরিস্কার বুঝিয়ে দিলাম, ওই রিফাইনমেন্টকে বা রেয়ারিফ্যাকশন বা খর্বীকরণ-লঘুকরণ দিয়ে সামান্য একটু বদলে নিয়ে আদতে কলোনাইজার কলোনি একই রকমে রয়েছে, তার নাম দিলাম সেন্টার এবং পেরিফেরি। কলোনি ঠিক আগেকার মত নেই, মাইল্ড বদলেছে বৈকি, একটু খর্ব হয়েছে লঘু হয়েছে তার কলোনিত্ব, তাই তার নাম দিয়েছি মার্জিন। এই মডেলে তাই, একটা সারবাদী এসেনশিয়ালিস্ট রকমে, তাদের কলোনাইজার এবং কলোনি বলেই ভাবছি, তাদের আর কোনো মাত্রাকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হচ্ছি। কলোনির মধ্যেই যে কলোনাইজার এবং উল্টোয় উল্টো, মানে কলোনাইজারে কলোনি মিশে থাকতে পারে, সেন্টার এবং পেরিফেরি যে পরস্পরকে ওভারডিটারমিন করতে পারে সে কথা বেমালুম ভুলেই যাওয়া হচ্ছে। উত্তরঔপনিবেশিক সংস্কৃতিবিদরা, কালচারাল স্টাডিজওয়ালারা যে তীব্র খার এবং হিংস্রতার সঙ্গে এসেনশিয়ালিজমকে আক্রমণ করেছেন, বারবার, সেটা একটুও অপ্রযুক্ত লাগেনা যখন এই সেন্টার-পেরিফেরি মডেলগুলোর যান্ত্রিকতা মাথায় আসে।

একগুচ্ছ পোস্টকলোনিয়াল স্টাডিজ-এর কাজ সেন্টার-পেরিফেরি মডেলের 'সেন্টার' এবং 'পেরিফেরি' ধারণার এই বাইনারি অপোজিশন বা দ্বিমুখী বৈপরীত্যের তীব্র বিরোধিতা করেছে। এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। একটা পরিবর্তিত বাস্তবতায়, যাকে আমরা ডাকতে পারি অতিনির্ণীত বা ওভারডিটারমিন্ড বলে, তার তলে এই সেন্টার এবং পেরিফেরির জটিল আন্তঃসম্পর্ককে বোঝার চেষ্টা করেছেন বেশ কিছু উত্তরঔপনিবেশিক

তাত্ত্বিক। এরা কেউই, ধরুন ভাভা বা এস্কোবার বা আপ্পাদুরাই, সরাসরি ওভারডিটারমিনেশনের নাম করেননি। কিন্তু যে সমাজ বাস্তবতাকে ভাভা ধরার চেষ্টা করছেন তা স্পষ্টই অতিনির্ণীত ভূমি। হয়ত এর একটা কারণ এই হতে পারে যে ওভারডিটারমিনেশন-এর সঙ্গে এদের ঘরানাগত আত্মীয়তা তো দূরের কথা, বরং শত্রুতা থাকারই বেশি সম্ভাবনা। ওভারডিটারমিনেশন এসেছে আলথুসের থেকে, যে বেচারা তার বংশলতিকার ছত্রে ছত্রে মার্ক্সবাদী ইতিহাসে আচ্ছন্ন। বা তারপরেও যারা সরাসরি নাম করে ওভারডিটারমিনেশন-এর কথা বলেছেন তারা প্রায় প্রত্যেকেই কোনো না কোনো ভাবে মার্ক্সবাদের বা নিদেন সমাজবদলের লড়াইয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর পোস্টকলোনিয়াল তাত্ত্বিকদের সঙ্গে, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই, মার্ক্সবাদের খুব দূর সম্পর্ক। কারণ তারা চালু মার্ক্সবাদের এসেনশিয়ালিস্ট ফ্যাসিস্ট অবস্থানগুলোকে কিছুতেই মানতে পারেননি। তাদের কাছে সমাজবদলের লড়াই-এর ধারণা বরং পরিত্যাজ্য লেগেছে, এই কেন্দ্রিকতার চেয়ে, সত্যের একমেবাদ্বিতীয়ম ব্যাখ্যা মেনে নেওয়ার চেয়ে। এটা উত্তরআধুনিকতার একটা প্রাথমিক জায়গা। তারা তত্ত্ব তথা সত্য তথা দৃষ্টিভঙ্গীর বহুবচনতায় বা প্লুরালিটিতে বিশ্বাসী।

এই পোস্টকলোনিয়াল তাত্ত্বিকরা যেই সেন্টার-পেরিফেরি মডেলগুলোকে টেনে এনেছেন একটা ওভারডিটারমিন্ড ভূমিকে, খুব স্বাভাবিক ভাবেই, তাদের সব কাম তামাম হয়ে গেছে। এই ভূমিতে সেন্টার এবং পেরিফেরি দুজনেই দুজনকে ওভারডিটারমিন করে (যদিও তাদের মধ্যে নানা দ্বন্দ্বও আছে)। ফলে, সেন্টার আর পেরিফেরি বা মার্জিন দুজনেই নিজের চারপাশে ছড়িয়ে গেছে অনেক উদ্বৃত্ত অর্থে। যা হয় অতিনির্ণয়ে। কোনো ঋজুরেখ একমাত্রিক অর্থ আর থাকেনা। এই উদ্বৃত্ত অর্থ বা সারপ্লাস মিনিং নির্মিত হওয়া মানেই তাদের আবহমান প্রদত্ত অর্থগুলো, যে অর্থগুলো নিয়ে মডেলগুলো কাজ করতে শুরু করেছিল, তাদের একটা ইরেজারের নিচে চলে আসা, মুছে যেতে থাকা, বদলে যেতে থাকা। টিনএজ প্রেমিকাটি তার প্রেমিককে, মেট্রোর বদলে বাসে চড়ে জমানো পয়সায় একসেট ওল্ড স্পাইস রুমাল কিনে দিল, এমনকী দেওয়ার পর একটা দশ পয়সা নিয়েও নিল, কে না জানে, রুমাল দিলে ঝগড়া হয়, কিন্তু বিক্রি করলে তো হয় না। প্যাকেটটা থ্যাংকইউ সহ ব্যাগে রাখার পরই ব্যাগটা উঠল কিলবিল করে, ডেকে উঠল মিয়াও, রুমালেরা সব বেড়াল হয়ে গেছে।

আদত প্রদত্ত প্রাথমিক অর্থরা বদলে যাওয়া মানেই মার্জিনও সেই সাবেক সারবাদী রকমের মার্জিন আর রইল না। তার সেই এসেনশিয়ালিস্ট অর্থ মুছে গেল। মার্জিন আর মার্জিন রইল না, যেমন ওই ওল্ড স্পাইস প্যাকেটে আর কোনো রুমাল ছিল না। আবার এই তো সেই বিড়াল যা দিয়ে একটু আগেই মুখ মোছা যেত, সেই ইতিহাসটাই বা যাবে কোথায়? তাই, শেষ অব্দি রুমাল বা বিড়াল কেউই রইল না, যা রইল তা মার্জিন নামের একপিস শূন্যতা, শূন্যস্থান। এসেনশিয়ালিস্ট সেন্টার-পেরিফেরি মডেলের মার্জিন এই নতুন ওভারডিটারমিন্ড মডেলে বড়জোর একটা শূন্যতা হয়ে বেঁচে রইল। গায়ত্রী স্পিভাক এইরকম বিষয়ী সংস্থান, সাবজেক্ট পজিশন, নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার 'ক্যান দি সাবঅল্টার্ন স্পিক?' প্রবন্ধে (আমরা এই অনুষ্টুপের পাতাতেই, নিরানববই-এ, তা নিয়ে প্রচুর আলোচনা করেছি : ডিকন্সট্রাকশন ডিকলোনাইজেশন)। খাবলা খাবলা শূন্যতা, ফাঁক, গ্যাপ যাতে ইতস্তত ছড়ানো — স্পিভাকের আলোচ্য এই বিষয়ী বা সাবজেক্ট অবশ্য নিতান্তই পশ্চিমের, অক্সিডেন্টাল। ভাভা তার 'দি লোকেশন অফ কালচার' বইয়ে আলোচনা করেছেন তার 'ইন-বিটুইন' বা ত্রিশঙ্কু বিষয়ী অবস্থান নিয়ে, যে সাবজেক্ট পজিশনগুলো না ঘরকা না ঘাটকা, ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলে আছে স্বর্গ আর মর্ত্যের মাঝামাঝি। ভাভা সেই পদ্ধতিটার নাম দিয়েছেন 'নেগোসিয়েশন', দর-কষাকষি, যার মাধ্যমে এই ত্রিশঙ্কু অবস্থানগুলোয় আমরা পৌঁছই। যে দুটো অবস্থানের মধ্যে এই দর-কষাকষিটা চলে তাদেরই একসময় ডাকা হত 'সেন্টার' আর 'পেরিফেরি' বলে, বা 'মেট্রোপলিস' এবং তার 'কলোনি' বলে।

নিশ্চিতভাবেই, ভাভা তার সেন্টার-পেরিফেরি পূর্বসূরীদের চেয়ে বেশ কিছুটা উন্নত। তার আলোচনায় যে 'পেরিফেরি' বা পরিধি-ধারণা কাজ করছে তা কলোনিরই একটা এডিশন — একটা খর্বীকরণ লঘুকরণ ঘটা, রেয়ারিফ্যাকটেড সংস্করণ। এই খর্বীকৃত কলোনি এবার আরো ক্ষীণ এবং দুর্লক্ষ্য হয়, আরো রেয়ারিফ্যাকটেড, যখন সেই ক্ষীণতনু কলোনি মুখোমুখি হয় তার কলোনাইজার প্রভুর, সেই প্রভুও ভারি

ক্ষীণ এবং খর্ব হয়ে গেছে, তার পুরাতন গেঞ্জি এখন শুধু যে পাঞ্জাবি হয়ে গেছে তাই নয়, সেটা পরলে আর পায়জামাও পরতে হচ্ছে না। এই 'কী-ছিল-কী-হয়েছে' কলোনি এবং কলোনাইজার যখন পরস্পর অতিনির্ণয়ে আসছে তখনই গজিয়ে উঠছে এই ত্রিশঙ্কু বিষয়ী অবস্থানগুলো। অর্থাৎ, সেই অর্থে এই পেরিফেরি বা মার্জিন আর থাকছেই না, যেমন থাকছেনা তাদের আবহমান কলোনাইজার প্রভুরা। এই জায়গাটা খেয়াল করুন, ভাভার মডেলে আর কোনো সেন্টার বা মার্জিন থাকছেনা। তাই তাদের মধ্যে কোনো বশ্যতা আর থাকছে না (কিন্তু আমাদের মডেলে থাকছে)।

এই নতুন অবয়বের সেন্টার-পেরিফেরি মডেলগুলোকে আমরা অস্বীকার করি। এবং এদের এই লুপ্ত মার্জিনকে আমরা নতুন করে এঁকে দিই, নতুন করে চিহ্নিত করি আর একটা নতুন রকমের পরিধিকে, মার্জিনকে। পুরোনো কলোনি যেখানে স্থানান্তরিত হয়েছে, ডিসপ্লেসড হয়েছে এই উত্তরআধুনিক উত্তরঔপনিবেশিক বাস্তবতায়। (এই স্থানান্তরিত হওয়ার, ডিসপ্লেসমেন্ট-এর ধারণাটাকে আলথুসের এনেছিলেন রাজনৈতিক অর্থনীতির আলোচনায়, ফ্রয়েডের স্বপ্ন-সংক্রান্ত তত্ত্ব থেকে তুলে, যেখানে ধরুন, স্বপ্নে আমি চারদাঁতের লুপ্ত বন্য হাতি ম্যামথকে দেখলাম, এবং একই সঙ্গে খুবই উল্লাস হল দেখতে দেখতে, আসলে আমি দেখলাম আমার ছেলে মহম্মদকে, যার নাম, যেভাবে আমি বলি, মমদ, তাতে ম্যামথের সঙ্গে ধ্বনিগত মিল প্রচুর, এটা একটা স্থানান্তরণ ঘটল — প্রাগৈতিহাসিক হাতিতে আমি আসলে আমার ছেলেকে দেখলাম, তাই ওই উল্লাস। অন্যত্র এই স্থানান্তরণ নিয়ে আমরা প্রচুর আলোচনা করেছি।) এখানে, এই স্থানান্তরণে, একটু আগেই যেটা আমরা বলেছি, মূল শাসক আলোচনার, পিতৃস্থানীয় আলোচনার, বর্গগুলো, ধারণাগুলো বদলে গেল, অভিযোজন ঘটল তাদের, নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে গিয়ে। এখানে কলোনি এবং কলোনাইজারেরও তাই ঘটেছে — তৃতীয় বিশ্বে এবং প্রথম বিশ্বে। পুরোনো বর্গ আর ধারণা দিয়ে এই নতুন উত্তরআধুনিক ক্ষমতাকে আর চেনা যাবেনা, তার জন্যে লাগবে নতুন ধরনের বর্গ, যুক্তি, ব্যাখ্যা।

এবং, এই নতুন বর্গগুলোর খোঁজে বেরিয়ে পড়ার সময় আমরা আমাদের দৃষ্টিকে ফোকাসিত করে নিতে চাইছি একটা নির্দিষ্ট জায়গায়। মূলত আমাদের এনআরআই ভগিনী ও ভ্রাতাদের আলোচনায়। এনআরআই তো আজ সব দিক থেকেই ভারি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। ডলারের চেয়ে বড় গুরু আর কে আছে। এবং শুধু ডলার না, ডলার তো আরো ডলার হয়ে ওঠে টাকার সাপেক্ষেই। কাঁটাকলের আড্ডায় কল্যাণদা যেমন বলত, 'ডলারে রোজগার করে ডলারে খরচ করলে হবেনা ... এদেশে চলে আসতে হবে, খরচ করতে হবে টাকায়'। গরীব দেশ ভারত তো তার টাকার অবমূল্যায়ণ করে রাখবেই, যাতে দেশের লোক আমেরিকান জিনিষ কম কেনে, এবং আমেরিকানরা দেশের জিনিষ বেশি কেনে। সেই অবমূল্যায়িত টাকার কৃপায় ওদেশের ডলার এদেশে এনে খরচ করা মানেই ম্যাজিক। এনআরআই ইনভেস্টমেন্ট মানে ম্যাজিক, তা ইন্ডাস্ট্রিতে হোক, আর তত্ত্বে। এখানে সেই ম্যাজিকময় তাত্ত্বিকদের তত্ত্বে আমরা আমাদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করছি। এরা কিন্তু একা বোকা একলা নয় কেউই, এদের একটা আত্মীয়তা আছে, অবস্থানগত, এবং তার ভিত্তিতে নির্মিত একধরনের একটা প্রতিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠানও আছে। সারা গ্লোব জুড়ে, এই গ্লোবাল পৃথিবীতে, তাদের প্রতিপত্তির তন্তুজাল। তাদেরই সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রতিনিধি, বোধহয়, হোমি ভাভাকে আমরা বেছে নিচ্ছি আমাদের আলোচনায়, এই পুরো এনআরআই তাত্ত্বিক উপজাতির প্রতিনিধি হিশেবে।

যেমন আগেই বলেছি, ভাভার তত্ত্বের মূল একটা ধারণা 'থার্ড স্পেস' যা নির্মিত হয়েছে বিভিন্ন 'ইন-বিটুইন' বা ত্রিশঙ্কু সাংস্কৃতিক বর্গদের নিয়ে। ভাভার তত্ত্বে এই বর্গগুলো পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কে আসে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার নাম 'সাংস্কৃতিক পার্থক্য' (কালচারাল ডিফারেন্স)। এটা কিন্তু একটা উত্তরআধুনিক বর্গ, মানে কোনো সারবাদী প্রদত্ত অর্থ নয়। একে ভাভা আলাদা করছেন আর একটা প্রক্রিয়া থেকে যার নাম 'সাংস্কৃতিক বৈচিত্র' (কালচারাল ডাইভার্সিটি)। এই কালচারাল ডাইভার্সিটি কিন্তু সেই পুরোনো সারবাদী এসেনশিয়ালিস্ট প্রক্রিয়া। অর্থাৎ, ভাভা সাংস্কৃতিক পরিচিতি বা আইডেন্টিটি তথা গোটা সাংস্কৃতিক বাস্তবতাটাকে দেখতে বলছেন সারবাদী রকমে নয়, উত্তরআধুনিক রকমে, 'ডাইভার্সিটি' নয় 'ডিফারেন্স' দিয়ে। (একটু বাদেই আমরা আসছি এগুলো নিয়ে স্পষ্ট আলোচনায়। ) আর এই পরিবর্তিত

দেখা দিয়েই বুঝতে হবে ভাভার 'থার্ড স্পেস'-কে। এই থার্ড স্পেস গজিয়ে ওঠে একটা পারস্পরিকতার ভিত্তিতে। শাসক পাশ্চাত্য আলোচনা, ওয়েস্টার্ন ডিসকোর্স, আর তার মুখোমুখি তার অপর, আদার — এই পারস্পরিকতা যখন ঘটে তখনই এই তৃতীয় ভূমি বা থার্ড স্পেস নির্মিত হয়। উত্তরঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এরা কিন্তু আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন বিশ্লিষ্ট শুদ্ধ সত্তা নয় আর, দুজনেই দুজনকে অতিনির্ণয় করছে — পাশ্চাত্য পিতৃ-ডিসকোর্স এবং তার অপর। তাই, পিতৃ-ডিসকোর্সের আলোচনাগত বর্গ বা ডিসকার্সিভ ক্যাটিগরিগুলো, অতিনির্ণয়ের কারণে, নিজেদের অভ্যস্ত প্রদত্ত অর্থকে ছাপিয়ে উপচে পড়ছে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে। তারা কুড়িয়ে নিচ্ছে নতুন নতুন উদ্বৃত্ত অর্থ, সারপ্লাস মিনিং। যে সব উদ্বৃত্ত অর্থগুলো এবার ঘনীভূত হচ্ছে, কনডেন্সড হচ্ছে, জমা হচ্ছে — ভাভা যাকে ডাকছেন 'ইন-বিটুইন' বর্গ বলে — যে বর্গ দিয়ে তৈরি ভাভার থার্ড স্পেস। এই অব্দি ভাভার যুক্তিনির্মাণ নিয়ে আমাদের কিছুই বলার নেই, যদি মোট উত্তরঔপনিবেশিক বাস্তবতার একটা খণ্ড অংশে আমরা আমাদের মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করি।

আমাদের আপত্তিটা তৈরি হচ্ছে অন্য জায়গায়, যাকে বোঝানোর জন্যে আমাদের সিন্থেটিক স্পেস-এর ধারণাকে আমরা এখন ব্যবহার করব। যেমন বলেছি, আমাদের সিন্থেটিক স্পেসের সঙ্গে ভাভার থার্ড স্পেসের মিল প্রচুর। কিন্তু ভাভা তার 'থার্ড স্পেস' ধারণাকে তুলে রাখছেন শুধুমাত্র পোস্টকলোনির জন্যে। কলোনির জন্যে ভাভার মেনু একদম পৃথক। (পার্থক্যের জায়গাগুলোয় আসছি একটু পরে।) কিন্তু, আমাদের চোখে ভাভার ওই 'থার্ড স্পেস' ধারণাটি পোস্টকলোনিতে যেমন, তেমনি একইভাবে প্রযোজ্য কলোনির ক্ষেত্রেও। যদিও, থার্ড স্পেসের অস্তিত্বের এবং কাজের নিবিড়তাটা অবশ্যই পোস্টকলোনির ক্ষেত্রে অনেকটাই বেশি। কিন্তু, খেয়াল করুন, তফাৎটা গুণগত নয়, পরিমাণগত। তাহলে, ভাভার দৃষ্টি এটা এড়িয়ে গেল কেন? কেন তার নিজেরই তাত্ত্বিক বর্গ 'থার্ড স্পেস' তিনি নিজেই কলোনির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে উঠতে পারলেন না? উত্তরটা, বোধহয়, খোঁজার প্রয়োজন পড়ে এনআরআইদের মন ও মননে। ভাভার এই আংশিক তাত্ত্বীকরণের মধ্যে, বোধহয়, নিহিত থাকে একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের স্বার্থ, বা ঠিক স্বার্থ না, একধরনের একটা আত্মগরিমাবোধ। সাহেবের মুখোমুখি কলোনির নেটিভ ভারতীয় ছিল ভৃত্য, এতো সবাই জানে, কিন্তু এখন আর কলোনি নেই, আমরা পরবাসে সাহেবদের সঙ্গে মুখোমুখি, কিন্তু আমরা আর ভৃত্য নই, যদিও আমাদের কলোনিয়াল বাপ-ঠাকুরদারা তাই ছিল। নিজেদের আত্মসম্মানবোধ থেকেই, বোধহয়, এই এনআরআই তাত্ত্বিকদের একটা নাটকীয় পার্থক্য গড়ে তুলতে হয় কলোনি আর পোস্টকলোনির মধ্যে। ভাভা তাই কলোনির সদ্য-আলোকপ্রাপ্ত নবজাগরণে কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে চোখ কচলাতে থাকা মানুষের মধ্যে, ইয়ং-বেঙ্গল-এনলাইটেন্ড মানুষের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছেন মিমিক্রিকে। সেই মিমিক্রি কিন্তু, কী বিচিত্র, হঠাৎ, পোস্টকলোনিতে এসে উবে যাচ্ছে। না বলে কোনো উপায় নেই, এটা একধরণের আত্মগোপনের খেলা, উটপাখি বালিতে মুন্ডু গুঁজে দিল, তার চোখে আর বিপদ নেই, তাই, বিপদ তো আর নেই-ই। এতে করে ভাবের ঘরে চুরি করা যেতে পারে, নিজের সঙ্গে চোখ ঠারা যেতে পারে, কিন্তু কাজের কাজ বোধহয় কিছু হয় না। বরং নিজেদের কাছে নিজেদের বশ্যতার বাস্তবতা অস্বীকার করতে গিয়ে সেই বশ্যতার প্রতি কোনো প্রতিরোধের সম্ভাবনাটাও নেই হয়ে যায়। আমাদের মার্জিন অফ মার্জিন ঠিক এই প্রশ্নটাই তোলে, উত্তরঔপনিবেশিক পরিপ্রেক্ষিতের বিশিষ্ট বাস্তবতার ভিতরেই খুঁজে দেয় অন্ধকারকে, এই যুদ্ধ আর বাণিজ্যের বেলোয়ারি রৌদ্রের চীৎকৃত আলোয় আলোকিত এনআরআই-এনলাইটেন্ড পৃথিবীর বুকে নিবিড় আদিম বশ্যতার অন্ধকারকে।

## ৫।। পিতৃ-ডিসকোর্সের রূপান্তর

আমরা ঔপনিবেশিকতা এবং উত্তরঔপনিবেশিকতাকে দুটো আলাদা আলাদা আলোচনাগত ভূমি বা ডিসকার্সিভ স্পেস বলে ভাবি। যাদের সংস্কৃতিতে পিতৃ-ডিসকোর্সের বর্গগুলো খেলা করে আলাদা আলাদা ব্যাকরণে। আমাদের কাছে পোস্টকলোনিয়ালিজম হল পুঁজি, পণ্য ইত্যাদি পিতৃ-ডিসকোর্সের মূল আলোচনাগত বর্গগুলোর একটা মেটোনিমিক রূপান্তর। (এই পিতৃ-ডিসকোর্সটা পশ্চিমের ডিসকোর্স। পরে যা সমগ্র পৃথিবীর মানে গ্লোবাল ডিসকোর্স হয়ে গেছে। পশ্চিমের ডিসকোর্সই আজ পৃথিবীর একমাত্র।

আমাদের কাছে মননের চিন্তার ভাবপ্রকাশের প্রকরণ বলতে আজ পশ্চিমের প্রকরণ। অন্য কোনো বিষয়ী অবস্থান বা সাবজেক্ট পজিশন সেখানে আসে নৃতত্ব বা অ্যানথ্রপলজি হয়ে। হয় সেটা এক ধরণের অস্বাভাবিকতা, ডেভিয়ান্স। অথবা সেটা প্রাচীন ইতিহাসের অবশিষ্ট যা অপসারণের অপেক্ষা করে আছে। রয়ে গেছে কারণ সেই বাস্তবতাটা যথেষ্ট আধুনিক নয়। আমাদের কাছে মানুষ বা ম্যান বলতে পশ্চিম যাকে মানুষ বলতে বোঝে — যে মনন, যে চিন্তাপ্রক্রিয়া, যে যুক্তিবাদ, যে বিজ্ঞানমনস্কতা, যে ধর্মবোধ ইত্যাদি। পশ্চিমের আধুনিকতার ডিসকোর্স — সেটাই আজ গ্লোবাল ডিসকোর্স। পশ্চিমের ক্ষমতারই একটা বাহু, পৃথিবীব্যাপী মনকে যা শাসন করে। আমরা আমাদের এই প্রবন্ধে যখনই পিতৃ-ডিসকোর্স বলছি তখনই এই ডিসকোর্সটাকে চিহ্নিত করছি।)

এই রূপান্তরটা ঘটছে পিতৃ-ডিসকোর্স থেকে তার বাহির-এ, আউটসাইড-এ। এবং এই রূপান্তরের প্রক্রিয়াটা উত্তরআধুনিকতার সিম্পটম বা রোগলক্ষণ থেকে সঞ্জাত। এবং এটা অবধারিত ভাবেই বিদ্যার আলোচনার সীমার অন্য পারে। উত্তরআধুনিক আলোচনার, মার্ক্সবাদী আলোচনার, উত্তরঔপনিবেশিক আলোচনার। এই আলোচনার জগতে পরিত্যাজ্য পরিত্যক্ত বর্গগুলো ফেরত আসছে এই পিতৃ-ডিসকোর্সের মেটোনিমিক রূপান্তরের পদ্ধতিতে। কেমন করে, তা একটু বাদেই দেখব আমরা।

আর এই যদি আমাদের পোস্টকলোনিয়ালিজম হয়, আমাদের কলোনিয়ালিজম বা ঔপনিবেশিকতা হল ওই একই পিতৃ-ডিসকোর্সেরই রূপারোপ — শুধু তফাতটা এই যে রূপটা এখানে একটা আকস্মিকতা জনিত, ঘটনাপরম্পরায় ঘটে ওঠা। অ্যাক্সিডেন্টাল এবং কন্টিনজেন্ট। (একটা দার্শনিক যুক্তিমালায় একটা সমগ্রের সঙ্গে তার অংশগুলোর সম্পর্ক হতে পারে দুরকম। নেসেসারি বা পার্মানেন্ট, স্থায়ী বা জরুরি। এবং অ্যাক্সিডেন্টাল বা কন্টিজেন্ট, আকস্মিক বা ঘটনাপরম্পরাজনিত। ধরুন একটা ক্লাব, সেখানে আপনি সভ্য থাকতে পারেন, নাও পারেন, সবই নির্ভর করবে ঘটনা পরম্পরার উপর, ধরুন এই ক্লাবের বেশ কিছু লোককে আপনার ভালো লেগে গেল, আপনি দৌড়ে দৌড়ে মেম্বার হলেন, আবার উল্টোয় উল্টো। তাই এই ক্লাব নামক সমগ্রের সঙ্গে আপনি নামক অংশের সম্পর্কটা কন্টিজেন্ট, আকস্মিক, ঘটনাপরম্পরাগত। আর ধরুন বাস্তবতা নামে এই ক্লাব, এখানে আপনি যদি এমনকী নাও চান, কমলি নেহি ছোড়েগি। এমনকী যদি এস্পার ওস্পার ভেবে গলায় দড়িও দেন, আপনি এই বাস্তবতায় রয়ে যাবেন, গত অর্থনৈতিক বছরে মোট আত্মহত্যার সংখ্যায়। কত এনজিও আর কত সরকারি অফিসার মোটা মোটা নোট কামাবে আপনার এবং আপনার মত আরো অনেকের যোগানো এই ডেটার উপর। আপনার শব রয়ে যাবে নরম নতুন ফুলো ফুলো পাঁউরুটিতে, কটু সুগন্ধী গরম ভাপ ছড়ানো ভাতে। তাই এই 'বাস্তবতা' নামক সমগ্র আর 'আপনি' নামক অংশের সম্পর্কটা স্থায়ী, জরুরি, নেসেসারি, পার্মানেন্ট।) মূল মোচড়টা এইখানে যে, মূল পিতৃ-ডিসকোর্সটা, মানে পশ্চিমের চিন্তা ও বিদ্যার কাঠামোটার ঔপনিবেশিকতায় বা কলোনিয়ালিজমে কোনো আমূল রূপান্তর ঘটছে না । ক্ষমতার শাসনের ছড়িয়ে পড়ার একটা স্তরে কিছু ঘটনা পরম্পরা আসে, একটা নতুন দেশে গিয়ে জাহাজ থামল, একটা নতুন ভূগোল, তাকে নিয়ন্ত্রণে আনার নতুন ইতিহাস, এই নানা ধরনের শাসিত ভূগোলগুলো মিলে গিয়ে একটা সামগ্রিকতা সৃষ্টি হওয়া — রুল ব্রিটানিয়া, ব্রিটেন রুলস দি ওয়েভস — ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য কখনো অস্ত যায়না, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ভূগোল বা ইতিহাসের এই নয়া নয়া মোচড়গুলোকে হজম করতে গিয়ে মূল পিতৃ-ডিসকোর্সকে কোনো আভ্যন্তরীন বদলে যেতে হচ্ছেনা। তথ্য সমাহার বাড়ছে, অভিজ্ঞতা বাড়ছে, ভূগোলবিদ্যা বাড়ছে, ইতিহাসবিদ্যা বাড়ছে ভূগোল আর ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে। যে আভ্যন্তরীন আশিকড় বদলটা ঘটছে পোস্টকলোনিয়ালিজমের ক্ষেত্রে। সেখানে আভ্যন্তরীন রূপান্তর ঘটছে পিতৃ-ডিসকোর্সেই, তারা নিজেরা সরাসরি আর শাসন না করে করছে তাদের মেটোনিম দিয়ে। তাই, একটু মেটাফর আর মেটোনিমকে বোঝা দরকার।

*মেটাফর* মানে প্রতিস্থাপন। অচেনাকে চেনা দিয়ে প্রতিস্থাপিত করে। বা, বলা যায়, চেনার চৌহদ্দির মধ্যে অচেনাকে জাগিয়ে তোলে, স্পষ্ট এবং প্রতিভাত করে তোলে। অচেনাকে অনুবাদ এবং স্থানান্তরিত করে চেনা ভাষার ভুবনে। "বরং নিজেই তুমি লেখ নাকো একটি কবিতা/ বলিলাম ম্লান হেসে — ছায়াপিণ্ড দিল না উত্তর"। যদি বাস্তবিকই ছায়ার পিণ্ড হয় ওই 'ছায়াপিণ্ড' তাহলে তো তার কাছ থেকে উত্তর না পাওয়ার

মধ্যে কোনোই নাটক নেই। নাটকটা আছে, কারণ ছায়াপিণ্ড এখানে সমালোচকের মেটাফর। সমালোচককে আমরা একভাবে চিনি, পত্রিকার পাতায় প্রতিদিন একেবারে ভিত্তার করে দিচ্ছে কবিদের। কবিতা লেখার জায়গাটায় তার সেই অসহায় অপারগতার অন্ধকার যা তাকে ছায়াপিণ্ডের মত অর্থহীন করে দিচ্ছে, সমালোচকের সেই অপরিচিত ছবিটাকে আমাদের সামনে হাজির করে দিচ্ছে 'ছায়াপিণ্ড' এই মেটাফর। *মেটোনিম* বলতে বোঝায়, ফার্স্ট, একটা শব্দ/ ধারণা/ ছবি যখন অন্য আর একটা শব্দ/ ধারণা/ ছবি-র প্রতিনিধিত্ব করছে, যে শব্দ অনুপস্থিত কিন্তু অনুপস্থিত সেই শব্দের ইঙ্গিতটা এই উপস্থিত শব্দের ভিতরেই রয়েছে। আর সেকেন্ড, এই উপস্থিত প্রতিনিধি হল তার মূলের, যার সে প্রতিনিধিত্ব করছে সেই শব্দের (বা, ছবি/ ধারণা-র), একটা অংশ, টুকরো, খণ্ড। খণ্ডটাই এখানে সমগ্রের প্রতিনিধি। "বাণিজ্যবায়ুর হর্ষে কোনো একদিন/ চারি দিকে পামগাছ — ঘোলা মদ — বেশ্যালয় — সেঁকো — কেরোসিন"। এতো বাণিজ্যবায়ুর হর্ষে ঘটে না, ঘটে পুঁজিতন্ত্রের অনুপ্রবেশে, ক্যাপিটালিজমে। ক্যাপিটালিজম নামক সমগ্রের অংশ ওই ব্যাবসার হাওয়ার উল্লাস, বাণিজ্যবায়ুর হর্ষ। তাই 'বাণিজ্যবায়ুর হর্ষ' এখানে মেটোনিম। মেটোনিম হল একটা বিশেষ শব্দ/ ধারণা/ ছবি যা অন্য আর একটা শব্দ/ ধারণা/ ছবির প্রতিনিধিত্ব করছে যে নিজে অনুপস্থিত কিন্তু যার সঙ্গে এই মেটোনিমটি কোনো না কোনো রকমে সম্পর্কিত। দৃশ্যের মধ্যে উপস্থিত মেটোনিমটি বহন করছে অদৃশ্য ওই শব্দ/ ধারণা/ ছবিটির একটা অতিরিক্ত অর্থ, সারপ্লাস মিনিং। (দেরিদা এই মেটোনিমিক অতিরিক্ত অর্থকেই 'ট্রেস' বলে ডেকেছেন ।) আর এক ভাবে বলা যায়, একটা বইয়ের একটা অংশ, একটা চ্যাপ্টার সমগ্র গোটা বইটাকেই মেটোনিমিকালি বহন করে।

এখানে আরো দু-একটা কথা বলে নেওয়া যাক মেটাফর, মেটোনিম, তাদের সম্পর্ক এবং লাকাঁ তাদের কী ভাবে ভেবেছেন তার কিছু ইঙ্গিত নিয়ে। ডিকশনারি অনুযায়ী, মেটাফর মানে, অর্থের স্থানান্তর, যা দিয়ে একটা শব্দের আদত অর্থকে স্থানান্তরিত করা যায় আর একটা অর্থে, এমন একটা অর্থে যার সঙ্গে কোনো এক রকমের আত্মীয়তা আছে এই শব্দটির, একটা প্রতিতুলনা আনা যায়। অনেকসময় এর মধ্যে বিস্মৃত ইতিহাসও রয়ে যায়। ধরুন শ্লথ হাঁটাকে দুলকি চালে হাঁটা বললাম, কোনো একদিনকার কোনো লুপ্ত পালকির বা ঘোড়া নামক যানের দুলুনি তার মধ্যে রয়ে গেল, কারণ আজকের রাস্তায় আমরা যত জোরে বা আস্তেই হাঁটি না কেন, দোলার চান্সটাই বা কোথায়? যা ভিড়। আজ যারা মেটাফর কোনো এক অতীতে এদের অনেকেই হয়ত জ্যান্ত অর্থে ব্যবহৃত হত।

এখানে একটা মজার গল্প না করে পারছি না, যদিও সেই গল্পটার সঙ্গে মেটাফরের কোনো সম্পর্ক নেই, আছে হোমোফোনির, অর্থের নয়, ধ্বনির সাদৃশ্যের। গল্পটা আমাদের ভাষার লিখনের মধ্যে গোপন ইতিহাসকে চিহ্নিত করে। বাইবেলের গোড়াতেই আদম তার পাঁজর খুলে ইভকে বানাচ্ছে, এই গল্পটা কিছুতেই বুঝে ওঠা যায় না, যদি আমরা না জানি যে এই পুরোটা নির্ভর করছে একটা প্রাচীন সুমেরিয়ান ধ্বনিসাদৃশ্যের উপর। প্রাচীন সুমেরিয়ান বর্ণমালায় একই তীর চিহ্ন ব্যবহৃত হত তিনটি অর্থকে বোঝাতে, জীবন, পাঁজর, এবং তীর। কারণ, এই তিনটি শব্দের ছিল একই উচ্চারণ, তি। তাই সুমেরিয়ান স্বর্গ রূপকথায় জীবনপালিকা দেবী 'নিন-তি', অসুস্থ দেবতা 'এনকি'-র পাঁজর সুস্থ করে তোলেন। আদম থেকে জীবনের সঞ্চার ঘটল ইভে, এই অর্থের লিখনের মধ্যে ছায়া ফেলেছে প্রাচীন সুমেরিয়ান ভাষার ইতিহাস, আমরা পেয়েছি পাঁজরের গল্প। বা, ইভের হিব্রু নাম 'হাওআ' (যার অর্থ জীবন) না জানলে বোঝা যায় না, কেন দি বুক অফ জেনেসিস-এ, "এবং আদম তার স্ত্রী ইভের নাম ধরে ডাকলেন, কারণ তিনি সকল জীবনের জননী"। একশো কৌরব ভ্রূণ নিয়ে একটা বেড়ে জিনিষ দেবীপ্রসাদে ছিল, কিন্তু নিখুঁত মনে পড়ছে না, আর আমার বইটা কেউ হাওয়া করে দিয়েছে, হিব্রুতে নয়, সাদা বাংলায় হাওয়া করেছে।

যাকগে, এসব পুরাণপাঠ থাকুক, কাজের কথায় আসি। জাক দেরিদাও মেটাফরের এই সাদৃশ্যের জায়গাটাকে, একদেশতাটায় জোর দিয়েছেন। শুধু চিহ্ন আর অর্থের সাদৃশ্য নয়, এমন দুজনের মধ্যে সাদৃশ্য যারা ইতিমধ্যেই চিহ্ন হয়ে গেছে। দুই চিহ্ন যারা এ অন্যকে নির্মাণ করে, পরস্পর পরস্পরের মেটাফর। এখানে দেরিদাও, আলাদা করে উল্লেখ না করে, ওভারডিটারমিনেশনের কথাই বলছেন। অন্য অনেক তাত্ত্বিক মেটাফরের ভিতর বাস্তবিক এবং শৈল্পিক অর্থের পরিপ্রেক্ষিৎ-গত দ্বন্দ্বকে খুঁজে পেয়েছেন। এক একটা নতুন

পরিপ্রেক্ষিৎ, এক একটা নতুন দ্বন্দ্ব, এক একটা নতুন মেটাফর। যে ভাবেই আমরা দেখি না কেন, মেটাফরের মূল জোরের জায়গাটা তার এই গতিশীল গঠনে যা নিয়ত আমাদের দৃষ্টিক্ষেত্রকে দৃষ্টিকে বদলে নিয়ে চলেছে। নতুন অভিজ্ঞতা, সদ্য আবিষ্কৃত নতুন সাদৃশ্য, গজিয়ে উঠল নতুন মেটাফর, ভাষাকে দৃষ্টিকে তথা চিন্তার ক্ষেত্রকে আর একটু বাড়িয়ে তুলল। সাদৃশ্য থেকে নতুনতর সাদৃশ্যে ধাবমান এ এক অনন্ত প্রক্রিয়া।

একটু বাদে আমাদের ভাভার বর্গগুলোকে বুঝতে গিয়ে কিছুটা লাকাঁর ব্যাখ্যাকে আনতে হবে। লাকাঁ মেটাফরকে এবং মেটোনিমকে দিয়ে ভাষার সর্বব্যাপী ক্ষমতাকে বুঝতে চেয়েছিলেন। লাকাঁ মনে করেছিলেন মেটাফর তৈরি হয় দুটো সিগনিফায়ার বা দ্যোতককে দিয়ে। যারা একটা দ্যোতনার বা অর্থ তৈরি করার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে, মেটাফরটা ঘটে ওঠে 'উইদিন এ সিগনিফাইং চেইন'। একটা দ্যোতক বা সিগনিফায়ার তার মধ্যে একটা অর্থকে হাজির করে, সেই অর্থটাই সিগনিফায়ার বা দ্যোতিত। দ্যোতনার সিগনিফিকেশনের এই পদ্ধতিতে, বই নামক সিগনিফায়ার, 'বই' নামক শব্দটা, সিগনিফাই করল তার মধ্যে হাজির 'বই' এই ধারণাটিকে — পরপর বেশ কিছু পৃষ্ঠার সমাহার, ছাপা পাতা, এই বই ওই বই, অন্য অনেক সব বই। এই 'বই' ধারণাটাই হল সিগনিফায়েড। যাকে আমরা বুঝছি 'বই' এই শব্দটি দিয়ে, এই সিগনিফায়ার শব্দটি তাই এখানে একটা চিহ্ন বা সাইন। এবার মেটাফর ঘটার প্রক্রিয়াটা ভাবুন — একটা চিহ্ন বা সাইনের জায়গায় নিয়ে আসা, বদল বা সাবস্টিটিউট করা, আরো এক বা একাধিক চিহ্ন — সাসুর একে চিহ্ন-শৃঙ্খল বা চেইন অফ সাইনস নামে ডেকেছিলেন। কিন্তু ওই প্রথম চিহ্নটাকে আমি বদলালাম মানে সেটা কিন্তু নেই হয়ে গেল না। সে রয়ে গেল। গভীরে, গোপনে। অবরুদ্ধ রিপ্রেসড — সিগনিফায়েড — রয়ে গেল খোদ অর্থ তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা মেটোনিমিক রকমে মানে ছোট হয়ে ক্ষীণ হয়ে এসে। ভাবুন না, যে ঘোড়া বা পালকি আর নেই, তাদেরই তো দুলুনি দিয়ে দুলকি চালের ধারণাটা এসেছিল, তারা একটা ছোট ক্ষীণ ক্ষুদ্র রকমে রয়ে গেল না 'দুলকি চাল' নামক শব্দবন্ধকে বোঝার প্রক্রিয়ায়? ওই বদলে ফেলা অবরুদ্ধ মেটাফরটা, তাই, সচেতন জগত থেকে সরে গিয়ে আশ্রয় নিল অচেতনের জগতে। অচেতনে রয়ে গেল প্রস্তরযুগের ঘোড়া, বোকারা যাকে মহীনের ঘোড়া বলে চেনে। কিন্তু একটা পরোক্ষ সম্পর্ক রয়ে গেল একটা বদলি দ্যোতক দিয়ে পুরোনো দ্যোতককে গোপন অবরুদ্ধ করার প্রক্রিয়ার গতিবিজ্ঞানে। অচেতনের গোপন পরতে ঘুমন্ত অবস্থায় রয়ে গেল সেই অবরুদ্ধ দ্যোতক, তার সঙ্গে বদলি দ্যোতককে সম্পর্কিত করার প্রক্রিয়াটার ভিতর। সুররিয়ালিস্টরা চেষ্টা করেছিলেন ভাষাকে অচেতনের বাঁধন থেকে সম্পূর্ণ বার করে এনে একটা মুক্ত 'প্রেম ও কল্পনার ভাষা', 'ল্যাংগুয়েজ অফ লাভ অ্যান্ড লাইফ ইন সাইকিক লিবারেশন' বানিয়ে তুলতে। তা সংজ্ঞাগত ভাবেই অসম্ভব। বাচনের ভাষার শব্দজগতের কোনো মেটাফরই কখনো অর্থ তৈরি হওয়ার এই অচেতন প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে না। এই অচেতন শৃঙ্খলের মধ্যেই গাঁথা থাকে আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের ভাবপ্রকাশ, আমাদের ভাষা। আদি শৈশবে আমাদের সংগ্রাহক, সঞ্চয়ী, সংরক্ষণশীল মননের মধ্যেই আমাদের অভিজ্ঞতার কাঠামোর চারদিক ঘিড়ে গজিয়ে ওঠে অর্থনির্মাণের এই প্রক্রিয়া।

দ্যোতক আর দ্যোতিত-র, সিগনিফায়ার আর সিগনিফায়েড-এর মধ্যে বিরোধ বা অপোজিশনটা ছিল সাসুর-এর তত্ত্বের একটা মূল বা প্রাথমিক জায়গা। লাকাঁ বললেন এই বিন্দু থেকেই ভাষার ক্ষমতার এলাকা শুরু হয়। এবং এই ক্ষমতাটা তার চূড়ান্ত রূপ পায় মেটাফর এবং মেটোনিমির সাপেক্ষে। এরা দুজনে একটা গতিশীল স্বয়ংক্রিয়তায় সচেতন এবং অচেতন দ্যোতনা-শৃঙ্খল বা সিগনিফায়িং চেইনস দিয়ে কাজ করে। কোন দ্যোতক-কে দিয়ে আমরা কোন দ্যোতিত-কে বুঝব তা নিয়ন্ত্রণ করে এরাই। যার পুরোটাকে মিলিয়ে তৈরি হয় একটা ভাষার ক্ষমতার জায়গা। এবং এই দ্যোতনা-শৃঙ্খল বা সিগনিফায়িং চেইনস তৈরি করতে গিয়ে যদি একটা শব্দ/ ধারণা যদি অন্য একটা শব্দ/ধারণার জায়গায় প্রতিস্থাপিত হয় তাকে আমরা বলি মেটাফর। এবং একটা শব্দ/ ধারণা যদি আর একটা শব্দ/ ধারণার সঙ্গে একটা সমাহার তৈরি করে, একটা কম্বিনেশন-এ চলে আসে তাকে আমরা বলি মেটোনিমি। প্রতিস্থাপন আর সমাহারের, সাবস্টিটিউশন এবং কম্বিনেশনের এই ভাষাতাত্ত্বিক দুটো খেলা মিলে তৈরি হয় একটা সিগনিফায়ারের প্রভাব বা এফেক্ট। লাকাঁ এইটাকে এভাবেই দেখেছেন। লাকাঁ এটুকুই থাক, এবার ফেরত যাওয়া যাক আমাদের মূল আলোচনায়।

আমাদের উদ্দেশ্য একদম সোজাসাপ্টা। সঙ্কর বা হাইব্রিড সংস্কৃতি সম্পর্কিত পোস্টকলোনিয়াল আলোচনায় আমরা সরাসরি অনুপ্রবেশ করতে চাইছি, এবং হাইব্রিড আইডেন্টিটি বা সঙ্কর পরিচিতিগুলোকে চিহ্নিত করতে চাইছি, নামকরণ করতে চাইছি, এবং তাদের পারস্পরিক পার্থক্যগুলোকে দেখিয়ে উত্তরঔপনিবেশিক নয় ঔপনিবেশিক হাইব্রিডিটিকে স্পষ্ট করে তুলতে চাইছি। (এই পরিচিতি ব্যাপারটার শুধু মনোবৈজ্ঞানিক নয় একদম জাতিগত একটা রক্তমাংস বা কংক্রিটনেসও আছে। ধরুন ওয়াশিংটন প্রবাসী একজন গুজরাতি কি একজন বাঙালি থেকে নিজেকে পৃথক করে ভাববে? কী হবে তার পরিচিতি? এই পরিচিতির ভিত্তি কী হবে? এই জায়গাগুলো থেকেই এই পরিচিতি বা আইডেন্টিটির প্রশ্ন এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এনআরআইদের তত্ত্বে। সে কি নিজেকে আমেরিকান ভেবে ফেলবে? নাকি, গুজরাতিই ভাববে? এবং রোজ ভোরে উঠে ডান্ডিয়া নাচ নেচে নিজের গুজরাতিত্ব বজায় রাখবে? নাকি, বাঙালি হলে, রোজ রাতে শোওয়ার আগে ক্যাসেটবদ্ধ 'এই পরবাসে রবে কে' শুনে?) আমরা আমাদের প্রস্তাবিত এই কলোনিয়াল হাইব্রিডিটিকে চিহ্নিত এবং আলাদা করতে চাই এনআরআইদের পোস্টমডার্ন যাযাবর হাইব্রিডিটি থেকে। যার কোনো দেশ নেই, কোনো ভাষা নেই, আছে শুধু সর্বব্যাপী সাম্য, যার কথা আমরা আগেই বলেছি।

আমরা পোস্টকলোনিকে দেখতে চাইছি শাসক পিতৃ-ডিসকোর্সের মূল বর্গগুলোর একটা মেটোনিমিক প্রতিনিধিত্ব হিশেবে, যেখানে বিষয়ীর বা সাবজেক্টের ইচ্ছা বা অনিচ্ছের কোনো তোয়াক্কা না রেখেই মেটোনিমিটা ঘটে চলেছে। একটা নামহীন সাবজেক্টরিক্ত শাসন বশীকরণ। এবং, একই সঙ্গে, কলোনিয়ালজিমেও ওই একই বর্গগুলো একই ভাবে মেটোনিমির মাধ্যমে প্রবাহিত হয় পিতৃ-ডিসকোর্স থেকে, শুধু, তফাত একটাই। কলোনিয়ালিজমে খুব স্পষ্ট দগদগে একটা বিষয়ী থাকে। নেটিভদের শাসক ওই কলোনাইজার সাহেব। তার ক্রিয়া চেতনা সংস্কৃতি থেকে প্রবাহিত হয় এই মেটোনিমি, ঔপনিবেশিক পরিপ্রেক্ষিতে। কলোনিতে প্রক্রিয়াটা কিন্তু নামহীন বা বিষয়ীহীন নয়। তাই, আমাদের দৃষ্টিতে, পোস্টকলোনি হল আর একটু শিক্ষিত আর একটু সূক্ষ্ম একটা কলোনিয়ালিজম, যেখানে মেটোনিমির প্রক্রিয়াটা কলোনাইজার প্রভু নামক বিষয়ীকে অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে নামহীনতার অনির্দেশ্য উপত্যকায়। এবং পোস্টকলোনির এই ধারণাকে ব্যবহার করে আমরা চারপাশে চালু পোস্টকলোনির হাইব্রিডিটির তত্ত্ব এবং সেখানে কলোনির বেদনার মুহূর্তকে ভুলে জাতি-অতিক্রমী পরিচিতি-অতিক্রমী সর্বব্যাপী গনতান্ত্রিক সাম্যের গরিমার গানকে জেরা করতে চাই।

## ৬।। উত্তরঔপনিবেশিক হাইব্রিড

হোমি ভাভা এবং অন্যান্য এনআরআই সহকর্মীদের আমাদের তৃতীয় বিশ্বের দুয়া এবং সালাম, তারা বেড়ে কাজ করেছেন, সঙ্কর পরিচিতির ধারণাকে এনে। হোমি ভাভা অর্জুন আপ্পাদুরাই-রা দূর কোনো ইতিহাস এবং ভূগোল সম্পর্কে আমাদের কলকাতার রোয়াকেরও আত্মীয় এটা ভেবে আমাদের রোয়াবিও বাড়তে পারে। এবং সেন্টার-পেরিফেরি মডেলগুলো সম্পর্কে তাদের চিড়চিড়াপনের আমরাও শরিক। কিন্তু, সরি, সাম্যের গান আমরা গাইতে কাবেল নই, সেই সরগম আমাদের গলায় এখনো বসেনি। কিন্তু, এদের সঙ্গে আমাদের সাম্য সংক্রান্ত এই তফাতটা বোঝার জন্যে জানা দরকার আমরা ক্লোজার বলতে কী বুঝি। আমরা মনে করি চালু পোস্টকলোনিয়াল পোস্টমডার্ন সংস্কৃতিবিদ্যা আরো অনেকটা সক্ষম হয়ে উঠতে পারে, যদি সেখানে একটা 'সমাপ্তি' বা 'ক্লোজার'-এর ধারণাকে আনা হয়।

বিদ্যা বা তত্ত্বচর্চার প্লেনে, একটা পোস্টমডার্ন রকমে, কোনো প্রদত্ত ভূমি ছাড়া একটা অনন্ত রকমের উণ্মুক্ত সমগ্র — শুনতে বেশ মনোগ্রাহী লাগে। যেখানে একটা ঘটনাকে বুঝতে হবে আর একটা ঘটনা দিয়ে, তাকে আর একটা ঘটনা, আর একটা, ..., আদ্যন্ত সমস্ত ঘটনা, কারণ এই সমগ্রে প্রত্যেকেই অন্য প্রত্যেকের কারণ, সবাই সবার। কিন্তু, আগেও যা বলেছি আমরা, তাহলে তো কোনো তত্ত্ব সম্ভব না, বা সম্ভব না সেই তত্ত্বের ভিত্তিতে কোনো কার্য। কারণ, কোনো তত্ত্ব করতে গেলেই কিছু না কিছু বুঝতে হবে, আর একটা কিছু

বুঝতে গেলেই বুঝতে হবে অন্য আর সমস্ত কিছুকে। অর্থাৎ, কোনো কিছু বোঝা বা সেই বোঝার ভিত্তিতে কোনো কার্যের গল্প খতম।

কিন্তু তাই কি হয়? প্রতিমুহূর্তেই, আমরা চাই বা না-চাই, কিছু না কিছু আমাদের বুঝতে হচ্ছে, এবং সেই অনুযায়ী কাজ করতে হচ্ছে। তত্ত্ব এবং সেই তত্ত্ব মোতাবেক ক্রিয়া তো আছেই। তাই, যে কোনো তত্ত্বের তত্ত্ব হয়ে ওঠার জন্যেই প্রয়োজনীয় একটা একটা সমাপ্তি বা ক্লোজার। অর্থাৎ, একটা ঘটনাকে বুঝতে আর একটা ঘটনা, তাকে বুঝতে আর একটা, ... , ইত্যাদি ক্রমবর্দ্ধমান এই তন্তুজালকে একটা জায়গায় থামিয়ে কেটে ভেঙে দেওয়া। মানে, এই অব্দি আমি ব্যাখ্যাকরণের প্রক্রিয়াটাকে নিয়ে যাব, তারপর এইখানটায় থামিয়ে এর আগের জিনিষগুলোকে আমি প্রদত্ত বলে ধরে নেব। যেখানটায় আমি থামালাম তার আগের জিনিষগুলোকে আর আমি প্রশ্ন করবনা। তাদের আমি আমার স্টার্টিং পয়েন্ট বা শুরুর জায়গা হিশেবে নেব। ধরুন অর্থনীতি বুঝতে আমি রাজনীতি আনলাম, রাজনীতি বুঝতে ইতিহাস, ইতিহাসকে বুঝতে প্রাগইতিহাস, তাকে বুঝতে গিয়ে ভাষার উদ্ভব। এবার ভাষার উদ্ভবকে আমি প্রদত্ত বলে ধরে নেব। অর্থাৎ আমার সমাপ্তি বা ক্লোজার। ভাষার উদ্ভব ব্যাপারটাকে এখানে আলাদা করে উল্লেখ করলাম কারণ আমাদের পরিচিত অনেকগুলো ধারার মানববিজ্ঞান বা হিউম্যান সায়েন্স-এ এই জায়গাটাকে প্রদত্ত বলে ধরে নেওয়া হয়।

(তাহলে, লক্ষ্য করুন, একটা সারবাদ বা এসেনশিয়ালিজম কিন্তু রয়ে গেল। পোস্টমডার্নিজমের একটা প্রাথমিক শর্তকেই আমরা লঙঘণ করলাম। কিন্তু এই আত্মসচেতন কৌশলগত সারবাদ বা স্ট্র্যাটেজিক এসেনশিয়ালিজম-এর সঙ্গে অসচেতন এসেনশিয়ালিজম-এর একটা গুরুতর তফাত থাকছে। স্ট্র্যাটেজিক এসেনশিয়ালিস্ট জানে, তার কাজের মানে তত্ত্বের মধ্যে একটা এসেনশিয়ালিজম আছে। তাই তার তত্ত্বের মধ্যে একটা অর্ন্তখচিত ইন-বিল্ট সীমাও আছে। যে সীমানার পরে বা বাইরে তার তত্ত্বটা শুধু ভুল হতে পারে তাই না, ভুল হবেই। কারণ, কাজটা শুরুই হয়েছে ওই এসেনশিয়ালিস্ট ভুল থেকে। কিন্তু ভুলটাকে বাদ দিয়ে কাজটাই করা যাবে না, তাই ভুলটা তাকে আত্মসচেতন ভাবেই রাখতে হয়েছে। শুধু ভুল না, একটা সীমিত চিন্তন এলাকা মানে অবস্থান এর মধ্যে ন্যস্ত রইল। মানে যে অবস্থান থেকে না দেখে অন্য কোনো অবস্থান থেকে দেখলে সেই দেখাটা ভিন্ন হবে। সেই দেখাটাও হবে এই প্রথম দেখাটার মতই আর একটা দেখা। যার কোনোটাই অন্যটার চেয়ে বেশি ভুল বা ঠিক নয়। যেমন, এই স্ট্র্যাটেজিক এসেনশিয়ালিজমকে খুব কার্যকর ভাবে ব্যবহার করেছেন রেজনিক আর উল্ফ, তাদের সমাজঅর্থনীতি সংক্রান্ত শ্রেণীতত্ত্বে। সেখানে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী এই 'শ্রেণী' নামক অবস্থান। তারা তাদের ব্যাখ্যা ও তাত্ত্বীকরণকে থামিয়েছেন, তাতে সমাপ্তি বা ক্লোজার এনেছেন শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে। তাদের এই তত্ত্ব আত্মসচেতন এসেনশিয়ালিজমের শ্রেণীতত্ত্ব। আর আবহমান চিরাচরিত মার্ক্সবাদ যেখানে অসচেতন ভাবে এসেনশিয়ালিস্ট। তাই, সেখানে মনে করা হয়, পৃথিবীতে সত্য কেবলমাত্র এই একটা, আর সবই মিথ্যা। )

আমাদের সঙ্গে ভাভা ইত্যাদিদের তত্ত্বগত পার্থক্য ঘটছে মানেই আমাদের আর ভাভাদের ক্লোজার-এর তফাত আছে। এই 'ক্লোজার' ধারণাটাই আমাদের সাহায্য করবে বিভিন্ন ধরনের হাইব্রিডিটি বা সঙ্করতাকে আলাদা আলাদা ভাবে বুঝতে। অন্যত্র আমরা এই ক্লোজার নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছি। আমাদের 'মার্জিন অফ মার্জিন : প্রোফাইল অফ অ্যান আনরিপেন্টান্ট পোস্টকলোনিয়াল কোলাবোরেটর' বা ২০০০ শারদীয়া অনুষ্টুপের 'নিয়ন্ত্রণ ও রোগলক্ষণ' বা ২০০১ বইমেলা অপরের 'মার্জিন অফ মার্জিন : একটা অটেকনিকাল ভূমিকা'। তাই এখানে সেই আলোচনার খুঁটিনাটিতে আর গেলাম না। শুধু একটা ব্যাপার মাথায় রাখুন, একটা ক্লোজার, যে কোনো ক্লোজার মানেই কিন্তু একধরনের একটা ফ্যাসিজম। অন্য অনেক কিছুকে আমি কণ্ঠরোধ করলাম, তাদের চেপে দিলাম। কিন্তু চেপে কি কিছুকে দেওয়া যায়? যাকে চেপে দেওয়া হয় সেতো ওই চেপে দেওয়ার প্রক্রিয়াটার মধ্যে রয়ে যায়, সে না থাকলে তো চেপে দিতে হত না। তাই, যাকে চেপে দেওয়া হল, তাকে আসলে চেপে দেওয়া হল না। সে আবার ফেরত আসে। তার মুন্ডু উঁচিয়ে জানান দেয়, আমি আছি গো। যেমন পোস্টমডার্নতার এই ভিত্তার করে দেওয়া সাম্যও কিন্তু ভারতকে আমেরিকা বা আমেরিকাকে ভারত করতে পারেনা। তাই আমেরিকাকে ভারতীয় অভিবাসী বা ইমিগ্রান্ট আটকাতে মাইগ্রেশন আইন বদলাতে হয়, ভারতকে হয় না। তাই চারপাশের এই এত খাবলা খাবলা সাম্যের

উত্তরআধুনিকতার সেই প্রক্রিয়ার ভিতর নামটুকু অব্দি বেহাত হয়ে বেচারা তৃতীয় বিশ্ব, গলা তুলে না হোক, ফিসফিস করে, জানান দেয় — এখন সবই সত্য সবই ভালো নয়, কিছু কালোও আছে বৈকি। প্রথম বিশ্বের বাস্তবতাতেও জানান দেয়, সাদা আর কালোদের সব সাম্যের পরও মাঝেমাঝেই কালো-সাদার দাঙ্গা, জানান দেয় জাতিদ্বেষকে চেপে দেওয়া যায়নি আপাত গনতন্ত্রের সাম্যের তলায়। সাদা আর কালোর ওই জাতিদাঙ্গা হল সেই সিম্পটম বা রোগলক্ষণ যা দিয়ে অবরুদ্ধ নিজেকে ঘোষণা করে। পরিত্যক্ত বহিষ্কৃত সত্তা ফিরে আসে সেই বাস্তবতায় যেখান থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। যেমন আমাদের সচেতন যুক্তিশীল মনোপ্রক্রিয়ার নিচে চাপা পড়া আমাদের অচেতন প্রবণতা ও বাসনাগুলো ফেরত আসে আমাদের মধ্যে, আমাদের স্নায়ুরোগী বা নিউরোটিক করে তোলে। মাথার থেকে সরিয়ে রাখা মহম্মদের ভাবনা মাথার ভিতরে জন্ম দিয়েছিল প্রাগৈতিহাসিক ম্যামথের। এই সিম্পটমকে ভাবার জায়গাটাতেও আবার ফ্রয়েড আর লাকাঁর বিস্তর ফারাক আছে। কিন্তু এখানে সেই আলোচনায় আমরা যাব না। অন্যত্র করা হয়েছে।

তাই যে কোনো তত্ত্বের মত আমাদের ক্লোজারও তার অবরোধের তলায় জন্ম দেবে এরকম অনেক সিম্পটমের। আমরা এই ক্লোজারের ফলাফল আবিষ্কার করার চেষ্টা করব, এবং শেষ অব্দি অন্য যে কোনো ক্লোজারের মত এই ক্লোজারও যে আসলে একটি রূপকথা, একটি ফ্যাসিস্ট রূপকথা সেই বিষয়ে সচেতন থাকব। এবং তখনই আমরা খোঁজ পাব ক্লোজারের থেকে গজিয়ে ওঠা সিম্পটমের। মার্ক্সবাদী পলিটিকাল ইকনমি তথা ভ্যালু থিয়োরি তথা মার্ক্সের সমীকরণমালা দিয়ে বানিয়ে তোলা ক্লোজারের সিম্পটম আমরা বিশদ ভাবে আলোচনা করেছি আমাদের 'মার্জিন অফ মার্জিন'-এর একটি অতিদীর্ঘ পরিশিষ্টে। এখানে সেই আলোচনা থাক।

আসুন আপাতত আমরা এবার এই পোস্টকলোনিয়াল হাইব্রিডকে জেরা শুরু করি। এই জেরা খুব সহজেই প্রমাণ করে দেবে যে এই হাইব্রিডদের বেশ কিছু আসলে বেজন্মা। দাঁড়ান, এক সেকেন্ড, 'বেজন্মা' শব্দটা, মাইরি বলছি, এখানে কোনো গালাগাল না। যার নামে কিরে কাটতে কাটতে প্রাকৃত মানুষ এই 'মাইরি' শব্দে পৌঁছেছিল সেই মা মেরীর বাচ্চা যীশু খ্রিস্টও ছিল বেজন্মা। আর আমরা আমাদের দেশের নামেই বহন করে চলেছি আর এক পৌরাণিক বেজন্মার নাম — ভরত। সে তো সেই সন্তান, যার পিতৃত্ব তার নিজের পিতাই অস্বীকার করেছিল, তার মায়ের সঙ্গে সম্পর্কও। আবার তার মা, বাইজির মেয়ে শকুন্তলা, সেই বা বেজন্মা থেকে কম কিসে? তাই প্লিজ, তৃতীয় বিশ্ব ভারতের বাসী হিশেবে অন্তত 'বেজন্মা' শব্দটাকে গালাগাল ভেবে পড়বেন না।

আমরা এবার তাই উত্তরঔপনিবেশিক তত্ত্বচর্চার চালু আলোচনাগুলোকে আরো বিশদ করে তুলব, বাড়াব, এবং এই করতে করতে তাদের হাইব্রিডিটি ধারণাকে জেরা করব (মানে, অ্যাকচুয়ালি তাদের পিণ্ড চটকাব)। আমরা আমাদের কলোনিয়াল গেজ, ঔপনিবেশিক দৃষ্টির প্রহরার নিচে নিয়ে আসব তাদের। মনে রাখুন, ঠিক 'বেজন্মা' শব্দটার মতই এখানে 'ঔপনিবেশিক' শব্দটাও কোনো খিস্তি না, শাসনের জাস্ট আর একটা প্রকার। আমরা ওই ক্লোজারের ধারণা জুতে দেব হাইব্রিডিটি ধারণার গলায়, এবং দেখব কতদূর তার দৌড়। লাকলাউ-মুফের হেজেমনি ধারণাকে আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি। গ্রামশিকে ইতিহাসবাদ এবং সারবাদ, হিস্টরিসিজম এবং এসেনশিয়ালিজম থেকে কিয়ৎপরিমাণ মুক্ত করে এরা নতুন ভাবে হেজেমনি ধারণাকে ব্যবহার করেছিলেন। আমরা এই প্রবন্ধের গোড়াতেই এই নতুন রকমের হেজেমনি ধারণা নিয়ে আলোচনা করেছি। একটা ওভারডিটারমিন্ড ভূমির হেজেমনি। আমাদের এই হেজেমনি ধারণা অবশ্য লাকলাউ-মুফে থেকেও পৃথক। লাকলাউ-মুফে মার্ক্সকে ক্লিয়ার টা টা বাই বাই জানিয়ে দিয়েছেন। যাকগে ওসব খুঁটিনাটি এখন বাদ দিন।

আমাদের যুক্তির কাঠামোটা দুকথায় এখানে ঝালিয়ে নেওয়া যাক। ভাভা তথা অন্যান্য উত্তরঔপনিবেশিক সংস্কৃতিবিদ্যার আলোচনায় ব্যবহৃত মূল বর্গগুলো হল — নেগোশিয়েশন, রিলোকেশন, রিঅ্যালাইনমেন্ট — দরকষাকষি, পুনঃস্থাপন, পুনঃসংস্থান। এই তিনটে বর্গকেই একটু মনোযোগ দিয়ে ভাবুন, দেখবেন মূল জায়গাটা হল একটা বাড়তি কিছু। সবগুলো শব্দ বা ধারণাই একটা অস্পষ্টতা, দ্বর্থপ্রবণতা, অ্যামবিগুইটিকে হাজির করে। যা তারা বোঝায় তা তাদের নিজেদের থেকে উপচে পড়ে, একটা

বাড়তি উদ্বৃত্ত অর্থকে হাজির করে। এই বাড়তি উদ্বৃত্ত অর্থের সাংস্কৃতিক বাস্তবতা, যেখানে পুরোনো প্রদত্ত অর্থের বর্গগুলো দিয়ে আর কাজ চলছিল না, সেইখান থেকেই ভাভা ইত্যাদি তাত্ত্বিকদের উদ্ভব। বেশ। এটুকু নয় বোঝা গেল। কিন্তু এবার প্রশ্ন আসে এই উদ্বৃত্ত অর্থের প্রকৃতিটা ঠিক কী? মেটাফরিক না মেটোনিমিক? আমরা তো আগেই বলেছি দু ধরনের আলাদা আলাদা উদ্বৃত্ত অর্থ দু ধরনের শাসনকে হাজির করে।

উদ্বৃত্ত অর্থ গজিয়ে ওঠা এবং ছড়িয়ে পড়ার এই প্রক্রিয়ায় মেটাফরিক কাট বা ছেদ, এবং মেটোনিমিক স্লাইডিং বা পিছলে যাওয়া ঠিক কী ভাবে ঘটে সেটাই আমাদের দেখার। বিশেষত ওই মেটোনিমিক পিছলে যাওয়া। কী ভাবে এক সেট শব্দ বা ধারণা তাদের মেটোনিমিক খণ্ড-অস্তিত্বের উদ্বৃত্ত অর্থ ছড়িয়ে দেয় একটা সংস্কৃতি জুড়ে, একটা আস্ত সাংস্কৃতিক আলোচনার ভূমি জুড়ে। এবং ওই অন্য শরীরে হাজির হওয়ার ওই মেটাফরিক ছেদগুলো কী ভাবে এই মেটোনিমিক বদলের পাশে এসে দাঁড়ায়, একত্রে কাজ করে। এই পুরো প্রক্রিয়া জুড়ে গজিয়ে ওঠে কিছু মূল ধারণা, কী-কনসেপ্ট। ধীরে ধীরে, এই কী-কনসেপ্টগুলোর শাসনের তলায় চারিয়ে যায় গোটা সংস্কৃতির ভূমিটাই। এই কী-কনসেপ্টগুলো এবার শাসন করে তাদের খণ্ড উপস্থিতির মেটোনিমিক উদ্বৃত্ত দিয়ে। এবং মেটাফরিক উদ্বৃত্তের মধ্যে রয়ে যায় শত আকার বদলানোর মধ্যেও আসলে অবিকৃত থেকে যেতে চাওয়া একটা এসেন্সের শাসন। এই এসেন্স মানেই তার পিছনে একজন বিষয়ী বা সাবজেক্ট, তার চিন্তার দর্শনের যুক্তিকাঠামোর এসেন্স, একটা শাসক অবস্থান। মেটোনিমরা বুনে তোলে ওই সাংস্কৃতিক ভূমির সমাপ্তি বা ক্লোজার, আর ওই বিষয়ী বা সাবজেক্ট তার মেটাফরিক উপস্থিতি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে এই সমাপ্তির পদ্ধতিটাকে, ক্লোজারটাকে ঘটায় — মেটাফর তো তাই যা চেনা মানুষের মুখ বদলে দেয় অচেনা মুখোশে। তাকে দেখা যায় না, চেনা যায় না। অশরীরী তার উপস্থিতি, প্রেতচ্ছায়ে তার ঘোরাফেরা। যেই বগলদাবা করা টর্চের আলো ফেলি তার মুখে অমনি সে উবে যায়, পড়ে থাকে শুধু সুধী সমাজের সিভিল সোসাইটির সিম্পটম। ওই ক্লোজারের অবরোধের তলায় যাকে ঘটে উঠতেই হবে।

হোমি ভাভার তত্ত্ব যেখানে শেষ সেখান থেকেই আমাদেরটা শুরু। ভাভায় আমাদের অনুপ্রবেশের জন্যে আমরা সাংস্কৃতিক বিনিময় নিয়ে করা ভাভার আলোচনার দুটো জায়গাকে বেছে নিচ্ছি। একটা অধীন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে বিষয়ী পাশ্চাত্য প্রভুর সাংস্কৃতিক বিনিময়, আর অন্যটা সার্বভৌম স্বাধীন উত্তরঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে।

কলোনিয়াল সংস্কৃতির প্রকৃতিকে ধরতে গিয়ে ভাভার ব্যবহৃত বর্গ মিমিক্রি, আমরা আগেই বলেছি। এই বর্গটা ভাভা এনেছেন লাকাঁ থেকে। মিমিক্রি মানে অনুসরণ, অনুকরণ, পুনরাবৃত্তি। আসল বা মূলকে মিমিক্রি পুনরাবৃত্তি করে চলে, কিন্তু পুরোপুরি নয়, নট কোয়াইট। একটা খামতি রয়ে যায়। হোমি ভাভা দাবি করেছেন যে কলোনিয়াল মানুষের সংস্কৃতি হল তার ঔপনিবেশিক কলোনাইজিং প্রভুর সংস্কৃতির একটা মিমিক্রি। কলোনিতে কিন্তু ভাভা কোনো রকমের কোনো হাইব্রিডকে খুঁজে পাচ্ছেন না। সেখানে শুধুই মিমিক্রি। হোমি ভাভার ইতিহাস ভাবনায় হাইব্রিডিটি বা সঙ্করতা আসছে পরে, যখন কলোনি আর নেই, অধীন রাষ্ট্র সার্বভৌম স্বাধীন হয়েছে, মানে পোস্টকলোনিতে। আবার, ভাভার তত্ত্বে, এই পোস্টকলোনিতে কিন্তু কোনো মিমিক্রি আর থাকছে না, সেখানে শুধুই হাইব্রিডিটি আর হাইব্রিডিটি। মোদ্দা কথায়, ভাভার মডেলে, কলোনি মানেই মিমিক্রি, পোস্টকলোনি মানেই হাইব্রিড।

আমাদের ভাভাবিরুদ্ধতার দুটো জায়গা। এক, আমরা মনে করি কলোনির সংস্কৃতিকে কখনোই মিমিক্রি দিয়ে পুরোপুরি বোঝা সম্ভব না। কারণ, আমাদের মতে, ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি যথেষ্ট সংখ্যক হাইব্রিডিটির চিহ্ন বহন করে, মানে, কলোনাইজার প্রভুর হেজেমনির উপস্থিতির চিহ্নকে। আর দুই, আমরা মনে করি, মিমিক্রি কোনো ভাবেই কলোনিয়াল সময়ে শেষ হয়ে যায় না, তা বেঁচে থাকে পোস্টকলোনিয়াল উপত্যকাতেও। এখনো আছে। যে তলে যে ভূমিতে এই মিমিক্রিটা এখনো সমানে চলছে সেই ভূমিটাই ভাভায় তথা গোটা পোস্টকলোনিয়াল সংস্কৃতিবিদ্যায় গরহাজির অনুপস্থিত। সেই ভূমিটাই আমাদের তৃতীয় বিশ্ব যাকে উত্তরআধুনিকতা নেই করে দিয়েছে। বা আমাদের মার্জিন অফ মার্জিন। এই সংস্কৃতিবিদদের, ভাভা ও ভাভানুসারীদের, এবার আমরা বোঝাতে চাই যে হাইব্রিড সাংস্কৃতিক ভূমি কোনোমতেই একটি

নিরপেক্ষ ভূমি নয়, সেখানেও শাসন আছে, ভয়ানকভাবেই আছে, শাসনটা আরো দুর্লক্ষ্য বলেই সেটা আরো ভয়ানক শাসন। উত্তরআধুনিক উত্তরঔপনিবেশিক পৃথিবীর পোস্টকলোনিয়াল হেজেমনির চারিয়ে দেওয়া এই আপাতসাম্যের রূপকথার ক্লোজারের অবরোধের নিচে গজিয়ে ওঠা সিম্পটম বা রোগলক্ষণই আমাদের মার্জিন অফ মার্জিনের তৃতীয় বিশ্ব।

## ৭।। বশীকরণ আর বশ্যতা

রণজিৎ গুহ থেকে শুরু করা যাক, তাতে একসময় আমরা পার্থ চ্যাটার্জি বা জ্ঞানপ্রকাশেও পৌঁছে যাব, যাদের সাথে গুহর একটা স্পষ্ট আত্মীয়তা আছে। সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ সঙ্কলনের ছয় নম্বর খণ্ডে গুহর 'ডমিনান্স উইদাউট হেজেমনি অ্যান্ড ইটস হিস্টরিও গ্রাফি'-তে প্রদত্ত অবস্থানের সঙ্গে পার্থ চ্যাটার্জির নেশন অ্যান্ড ইটস ফ্র্যাগমেন্টস : কলোনিয়াল অ্যান্ড পোস্টকলোনিয়াল হিস্ট্রিজ'-এর বা অন্যান্য সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ অবস্থানগুলোর একটা সরাসরি সম্পর্ক আছে। কলোনিয়াল এবং পোস্টকলোনিয়াল ক্ষমতাকে তাদের চেনার প্রকরণে। রণজিৎ গুহ আজকের চালু উত্তরঔপনিবেশিক তত্ত্বচর্চার জগতে অনেকটাই বিস্মৃতিতে চলে গেছেন। যা বোধহয় গুহর উনিশশো উননববইয়ের ওই কাজের প্রতি খুব একটা ন্যায়সঙ্গত আচরণ নয়। পরবর্তী তাত্ত্বিক বিকাশগুলোর অনেকটাই পথ বানিয়ে দিয়ে গেছে গুহর ওই কাজ। তিনি শুধু সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ স্কুল নামক ঘরানাটারই জন্ম দেননি, তার চেয়ে আর একটু বেশি কিছু করেছেন। আসুন গুহর মত করে আমাদের ঔপনিবেশিক ইতিহাসকে পড়ার চেষ্টা করা যাক।

মাথার মধ্যে আনুন একটা ঔপনিবেশিক জনগোষ্ঠীকে। তাদের চোখের সামনে তাদের প্রভু, কলোনাইজার সাহেব। সম্পর্কটা এখানে প্রভু-ভৃত্য : কলোনাইজার-কলোনাইজড। এদের ভিতরকার পারস্পরিক সম্পর্কটা গোটাটাই ধরা আছে খুব স্পষ্ট কিছু বশীকরণ আর বশ্যতা, ডমিনান্স এবং সাবঅর্ডিনেশন-এর ক্রিয়ার ভিতর। প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক সবসময়েই যা হয়। বশীকরণ বা ডমিনান্স থাকা মানেই তার একটা অপর বা আদার থাকা — বশ্যতা, সাবঅর্ডিনেশন। প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক বা মাস্টার-সার্ভেন্ট রিলেশন হল বশীকরণ আর বশ্যতা এই দুটোকে মিলিয়ে এই দুটোর একটা জট বা কমপ্লেক্স । আবার বশীকরণও কিন্তু কোনো সোজাসাপ্টা ভালোমানুষ নয়, তারও ভিতরে ভিতরে জিলিপির প্যাঁচ। সে ব্যাটা নিজেই একটা কমপ্লেক্স। পারসুয়েশন আর কোয়েরশন, প্রভাব এবং প্রতাপ-এর। আমি কাউকে আমার বশ করতে পারি দুটো রকমে, এক, চাপ সৃষ্টি করে, গায়ের জোরে, আমার প্রতাপ দেখিয়ে — মানে কোয়েরশন। আর দুই, তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে, তার চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে প্রভাবিত করে, তার উপর আমার প্রভাব খাটিয়ে — মানে পারসুয়েশন। এবং যে কোনো একটা জ্যান্ত বশীকরণকে ভেবে দেখুন, ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষকের, ছেলেমেয়েকে বাবামার, বা কর্মচারীকে মালিকের, বা কলোনাইজডকে কলোনাইজারের — সবগুলোতেই বশীকরণের প্রক্রিয়াটার ভিতর কিন্তু প্রতাপ আর প্রভাব দুটোই মিশে আছে। শাসক হিশেবে নিতান্তই হাড়েহারামজাদা না হলে শুধু প্রতাপের দরকার পড়ে না। আর অমিত রায় তো ভারি স্পষ্ট ভাবে প্রতাপের চেয়ে প্রভাবের দক্ষতর জায়গাটাকে চিহ্নিত করে দিয়েছিল — আফিংওয়ালি শাসন করে আবার ভোলায়ও, যেখানে চাবুক শাসন করে বটে কিন্তু ভোলায় না।

অন্যদিকে, বশ্যতাও আবার একটা কমপ্লেক্স। দুটো ক্রিয়ার একটা কমপ্লেক্স বা জট। কোলাবোরেশন এবং রেজিস্টান্স। অনুবাদ এবং প্রতিবাদ। কিছু লোক শুধুই অনুবাদ করে যায়, সাহেবদের লেখা, তাদের ফুটনোট, কখনো কবিতা কখনো দেরিদা। আবার কিছু লোক প্রতিবাদ করে, সাহেবদের জেলে সাহেবদের কয়েদি নেটিভ যতীন দাশ জ্ঞান থাকার শেষ মুহূর্ত অব্দি তার শরীরে খাদ্য আসার নল খুলে ফেলছিলেন বারম্বার। এবং একটা বাস্তব পরিস্থিতির বাস্তব বশ্যতার প্রক্রিয়ায় সবসময়েই এই দুটো উপাদানই মিলে মিশে থাকে একটা জট তৈরি করে। অর্থাৎ, প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক হল ডমিনেশন এবং সাবঅর্ডিনেশন নামক দুটো কমপ্লেক্সের একটা কমপ্লেক্স।

আমরা ধরে নিই যে কলোনাইজড অধীন জাতির দিক থেকে এই প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টা খুব সরল সমস্বত্ত্ব একটা ইউনিফর্ম ব্যাপার। আমরা ভাবি, ভৃত্যের বাস্তবতার সবগুলো এলাকার উপরই তা সমানভাবে

কাজ করে, কলোনির রামা আর শ্যামা, বাঘ আর গরু, কৃষ্ণ এবং কংস, জমিদার এবং রায়ত, আমলা এবং আমজনতা সবাই বুঝি একই ভাবে প্রভাবিত হয়, একই ক্ষুরে মাথা মোড়ায়। আমরা ধরে নিই পারসুয়েশন নামক বিষয়টি অত্যন্ত হোমোজিনিয়াস। এবং বাইরে থেকে প্রদত্ত। মানে, অধীন উপনিবেশের কাছে পুরোটাই তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তার উপর যা চাপিয়ে দিয়েছে তার সাহেব প্রভু — সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি — তুমি কলোনাইজারই কর্তা, আমি কলোনাইজড হলাম কর্ম, নিতান্তই কর্ম। অথচ দেখুন এই প্রভাবগুলো গজিয়ে উঠছে, ছড়িয়ে পড়ছে, ভেসে আসছে এমন একটা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র থেকে এমন আর একটা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যার উভয়ের শরীরেই প্রচুর প্রচুর বহুমুখিতা, নানা ধরনের প্রবণতা এবং প্রতিক্রিয়ার সে একট পাঁচমিশেলি তরকারি। এবং সে তরকারির ঝিঙের গায়ে কামড় দিয়ে কুমড়োর স্বাদ বেড়ে পাওয়া যায়, একই কড়াইয়ে একই সাথে রান্না হতে হতে তারা এ অন্যে প্রত্যেকে প্রত্যেকের দ্বারা অতিনির্ণীত হয়ে বসে আছে। এবং, ভেবে দেখুন, কী অন্যায়, একই সময় ধরে আগুনে টাল খাওয়ার পরেও, বেটা কুমড়ো কিনা প্রায় গলে গেছে, যেখানে কাঁঠালের বিচিগুলো প্রায় অবিকৃত। ধরুন অমল, অমন ইয়ে, আর কী বলব সুন্দরী সুলেখিকা উদার মনের বৌদিকে ভুলতে খুব বেশি হলে সোয়া পাঁচ সেকেন্ড নিল যেই তার মেডিটেরানিয়ানের ডাক এল, কিন্তু সব অমলই কি অমন অমল? বিলেত যাওয়ার কথা মাথায়ই এল না আর, আর এক বৌদিকে নিয়ে, নয় সে খুব চারু নয়, একটু বেশি উজ্জ্বল, একটু বেশি কিরণময়ী, ভেগে গেল কিনা মেডিটেরানিয়ানের একদম উল্টোদিকে, আরো পূবে, ব্রহ্মদেশে? কোনো কোনো অমল তো একটু চরিত্রহীনও হয়। হোক না কলোনাইজড তাই বলে কি সব অমলেরই চরিত্র এক? কিন্তু আমাদের উত্তরঔপনিবেশিক তাত্ত্বিকরা, কী সক্ষম স্মৃতিভ্রংশে বেমালুম ভুলে হজম করে দিলেন যে হোক না ভৃত্য জাতির নেটিভের বাচ্চা নেটিভ তারা সবগুলো গাধাই একই সঙ্গে একই মুলোর পিছনে একই গতিতে দৌড়য় না, যতই সিডাক্টিভ মুলো সেটা হোক না কেন। যেখান থেকে ওই প্রভাব পারসুয়েশন পয়দা হয় সেই সাহেব সংস্কৃতির বিভিন্ন বহুমুখিতা বেশ মনে রাখলেন এই তাত্ত্বিকেরা, কিন্তু যেখানে সেটা পৌঁছয় সেই নেটিভকে ধরে নিলেন সমস্বত্ত্ব। সাহেবদের লেখায় যেমন, একাধিক জায়গায় দেখেছি, সব ভারতবাসীকেই একইরকম দেখতে লাগে তাদের, কোথাও বা সব চৈনিককেই একইরকম দেখতে লাগে, আর হুবহু এই একই বাক্য প্রায় পেয়েছিলাম সাদা আর কালোদের দাঙ্গা নিয়ে তোলা এক তথ্যচিত্রে, যেখানে এক সাদা পুলিশ অফিসার চেঁচাচ্ছে, সব নিগাররাই এক, কারোর সঙ্গে কারোর কোনো ভেদ নেই। পরে, আমাদের আলোচনায় আমরা দেখতে পাব এই উত্তরঔপনিবেশিক সংস্কৃতিবিদ্যাগুলোর এই সীমাহীন অপারগতা, আপাত সাম্যের ভিতর অসাম্যের ফল্গুটাকে খুঁজে না পাওয়ার একটা বড় কারণ এই যে এরা এদের দৃষ্টিকোণের দিক থেকে অনেকাংশেই নেটিভদের চেয়ে সাহেবদের প্রতিনিধিত্ব বেশি করেন।

এবার আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করার, প্রভু-ভৃত্য পারস্পরিকতার এই গতিবিজ্ঞানে প্রভাব আর অনুবাদ, পারসুয়েশন আর কোলাবোরেশন কিন্তু ক্রিয়া করে আলাদা আলাদা সাংস্কৃতিক ভূমিতে। তারা গুণগতভাবে পৃথক। পৃথক তাদের উদ্দেশ্য আর বিধেয়দের জগতে। পারসুয়েশন আর কোলাবোরেশন এই দুটো পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে একটা বিনিময় সম্পর্কে থাকে। পারসুয়েশন বা প্রভাব প্রবাহিত হয় সাহেব থেকে নেটিভে। আর কোলাবোরেশন বা অনুবাদ প্রবাহিত হয় নেটিভ থেকে সাহেবে। কিন্তু এবার এই সাহেব আর নেটিভ যদি দুটো আলাদা সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে, তাহলে তাদের মধ্যে এই বিনিময়টা ঘটবে কী করে? একটা সাংস্কৃতিক ভূমি থেকে আর একটা সাংস্কৃতিক ভূমিতে এই বদলাবদলিটা ঠিক কী ভাবে ঘটে সেটা বিশদ করা প্রয়োজন। একদম দুই আর দুই চার এটা নয়। পারসুয়েশন যা তারই ঠিক ঋণাত্মক বা নেগেটিভটা হল কোলাবোরেশন এমনটা কিন্তু নয়। কারণ, দুটো আলাদা আলাদা সংস্কৃতির আলাদা আলাদা জনগোষ্ঠী এই ক্রিয়াটায় অংশ নিচ্ছে। কোলাবোরেশন করছে নেটিভরা, তাদের ভূগোলে, তাদের ইতিহাসে, তাদের ভাষায় তাদের চিন্তায় একটা নেটিভ জগত। আবার সাহেবদের ঠিক ওরকমই একটা বাস্তবতা আছে পারসুয়েশনের। এবং এদুটো পুরো আলাদা জগত। শুধু তারা বিনিময় সম্পর্কে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ। আর বিনিময় করতে হলে একজনকে অন্য জনের বুঝতে হবে। সাহেবকে যদি তার অধীনস্থ নেটিভদের পারসুয়েড করতে হয়, তাহলে এটা একটা জরুরি শর্ত যে সাহেবের ভাষা নেটিভদের বোধগম্য হতে হবে।

(এটা জরুরি, কিন্তু যথেষ্ট শর্ত নয়, মাথায় রাখবেন। মানে, ভাষা বোঝার পরও নেটিভরা সাহেবকে কোলাবোরেট না করতে পারে, তারা অনুবাদ নাও করতে পারে, প্রতিবাদও তো করতে পারে। বা, এমনকি, অনুবাদ বা প্রতিবাদ কোনোটার মধ্যেই না গিয়ে দুটোরই বাইরে বিয়ন্ডে একটা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন তাত্ত্বিক অবস্থানও গড়ে তোলার চেষ্টা করতে পারে।)

এবার প্রশ্নটা এইটাই যে সাহেব প্রভু কিভাবে ওই সাংস্কৃতিক ভূমিটা নির্মাণ করবে যাতে তার আর নেটিভ ভৃত্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়টা, মতের আদানপ্রদানটা ঘটে চলতে পারে? বা এই প্রবন্ধের একদম গোড়ার দিকের আমাদের আলোচনার সাপেক্ষে প্রশ্নটাকে আর এক ভাবে করা যায়, একজন ঔপনিবেশিক প্রভু কী প্রক্রিয়ায় তার উপনিবেশের নেটিভ প্রজাদের মধ্যে নিজের হেজেমনিটা তৈরি করবে, যাদের সঙ্গে তার ভাষাটাই আলাদা? তৈরি করবে তার প্রতাপের নয় প্রভাবের রাজনীতি, কোয়েরশন নয় পারসুয়েশন? ধরুন এক তামিল ফেরিওলা, সে ঘুমিয়ে পড়েছিল চেন্নাইয়ে, ঘুম ভাঙল কলকাতায়, সে তামিল ছাড়া আর কিছুই জানে না, তার মালের গায়েও বিবরণগুলো লেখা তামিলে, সে তো কেলিয়ে লোককে কেনাতে পারে না, সে এবার কলকাতার গলিতে তার মাল বেচবে কী করে, লোককে আগ্রহী করবে কী করে?

আমরা সবাই জানি, ক্যাপিটালিজম যে শুধু কোয়েরসিভ-ই হবে, বলপ্রয়োগের প্রতাপের ভিত্তিতে লোককে শাসন করবে তা নয়। মানুষকে, মানুষের হৃদয়কে পুঁজিতন্ত্র ভালোই ফুঁসলে নিয়ে যেতে পারে। তার কাছে সে ধরনের গুংগা-যন্ত্র অনেক আছে, যাতে নাকের সামনে ঝুলন্ত মন্ডা দেখে প্রাকপুঁজির মানুষ দৌড়ে দৌড়ে পুঁজির কাছে চলে আসবে, আট ঘন্টার রাস্তা এক ঘন্টায়। পুঁজির মানুষ দৌড়বে পুঁজিতর শাসনের দিকে। নেহরু যা পারলেন না তা ইন্দিরা পারবে, ইন্দিরা না পারলে মনমোহন, তাতেও না হলে হাতে আছে যশোয়ন্ত। গান্ধীব্র্যান্ড সমাজতন্ত্র, না হলে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ, না হলে মুক্ত অর্থনীতি না হলে পাকিস্থানের জুজু ... স্লোগানের তার অভাব হবেনা, ফুঁসলে ঘর থেকে বার করে আনার নটখটের। খেয়াল রাখুন, 'ফুঁসলে' নিয়ে যাওয়া, বন্দুক দেখিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া নয়। অর্থাৎ, বলপ্রয়োগ দিয়ে নয়, প্রতাপ দিয়ে নয়, প্রভাব দিয়ে মানুষের মধ্যে পুঁজির শাসন চারিয়ে দেওয়ার প্রকৌশল ক্যাপিটালিজমের ভালোই জানা আছে। এক কথায় খুব চোস্ত একপিস হেজেমনি আছে ক্যাপিটালিজমের। এ অব্দি সবাই বেশ ভালোই বোঝে। ক্যাপিটালিজম আর তার হেজেমনিকে। ধেড়িয়ে যায় উপনিবেশে গিয়ে। ভেবে ফেলে যে উপনিবেশ মানেই বুঝি প্রভাব নয় প্রতাপ। বলপ্রয়োগ আর গুলি, ফাঁসির দড়ি আর টেগার্টের লাথি। মাঝরাত্তিরে গোরা চেকার এসে ট্রেনের কামরা থেকে কান ধরে নামিয়ে দেওয়া। উপনিবেশ নিয়ে চালু তত্ত্বগ্রন্থগুলোর সবারই সেই এক মত। উপনিবেশ মানেই কোয়েরশন। গুহ ঠিক তাই ভেবেছেন, তিনি ধরে নিয়েছেন উপনিবেশের শাসন মানেই কোয়েরসিভ শাসন। সাহেবদের সঙ্গে কোনো নেটিভের এক লাইনে খাড়া হওয়া মানেই সেখানে, হয় সেই বেটা নেটিভ একটা মীরজাফর বা বিভীষণ, বা এই পাশে দাঁড়ানোর পুরো গল্পটাই ইংরাজের অপপ্রচার, বানানো মিথ্যের জাল।

এই ভাবাটা সব অর্থেই একটা ছেলেমানুষি। খুব সরলমতি বালকের ইনোসেন্স। আসলে এভাবে ভাবতেই তো ভালো লাগে। এইসব বীরত্বের গাথা আর বেদনার অশ্রুজল পড়তে হয়ত হেভি লাগে, কিন্তু গাবিয়ে যায় ইতিহাস বোঝার জায়গায় এসে। নানা বা সানির হিন্দি সিনেমাগুলোয় যেমন হয় দেখবেন। প্রহার, ক্রান্তিবীর, পরিন্দা, বা, ঘায়েল, দামিনী, জিদ্দি। নায়কের সঙ্গে শুধু অন্যায়ই করা হচ্ছে, আর তারা শুধু লড়ে যাচ্ছে, লড়ে যাচ্ছে, লড়ে যাচ্ছে, অন্যায়ের দুনিয়ার সঙ্গে তাদের কোনোরকম কোনো কোলাবোরেশন নেই। বরং এ তুলনায় গুলামের আমীর খান অনেক শিক্ষিত। আমীর নিজে একটা খুনে অংশ নিল, এবং তার চেয়েও বড় কথা, আমীর জানে তার বাবা তাদের চিরকাল গুল মেরে এসেছে নিজের স্বদেশী আন্দোলনের বীরত্ব নিয়ে। তারপর ধরা পড়ে যাওয়া, নোংরা প্রমানিত হয়ে যাওয়া, বাবা সুইসাইডও করেছে। তার পরেও আমীরের বাবাকে ভালোবাসতে বা বাবার সঙ্গে আইডেন্টিফাই করতে অসুবিধা হয়না। সে জানে বাবা ওটা হতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু স্বপ্নে সেই মীরজাফর বাবা আসলে সিরাজদৌলা হতে চেয়েছিল। নইলে সে ছেলেদের ওই গল্প করত না, ওরকম হতে বলত না। কী অসম্ভব শিক্ষিত স্ক্রিপটের সেই অংশটা, মাফিয়ার অ্যাকাউন্টান্ট রজিত কাপুর দাদা, আর ইচ্ছে করে প্রতিরোধ হিশেবে বক্সিং রিঙে হেরে যাওয়া ক্ষতবিক্ষত

রক্তাক্ত আমীরের সেই কথোপকথন। দাদার কাছে আমীর বাবাকে ব্যাখ্যা করছে, নিজের বাবাকে ডিকন্সট্রাক্ট করছে। বাস্তব নয়, সেই স্বপ্নের সততা, স্বপ্নের বীরত্বকেই সম্মান করতে পারে, ভালোবাসতে পারে আমীর। আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের রূপকথার বিপরীতে উত্তরঔপনিবেশিক নায়ক গুলামের আমীর খান। যে সিন্থেটিক হেজেমনিকে চেনে, শুধু সিম্পল হেজেমনির ইনোসেন্স দিয়ে পৃথিবীকে বোঝার চেষ্টা করে না। সে কথায় আমরা পরে আসছি।

হয় ওই ভিলেন বিশ্বাসঘাতকতার নয় ইংরাজ মিথ্যার এই ধারণাগুলো চালু উত্তরঔপনিবেশিক তত্ত্বকে কোনোদিন কলোনিয়াল ইংরাজ শাসনের গভীর ব্যাপকতাটাকে বুঝেই উঠতে দেয়নি। বুঝে উঠতে দেয়নি কী ভাবে সেটা বাইরে ভিতরে মননে সংস্কৃতিতে কাজ করে চলে। ইংরাজ শাসনের শক্তি ও ক্ষমতার জায়গাটাকেও তাই এই তাত্ত্বিকেরা কমিয়ে দেখেছেন, ঠিক ভাবে দেখে উঠতে পারেননি। তারা দেখতে পাননি কী ভাবে কলোনিয়াল শাসন মানুষের মন ও হৃদয় অব্দি ঢুকে যায়, তাদের ভাঙে বিকৃত করে বদলায়, এবং বানিয়ে তোলে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা মনন প্রক্রিয়া — যার নাম ঔপনিবেশিক মন, কলোনিয়াল মাইন্ড।

আর আকাশকে ছোট করে দিলে গাছ তো বড় লাগবেই। অন্তরের অন্তঃস্থল অব্দি চারিয়ে যাওয়া এই শাসনকে খেলো করে দেখানো মানেই, বড় করে তোলা আমাদের সেই নবজাগরণের দিশারীদের। ইংরাজ শাসনের দুর্গম গিরি কান্তার মরু তরিয়ে দেবার কান্ডারীদের। ফলতঃ, আমাদের এই লজিক আমাদের জানায় যে এমনটা হতেই পারে, আমাদের সেই মহাপুরুষেরা আসলে তাদের পাঁজরের নিচে বয়ে বেড়াতেন একখানি করে 'ঔপনিবেশিক মন', শরীরের শিকল ভাঙার লড়াইয়ে ব্যস্ত তারা এই মনের শিকলকে খুঁজেই পাননি। তাই, যতক্ষণ না এই কলোনিয়াল মনের সমস্ত গতিবিজ্ঞান আমরা ধাতস্থ করে উঠতে পারি, আমাদের পক্ষে কিছুতেই বুঝে ওঠা সম্ভব না কলোনিয়াল ইংরেজের হেজেমনির গতিপ্রকৃতি। বোঝা সম্ভব না অচেতন মনের গভীর গোপনে কাজ করে চলা সেই হেজেমনির তাত্ত্বিক সব কূটকচাল। আর সেটা করতে গেলেই আমাদের সিম্পল স্পেসের শৈশবিকতার বাইরে এসে দাঁড়াতে হবে। বুঝতে হবে, বাঁশবাগানটাই হাপিস হয়ে গেছে, সেখানে প্রোমোটারের বিল্ডিং, সিপিএম আর তৃণমূল দুদিকই পাত্তি খেয়েছে প্রোমোটারের, হাইরাইজে আর আকাশই দেখা যায় না, তাই কাজলাদিদির চাঁদ আর উঠবার কোনো সিনই নেই। দুনিয়াটা এখন সিন্থেটিক — এসো হাত ধরো — তোমাকে একটু বড় হতে শেখাই।

## ৮।। ঔপনিবেশিক হেজেমনি

কলোনিয়াল হেজেমনি নিয়ে চালু আলোচনাগুলো ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক ভূমি বলতে বোঝে একটা সরল ভূমিকে, যেখানে কাজ করে একটা সিম্পল হেজেমনি। তাই তারাও কলোনিয়াল হেজেমনির উপস্থিতি বা অভাব বলতে বোঝে ওই সিম্পল হেজেমনির উপস্থিতি বা অভাব। হেজেমনির যে নানা প্রকারভেদ হয়, সিম্পল কমপ্লেক্স সিন্থেটিক, এই প্রবন্ধের একদম গোড়ায় অনেকটা জায়গা জুড়ে যে আলোচনা আমরা করে এলাম, সেই জটিলতাগুলো এরা বোঝেই না।

এবার সিম্পল বা সরল সাংস্কৃতিক ভূমি মানেই, যেমন আগেই বলেছি, যেখানে ওই প্রভাব বা পারসুয়েশন এবং তার প্রতি অনুবাদ বা কোলাবোরেশন দুটোই ঘটে একই একটা সমস্বত্ত্ব ভূমিতে, যার কোনো বেশিকম উঁচুনিচু সাদাকালো নেই, অনেকটাই সেই ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসায় রিনির মাকে শিব্রামের সাবান ঘষার মত। চোখ বন্ধ করে পরম ব্রহ্মদর্শন করতে করতে। বা একটুও চিনি নিচে না পড়ে থাকা চিনির জলের মত। গেলাশের যেখান থেকেই জল তুলুন একইরকম মিষ্টি। তা এহেন সমদর্শী সমস্বত্ত্ব ভূমিতে পুরো ব্যাপারটা খুব মসৃণ, যেন মাখনের ভিতর দিয়ে ছুরি। সাহেব বলল, 'এসো নেটিভ তোমায় পারসুয়েড করি', নেটিভ বলল, 'করো নাথ', এবং সে পারসুয়েডেড হল। সাহেবের প্রভাব ছড়িয়ে গেল তার উপর। সে এবার অনুবাদ করতে শুরু করল, কোলাবোরেট করল সাহেবের সঙ্গে। এটা হল সমাধান নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু আসে ওই পারসুয়েশনের ব্যার্থতায়। সেখানে সাহেব পারসুয়েডই করতে পারল না। আর সাহেব যদি পারসুয়েড নাই করে নেটিভ বেচারা ছাই পারসুয়েডেড হবে কী করে? অর্থাৎ, ব্যর্থতাটা পারসুয়েশনের ব্যর্থতা। পুরো প্রসেসটায় আর কোনো জাটিল্য নেই। পারসুয়েশনটা যদি সাহেব করে উঠতে পারে একবার,

সে মাল ঠিক পৌঁছে যাবে নেটিভের কাছে, সেই কমিউনিকেশনে কোনো ঘাপলা নেই। এবার সাহেবের এই পারসুয়েশন নামক সিগনাল পাঠানোর ব্যর্থতা, তার মানে মোটের উপর পারসুয়েশন-কোলাবোরেশন-এর ব্যর্থতা মানে এককথায় হেজেমনির ব্যর্থতা। হেজেমনির অভাব।

এই প্রশ্নটা কেউ একবারও করেনা, কেন, পারসুয়েশন ছাড়া আর কোনো এলাকায় কি কোনো গড়বড় ঘোটালা ঘটতে পারে না? কমিউনিকেশনটা যদি কেৎরে যায়? এটা কেন ভাবছি না আমরা যে সাহেব তার এই পারসুয়েশন সিগনালটা পাঠিয়ে উঠতে পারল না কেন? এবং এবার এই সমস্যাটাকে সাহেব কী ভাবে হ্যান্ডল করবে? এই কমিউনিকেশন ভেঙে পড়া পরিস্থিতিতে সে নতুন হেজেমনি পয়দা করবে কী উপায়ে? এমন কোনো একটা হেজেমনি যা শুধুমাত্র ওই অপারগ পারসুয়েশন সিগনালের উপরই নির্ভর করবে না, কারণ ওরা যে অপারগ তা তো আগেই প্রমাণিত — সেই হেজেমনিতে সে পৌঁছবে কী করে? আর শুধু তাই নয়, সিগনাল সংযোগটা আদৌ ঘটে উঠবে কী করে — যদি প্রভু আর ভৃত্য, সাহেব আর নেটিভ দুটো আলাদা সাংস্কৃতিক ভূমির প্রতিনিধিত্ব করে, মানে, ওই পারসুয়েসিভ সিগনাল আর তার বিপরীতে কোলাবোরেটিভ সিগনাল যদি ঘটে ওঠে দুটো আলাদা ভূমিতে? ধরুন সাহেব পারসুয়েড করছে ইংরিজিতে, আর নেটিভের কোলাবোরেশন, যদি আদৌ ঘটে সেটা, ঘটবে বাংলায়? এরকম তো হতেই পারে, মানে এরকমই তো হয়, তাহলে কী করে সংযোগটা হবে?

এখানে আমাদের যুক্তি এই যে এই প্রাথমিক ব্যর্থতার পর সাহেবের এবার দরকার পড়বে একটা কৃত্রিম সিন্থেটিক সাংস্কৃতিক ভূমি নির্মাণের। এই জটিলতর ভূমি এবার ওই দুই বিপরীত পক্ষ মানে পারসুয়েশন আর কোলাবোরেশন দুটোকেই ধারণ করবে তার নিজের শরীরে। সেখানে পারসুয়েশন আর কোলাবোরেশন কেউই তাদের পুরোনো সরল চেহারায় আর থাকবে না। তারাও এখন বদলে গেছে তাদের সিন্থেটিক চেহারায়। তারা দুজনেই এখন একটা বৃহত্তর শাসনের অংশ, বৃহত্তর পিতৃ-ডিসকোর্সের, সাহেবের ডিসকোর্সের, অংশ। জাস্ট তার দুটো আলাদা আলাদা খণ্ড, মুহূর্ত। তার মানে এখানে এই পরিবর্তিত পারসুয়েশন আর কোলাবোরেশন দুই-ই এবার প্রবাহিত হবে এই নির্মিত সিন্থেটিক পিতৃ-ডিসকোর্স থেকেই। এবার এই সিন্থেটিক সাংস্কৃতিক ভূমিকে আমরা বুঝব একটা তাত্ত্বিক ভূমি হিশেবে যেখানে সাহেব থেকে নেটিভে বয়ে আসে একটা পরিবর্তিত পারসুয়েশন তরঙ্গ, এবং উল্টোমুখে নেটিভ থেকে সাহেবে ধেয়ে যায় একটা পাল্টা কোলাবোরেশন বীচিমালা, সেও গেছে বদলে তার খোদ আদত প্রাথমিক চেহারা থেকে।

তার মানে, এই জায়গাটা মন দিয়ে লক্ষ্য করুন, শুধুমাত্র সাহেবের পারসুয়েশন থেকে সরাসরি আমরা কিন্তু সিন্থেটিক স্পেস পেলাম না। নেটিভের নিজস্ব বাস্তবতার নীতিগুলোকে নিয়ে, নেটিভের যে নিজের ভূমি তাকে নিজের ভিতর এনে, আত্তীকরণ করে নিয়েছে সাহেবের যে পারসুয়েশন তার থেকেই আসছে এই সিন্থেটিক ভূমি। এর মধ্যেই রয়ে গেছে নেটিভের স্বভূমি। (কী নেই সেখানে, ছৌ আছে, পাকোড়া আছে, বিনটিকিটের বাচ্চাদের কোলাহল আছে, এথনিক আছে, রবিবাবুর গান আছে, সঠিক যথার্থ 'স্বভূমি', কিন্তু যে আড্ডা যে ভ্রমণ সেখানে ঘটবে স্টেডিয়ামের পাশে সল্টলেকের খিড়কিপুকুরের মাঠে সেই আলাদা করে আড্ডা মারতে যাওয়ার ধারণাটার ভিতরেই এখন বসবাস করছে পরভূমি পরবাস : আমেরিকা।) নেটিভের স্বাধীন সাংস্কৃতিক সত্তাকে গিলে নেওয়ার পরে এই নির্মিত কৃত্রিম তৈরি করে নেওয়া ক্ষেত্রের মধ্যেই বসবাস করছে নেটিভের নিজস্ব ভূমি, শুধু একটা স্থানান্তরিত রকমে। ভিটে তার বদলে গেছে। তার একটা ডিসপ্লেসমেন্ট ঘটেছে। এই সিন্থেটিক সাংস্কৃতিক ভূমিতে একই সাথে ঘনীভূত, কনডেন্সড হয়ে আছে সাহেব প্রভুর পরিবর্তিত পারসুয়েশন এবং নেটিভ ভৃত্যের স্থানান্তরিত স্বভূমি। নেটিভের নিজস্ব অস্তিত্বের আভ্যন্তরীন নীতিগুলো এখন বসবাস করছে এই ভূমিতেই। প্রভু তাদের বদলে নিয়েছে, বিকৃত করে নিয়েছে, রিফর্ম করে নিয়েছে, নেটিভই আর নেটিভ নেই, সে এখন সাহেবের হাতে সংস্কৃত। নেটিভকে সংস্কার করে তার অস্তিত্বের নীতিগুলোকে তুলে নিয়েছে সাহেব, তাদের জুতে দিয়েছে তার পরিবর্তিত পারসুয়েশনের জোয়ালে এবং ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে ফের নেটিভের কাছে। অবিকল লালমোহনবাবুর গলায়, বিস্ফারিত চোখ নেটিভ এবার চেঁচাচ্ছে, 'এটা আমার'। এই নতুন 'এটা আমি' নেটিভ এবার বেড়ে বুঝতে পারে

সাহেবের বেত, বেত না হোক গাজর, গাজর না হোক গান। তার ফুলের উপর দুলতে হলে এখন থেকে আইরিশ গানের সুর দরকার পড়বে, আরো আমোদের কথা এই যে সেটা তার নিজেরই গান বলে মনে হবে, খেরেস্তানদের ভয়াল ভয়ঙ্কর রোমহর্ষক ভগবানকে (পুরো হেমেন রায়ের সিরিজ বলা যায়) এখন থেকে সে নিজের ব্রহ্ম বলে ভাববে।

সিন্থেটিক স্পেস সাহেব প্রভুর একটা মতাদর্শগত ইডিওলজিকাল প্রোজেক্ট, একটা নতুন ধরনের উচ্চারণ, আর্টিকুলেশন, চিন্তা ও মননের জগতে একটা নতুন নির্মাণ। মননের আর উচ্চারণের যে নতুন রকমের ভিতর প্রভু আর ভৃত্যের পুরোনো পরিচিতিগুলোই বদলে যাচ্ছে। পুরোনো নামগুলোর পিছনে তাদের মননের চিন্তার উচ্চারণের অস্তিত্বগুলোই বদলে যাচ্ছে। সিম্পল স্পেসকে আমরা পেতাম সরাসরি সাহেবের পারসুয়েশন থেকে। সাহেবের প্রভাব থেকে সরাসরি প্রবাহিত হত নেটিভের অনুবাদ, দুয়ে মিলে হাতধরাধরি করে হাঁটত উপনিবেশের উপত্যকায় আর আমরা তাত্ত্বিকজনেরা সিম্পল স্পেসের আলোয় আলোকিত হতাম। তাই, সিম্পল স্পেস মানেই ছিল — এক, একটা সমস্বত্ত্ব সাংস্কৃতিক ভূমি, হোমোজিনিয়াস কালচারাল স্পেস, যে ভূমি জুড়ে সাহেবের পারসুয়েশন আর নেটিভের কোলাবোরেশন দুয়ে মিলে নেচে বেড়ায়। দুই, নেটিভের কোলাবোরেশন হল সাহেবের পারসুয়েশনের সরাসরি বিপরীত — একদম ঋজুরেখ একটা সম্পর্ক। তিন, নেটিভের চিন্তায় চেতনায় মননে আর এমন কোনো কিছুই আর অবশিষ্ট থাকছে না যা ওই সাহেবের পারসুয়েশনের বিপরীতে তার নিজের কোলাবোরেশনের বাইরে। এই তৃতীয়টা আসছে ওই সমস্বত্ত্বতার শর্ত থেকে। যদি সে সমস্বত্ত্বই হয়, তার মানে, চাকর বেটা একদম বিশুদ্ধ সম্পূর্ণ চাকর, তার আচরাচর চাকরতায় কোনো অবিশুদ্ধতা নেই, অন্য কোনো কিছুর মিশেল নেই। শক্তি তার একটা কবিতায় লিখেছিলেন, 'সম্পূর্ণ সঙ্গম করে কুকুরেরা, নরনারী পুত্রার্থে ধেয়ায়'। সেই কোলাবোরেটিভ অনুবাদরত সম্পূর্ণ চাকরের মধ্যে কোনো অন্য কিছু, অন্য প্রশ্ন, অন্য প্রতিবাদ আর অবশিষ্ট নেই। তাই শাসন মানেও সম্পূর্ণ শাসন। সিম্পল স্পেসের হেজেমনি মানে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ হেজেমনি।

সবটা মিলিয়ে, সিম্পল স্পেস মানেই শাসক শ্রেণীর চারিয়ে দেওয়া ধারণা এবং বর্গগুলো নিয়েই গড়ে উঠবে গোটা বাচনটা, গোটা প্যারাডাইমটা, তার ভাষা, কৃষ্টি, অর্থ, সঙ্কেত সব কিছু সহ। এই বাচনের মধ্যেই প্রবাহিত হবে সাহেব থেকে নেটিভে পারসুয়েশন আর তার সঠিক সম্পূর্ণ বিপরীতে নেটিভ থেকে সাহেবে কোলাবোরেশন। প্রাকৃত বা সাবঅল্টার্ন যে তাদের শাসকের সাথে কোলাবোরেট করছে তার এক এবং একমাত্র কারণ এই যে তারা শাসক শ্রেণীর প্রচারিত ওই ধারণা বর্গ চিন্তাগুলোকে ইতিমধ্যেই নিজের বলে ভেবে নিয়েছে। অর্থাৎ, এই ক্ষেত্রে নেটিভের কোলাবোরেশন নিশ্চিত ভাবেই সাহেবের পারসুয়েশনের প্রতিবিম্ব, মিরর ইমেজ, ঋণাত্মক বিপরীত।

অবশ্যই আমরা, তত্ত্ববাজরা, জানি যে এই সমাজ শ্রেণীবিভক্ত। আর এও জানি যে প্রভু চালিত হয় কেবলমাত্র তার নিজের শ্রেণীস্বার্থ দিয়ে। প্রভু তাই সেই সমস্ত চিন্তা ও ধারণাকে সামগ্রিক সমাজের জন্যেই সত্যি বলে তুলে ধরে যা আসলে, প্রকৃত প্রস্তাবে, শুধুমাত্র তার নিজের। তার নিজের শ্রেণীস্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সেগুলোকেই সে চাউর করে দেয় 'সর্বসাধারণের সত্য' এই তকমা পরিয়ে। এবার প্রাকৃত সাবঅল্টার্ন যখন কোলাবোরেট করে, শাসক প্রভুর চিন্তার সঙ্গে প্রতিবাদ নয় অনুবাদ করে, সেটা সে করে এই বিশ্বাস থেকে যে ওই শ্রেণীস্বার্থসঙ্গত নীতিগুলো আসলে সারা বাস্তবতা জুড়েই প্রযোজ্য। (পরিবারের অন্নপূর্ণা মা-নারী যখন বৃহত্তর ক্যাপিটালিস্ট বাজারের বাজার-প্রতিযোগী নারীর নীতিগুলোকে নিজের উপর আরোপ করে, তার শরীর মনের সমগ্র এই দুই বিচ্ছিন্ন বিশ্লিষ্ট কর্তিত সত্তায় ভাঙতে গিয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। স্নায়ুরোগে মনোরোগে আক্রান্ত হয় নারী। অন্যের মুখ থেকে খাবার কেড়ে খাওয়ার বাজারের নীতি আর নিজের মুখের খাবার অন্যকে জুগিয়ে দেওয়ার মা-নারীর নীতি এই দুইয়ের ভিতর কোনো সমন্বয় করতে না পেরে সে অ্যাজ এ হোল খাবার ব্যাপারটাকেই পরিত্যাগ করে, অ্যানোরেক্সিয়া নারভোসা, শরীরে কোনো খাবার এলেই বমি করে দিতে বাধ্য হয়, অ্যানোরেক্সিয়া বুলিমিয়া। সমাজ বাস্তবতার প্রতিটি স্তরেই প্রাকৃত মানুষের শরীরে মনে প্রতিমুহূর্তে অভিনীত হয়ে চলেছে এই শাসক ভাবনাকে নিজের ভাবনা বলে চালিয়ে দিতে বাধ্য হওয়ার নাটক।) তাই, এই সিম্পল কালচারাল স্পেসে, শাসিত প্রাকৃতের ভাবনা নিতান্তই

শাসকের স্বার্থপর ভাবনারই একটা সংযোজন। ঠিক শাসক যেভাবে চায় সেভাবেই চেয়ে উঠছে শাসিত প্রাকৃত। আর, তাই যদি হয়, সে পারসুয়েশন তো কোয়েরশনেরই নামান্তর, সেই প্রভাব তো প্রতাপেরই অন্য মুখ। প্রভাবের প্রশ্ন তো তখনই ওঠে, যখন কিছুটা জায়গা দেওয়া হয় শাসিতকেও। হাজি মহসিন যদি কৃমি আক্রান্ত বাচ্চাটিকে 'আমি বলছি তাই গুড় খাবি না' বলে নিরস্ত করতেন সেটা হত প্রতাপ, তার বদলে নিজের বাড়িকেই গুড়হীন করে দিয়ে, সব ঠিলে অন্যত্র চালান করে দিয়ে রোগ এবং গুড়ের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ক মতাদর্শে ছেলেটিকে তার প্রভাবিত করতে হল, যেখানে ছেলেটির মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হল, চিকিৎসকের বাড়িতে অত গুড় দেখলে ছেলেটি কী ভাববে — মানে ছেলেটির ভাবনা — ছেলেটির মতামত মিশে গেল এই মতাদর্শগত অবস্থানে। কিন্তু, প্রাকৃত যদি হুবহু প্রভুর মত করেই ভাবতে শুরু করে, তার মতাদর্শগত অবস্থান যদি প্রভুর অবস্থানের এক্সটেনশন, সংযোজন মাত্র হয়, তাহলে সেখানে প্রভাবই তো প্রতাপের কাজ করে দিচ্ছে, প্রতাপের মেটাফর হয়ে যাচ্ছে, প্রভুকে আর কিছু পারসুয়েড করতেই হচ্ছে না। সেখানে পারসুয়েশন হয়ে দাঁড়াচ্ছে জাস্ট আর একটা কোয়েরশন।

আর, তখন, এই সিম্পল স্পেসে, কোলাবোরেশন হয়ে দাঁড়াচ্ছে প্রাকৃতের বিভ্রান্ত চেতনার, ফলস কনশাসনেসের ফলাফল। তার এই বিভ্রান্ত চেতনা তৈরি হয়েছে প্রভুর মতাদর্শগত অবস্থানকে নিজের মতাদর্শগত অবস্থান বলে ধরে নেওয়ায়। প্রভুর ভাবনাকে নিজের ভাবনা বলে মনে করে নেওয়ায়। সে এবার নিজের মতামতে নিজের ভাবনা থেকে যে কাজ করে চলেছে সেটাই হয়ে দাঁড়াচ্ছে প্রভুর প্রতি কোলাবোরেশন। কারণ তার নিজের চিন্তা তো প্রাকৃত বাস্তবতায় প্রতিবিম্বিত প্রভুর চিন্তা মাত্র। বস্তির ঘরের ভাঙাচোরা ফাটা আয়নায় প্রভুরই মুখের ছবি মাত্র। ক্যাপিটালিজমের নিজের স্লোগান 'অ্যাকিউমুলেশন, ডেমোক্র্যাসি, ফ্রিডম' দিয়ে, নতুন পুঁজি নির্মাণ ও সঞ্চয়ের, গনতন্ত্রের, এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে পুঁজি যখন একটি রাষ্ট্রের নাগরিকদের শাসন করে সেটাকেই আমরা বলি সিম্পল হেজেমনি। আমরা পরে দেখব, কী ভাবে বাস্তবতার চরিত্রের বদলের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজি তার স্লোগানগুলোকেও আপাদমস্তক বদলে ফেলছে কারণ লোকে আর ওই পুরোনো স্লোগানগুলো খাচ্ছে না। মানে, তার হেজেমনি বদলাচ্ছে।

সিন্থেটিক সাংস্কৃতিক ভূমি এবং তার হেজেমনি তৈরি হয় ঠিক এইখান থেকেই। কুলীন প্রভুর পারসুয়েশন যদি ব্রাত্য প্রাকৃতের কাছ থেকে সঠিক কোলাবোরেশন আদায় করে উঠতে না পারে, তার মানে, প্রাকৃতের চৈতন্যের আয়নায় এলিটের ছবি ঠিক ভাবে গজিয়ে উঠছে না। অর্থাৎ, সাবঅল্টার্ন প্রাকৃত এলিটের ভাষা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। কুলীন প্রভুকে এবার শিখে নিতে হবে ব্রাত্য ভৃত্যের ভাষা, তার সঙ্কেত ইঙ্গিত মুদ্রার অর্থ। তারপর তাকে ভেঙে চুরে নিজের মত করে মুচড়ে নিয়ে তার থেকে বানাতে হবে একটা আনকোরা নতুন সঙ্কেত-কাঠামো, কোড-সিস্টেম, একটা নতুন ভাষা, যা দিয়ে এবার সে তার নিজের বক্তব্যকে নিজের পারসুয়েশনকে পৌঁছে দিতে পারে সেই ভৃত্যের জগতে। প্রাকৃত ভৃত্য এবার যে ভাষাকে তার নিজের ভাষা বলে চিনতে শুরু করবে, আসলে এই ভাষা তার প্রভুর ভাষা, হিজ মাস্টার্স ভয়েস, এইচএমভি, গ্র্যামাফোনের চোঙে এবার সে প্রভুর গলার আওয়াজ শুনলেই সে চিনে নিতে পারবে, গলা দিয়ে বেরোবে সোহাগের ঘড়ঘড়, গ্রীবা নুইয়ে সসঙ্কোচ ব্রীড়ায় ন্যাজ দোলাবে মৃদুমন্দ। (সাধে এইচএমভি আর তার ডিস্কিত সঙ্গীত আমাদের জাতীয় লোগো প্রায়, সংস্কৃতিচর্চার।) সরল শৈশবিক সেই প্রাকৃত জানতেও পারল না, তার ভাষা তার ভিটেমাটি চুরি হয়ে গেল তার সম্পূর্ণ অগোচরে। সে রিফিউজি হয়ে গেল তার নিজের ঘরেই। এখন থেকে সে কীর্তন ভেবে গাইবে চার্চের হিম-সঙ্গীত। জনান্তে তার নিজের প্রেয়সীর সঙ্গে সে এখন থেকে বলবে ইংরেজের কোর্টশিপের ভাষা, যাদের ছাই একটা শব্দই নেই গোটা ভাষায় যা 'অনুরাগ' শব্দটার প্রতিশব্দ হতে পারে।

## ৯।। উপনিবেশের সিন্থেটিক হেজেমনি

ঔপনিবেশিক শাসনের হেজেমনি নিয়ে চালু আলোচনাগুলোয় এই সূক্ষ্ম জায়গাগুলো সম্পূর্ণ নজর এড়িয়ে গেছে। এরা হেজেমনিকে বুঝেছে ঔপনিবেশিক প্রভুর শুধু পারসুয়েশনের নীতিগুলো দিয়ে। আর তাই, ঋজুরেখ পারসুয়েশন এখানে আদৌ কাজ না করায়, এইসব ঋজুরেখ মনের ভালোমানুষেরা উপনিবেশ

গুলোয় কোনো হেজেমনিই আবিষ্কার করে উঠতে পারেননি শত চেষ্টাতেও। আসুন, রণজিত গুহকে একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক। গুহ তাঁর আলোচনায় অন্যদের আলোচনার এক ধরণের একটা সারসংক্ষেপ করেছেন, এবং নিজের আর এদের সবার মতামত মিলিয়ে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে উপনিবেশে কোনো হেজেমনি নেই।

ঔপনিবেশিক হেজেমনি নিয়ে আলোচনাগুলোয় যে মূল দুটো বর্গ ব্যবহার হয় তারা হল মডার্নিজম আর ট্রাডিশন, আধুনিকতা আর ঐতিহ্য। এই দুটোকে দেখা হয় পরস্পর বিপরীত এবং বিরোধী দুটো বর্গ হিশেবে। ঔপনিবেশিক ক্ষমতাকেও দেখা হয় ভালো আর মন্দ এই দুই চোখে — ভালো, কারণ সে আধুনিকতা আর বিজ্ঞানকে আনছে, অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করছে। আর মন্দ, কারণ, এই ঔপনিবেশিক ক্ষমতাই উপনিবেশের মানুষকে পরাধীন রাখছে, ঔপনিবেশিক করে রাখছে। একটা উপনিবেশের খারাপত্বের মাত্রা কী? — সেই উপনিবেশের মানুষ কতটা পরাধীন, কতটা সাহেব প্রভুর কাছে পদানত। আর ভালোত্বের মাত্রা কী? — কলোনাইজার প্রভু ওই ঔপনিবেশিক দেশের কতটা আধুনিকীকরণ করছে, উপনিবেশের মানুষকে কতটা যুক্তির রিজনের আলোয় আলোকপ্রাপ্ত করছে পুরোনো কুসংস্কার ভেঙে, কতটা নিয়ে আসছে নতুন নতুন প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান।

এই ভাবে দেখা মানেই, খেয়াল করুন, আসলে সিম্পল হেজেমনি দিয়ে দেখা। কোনো একটি বিশেষ ঔপনিবেশিক দেশের ঔপনিবেশিক ক্ষমতাকে হেজেমনিক বলা হবে কিনা বা কতটা হেজেমনিক বলা হবে তা নির্ভর করছে সে তার নিজের স্লোগান দিয়েই (মানে মডার্নিজমের বিজ্ঞানের যুক্তির), নিজের আদত সিম্পল পারসুয়েশন দিয়েই সেই দেশের পরাধীন প্রাকৃতকে কতটা নিজের শাসনে কোলাবোরেট করাতে পারছে তারই নিরিখে।

ধরুন আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের নিরিখে ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে যথেষ্ট সফল (হেজেমনিক) বলে ঘোষণা করা হয়। ইংরেজের এই প্রোজেক্টে যারা প্রয়োজনীয় কোলাবোরেশন দিয়েছিলেন তারা ঘোষিত প্রচারিত এবং স্বীকৃত হয়েছেন মহান দেশনেতা হিশেবে, যেমন বিদ্যাসাগর, যেমন আশুতোষ মুখার্জি। রেলপথ স্থাপনা এবং প্রসার তথা মোট অর্থনৈতিক সংস্কার ব্যাপারটাই দেখা হয় এই হেজেমনিক শাসনের আর একটা প্রমাণ ও সাফল্য হিশেবে — ভারতের আধুনিকীকরণের সম্ভাবনাগুলো আরো বিকশিত হয়েছে এই অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে। এরা হল ভারতের ইংরেজ শাসনের হেজেমনিক হয়ে ওঠার সূচক। যারা এই শুভ সুন্দর আলোকপ্রাপ্তির দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখেন তারা এখানটায় ইংরেজ শাসনের হেজেমনির সফলতাকে চিহ্নিত করেন। আর, আরো মজার ব্যাপারটা এই যে, এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধিতা করেন, তারাও এই সিম্পল হেজেমনি দিয়েই পুরোটাকে বোঝেন। তারা বলেন মোট বাস্তবতার মধ্যযুগীয় অন্ধকারের সাপেক্ষে এটুকু আলো তো দেশমাতৃকার চিবুকটুকুও আলোকিত করতে পারল না। এই অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত সংস্কার সেই অন্ধকারের সমুদ্রে এনলাইটেনমেন্টের শিশিরের মত, পড়ে কোনো শব্দও হয় না, তাই কোথায় সাফল্য? কী তার পরিমাণ? মানে, তারাও সাফল্য বলে মনে করেন এই আলোকপ্রাপ্তি এবং আর্থসামাজিক সংস্কারকেই বুঝছেন। শুধু তার পরিমাণটাকে নগণ্য মনে করছেন, এবং তাই ইংরেজ শাসনের হেজেমনিক হয়ে ওঠার চেষ্টাকে অসফল মনে করছেন।

গুহ তার আলোচনায় (ডমিনান্স উইদাউট হেজেমনি অ্যান্ড ইটস হিস্টরিওগ্রাফি) ভারতের ঔপনিবেশিক ইতিহাসচর্চার প্রসঙ্গে কেমব্রিজ ইতিহাস ঘরানাকে এনেছেন। সেইখানে গুহ কেমব্রিজ ইতিহাস চর্চার একটা গুরুত্বপূর্ণ খুঁজে-পাওয়াকে চিহ্নিত করেছেন। কেমব্রিজ ইতিহাস চর্চা ভারতে ব্রিটিশ হেজেমনির শিকড়কে চারিয়ে থাকতে দেখেছে ঔপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশ সরকারের প্রশাসন এবং আইনবিভাগের, অ্যাডমিনিসট্রেশন এবং লেজিসলেশনের, বিভিন্ন স্তরে নেটিভ নাগরিকদের অংশগ্রহণ এবং প্রতিনিধিত্বের প্রক্রিয়ার ভিতর। উপনিবেশের মানুষের এই অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি নিজেকে ঘিরে একটা বৃহত্তর পদ্ধতির জন্ম দেয়, একটা সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক পদ্ধতি — সরকারে অংশগ্রহণের দাবি জানানো, ইংরাজ সরকারের সেই দাবি কম বেশি মেনে নেওয়া, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাই নিয়ে লেখালেখি, বৃহত্তর আমজনতার কাছে সেইসব মতামত পৌঁছনো এবং স্বীকৃত হওয়া, কিছুটা প্রতিনিধিত্ব ইংরেজ মেনে নেওয়ার

পর নতুনতর বৃহত্তর দাবির উৎসাহ — এই পুরোটা। সেই পদ্ধতির মধ্যে জন্ম নিতে থাকে নতুন নতুন মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধেরা জমি প্রস্তুত করতে থাকে ভারতের আধুনিকীকরণের। লোকের মনন জগতে, প্রায় চোখের আড়ালে, আধুনিক ভারতের জন্ম দিতে থাকে।

কেমব্রিজ ইতিহাসবিদ্যা ঠিক এই জায়গা থেকেই দেখেছে উপনিবেশ ভারতের জাতীয়তাবাদী ইতিহাসকে। তাদের দৃষ্টিতে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তার রসদ সংগ্রহ করেছে এই সরকারে প্রতিনিধিত্বের প্রক্রিয়া থেকেই। তাদের কাছে জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক আবেগ উচ্ছ্বাস আর কিছুই না, এই অংশগ্রহণের বাসনারই একটা পরিমাণগত ভাবে বৃহত্তর অবয়ব। উপনিবেশের প্রজারা আরো আরো বেশি করে সরকারের প্রশাসনে এবং আইনবিভাগে, অ্যাডমিনিসট্রেশনে এবং লেজিসলেশনে, অংশ পেতে চেয়েছে — এবং তারই প্রতিফলন ঘটেছে দেশ জুড়ে বাড়তে থাকা স্বদেশী আন্দোলনে। ভারতের দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদীরা এইসব খারাপ কথা নিশ্চয়ই শুনতে চাইবেন না। তারা যুক্তি দেবেন যে বিদেশী ইংরেজের সরকারে সন-অফ-দি-সয়েল নেটিভের অংশগ্রহণটা ঘটেছে এত এত কম পরিমাণে যে তার থেকে অত বড় মাপের দেশব্যাপী একটা আন্দোলন কিছুতেই পয়দা হতে পারে না। যাই হোক, আবার আমরা ফেরত যাই গুহ তথা অন্যান্য উত্তরঔপনিবেশিক ইতিহাসবিদদের আলোচনায়।

যা বলছিলাম, ভারতে ব্রিটিশ হেজেমনির ধারণার পক্ষে এবং বিপক্ষে দুই দলই, আশ্চর্যজনক ভাবে, এক সিম্পল হেজেমনি দিয়ে ভেবেছে কলোনিয়াল ইতিহাসকে — যদি ব্রিটিশ প্রভু প্রজাদের পারসুয়েড করে থাকতে পারে তার মডার্নাইজেশনের আধুনিকীকরণের প্রোজেক্টে তাহলে হেজেমনি সফল, আর যদি সে ঐতিহ্যের, ট্রাডিশনের সঙ্গে কোনো সমঝোতায় মধ্যপন্থায় এসে থাকে তার মানে সেটা তার বিফলতা। (এই প্রবন্ধের গোড়ার দিকে আমাদের সেই থিসিস আর অ্যান্টিথিসিসের বাইনারি বিরোধের আলোচনা মনে করুন।) ভারতে ব্রিটিশ হেজেমনির ধারণাটাকে নাকচ করে দেওয়ার পিছনে গুহর মূল যুক্তি এটাই। গুহ দেখিয়েছেন কী প্রচুর বার কত বিচিত্র রকমে কেমন ব্যাপক একটা এলাকা জুড়ে বারবার ব্রিটিশ প্রভু সমঝোতা করেছে ট্রাডিশনাল অবস্থানের সঙ্গে, ঐতিহ্যের সঙ্গে, রক্ষণশীল মূল্যবোধের সঙ্গে — নানা সময়ে এবং ইশ্যুতে তাকে তার উপনিবেশের প্রজাদের কাছ থেকে সম্মতি আদায় করতে হবে বলে। এখানে, গুহর কথা অনুযায়ী, ব্রিটিশধীন ভারতের আপামর নেটিভ প্রজা ব্রিটিশ শাসনের পারসুয়েশনকে বুঝেছে পশ্চিমের যুক্তি ও তত্ত্ব ও আলোচনা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা নিরিখে। তারা এই পুরোটাকে বুঝেছে *ধর্ম* আর *অধর্ম* দিয়ে। রাজাকে তার প্রজার ন্যূনতম অধিকারটুকু নিশ্চিত করতেই হবে, তা থেকে তারা যেন বঞ্চিত না হয়। এই ন্যূনতম অধিকার মানে টিকে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় ভাত-কাপড়-ছাদের অধিকার, নিজের নিজের ধর্ম পালনের অধিকার, ইত্যাদি। একজন ধার্মিক রাজা, মানে যে ধর্মচ্যুত নয়, অধার্মিক নয়, তাকে তাই তার প্রজার জন্যে কিছু অর্থনৈতিক উন্নতির কথা ভাবতেই হবে, যেমন ধরুন বন্যারোধ বা জলসেচের বন্দোবস্ত। এর অন্যথায় প্রজার অধিকার থাকবে প্রতিরোধ করার, ধার্মিক প্রতিবাদ করার, যদি তার এই ন্যূনতম অধিকারটুকু সে না পায়। মানে, একজন রাজার রাজধর্ম দাবি করে যে তার প্রজারা যখন দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত সে তখন বিলাসব্যাসনে মত্ত থাকতে পারে না। শুধু তাই নয়, এটাও তার ধর্ম যে তার রাজকোষে জমা সম্পদ, তার শষ্যাগারে মজুত উদ্বৃত্ত শষ্য সে বিতরণ করবে তার দুর্ভিক্ষতাড়িত প্রজাদের মধ্যে। আর, তা যদি সে না করে, তার প্রজাদের কাছে সেটা কখনোই প্রজাধর্মের বাইরে হবে না যদি তারা বিদ্রোহ করে এবং রাজভাণ্ডার থেকে ওই শষ্য ছিনিয়ে নেয়। গুহর মতে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রজাকে প্রভাবিত করার পারসুয়েসিভ নীতিগুলো এই চিরাচরিত আবহমান ধারণা এবং মডার্নিজমের একটা মিশ্রণ। একদিকে *ধর্ম* ধারণা এবং অন্যদিকে আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান মতাদর্শ এবং প্রকৌশল। এটাকে গুহ বুঝছেন ভারতের ঔপনিবেশিক ক্ষমতার একটা খামতি একটা ল্যাক হিশেবে। যে ট্রাডিশনকে সে পুরো হজম করে দিতে, লুড়কে দিতে পারল না। তার সঙ্গে তাকে সমঝোতায় আসতে হল। মডার্নিজমের হেজেমনি, হায়, হয়ে উঠল না। ট্রাডিশন এবং মডার্নিজমের সমঝোতা — গুহর এই অবেক্ষণের সঙ্গে আমাদের কোনো দ্বিমত নেই, আমরা শুধু একটা ভিন্ন তাত্ত্বিক অবস্থান থেকে এই বাস্তব পরিস্থিতিটাকে বুঝতে চাইছি।

গুহ যেখানে ল্যাক খামতি অসম্পূর্ণতা দেখছেন, আমরা সেখানে একটা আদ্যোপান্ত নতুন কেতার হেজেমনির বিসমিল্লা দেখছি। একটা নতুন হেজেমনির শুরু। তার নাম সিন্থেটিক হেজেমনি। একটা সিন্থেটিক সাংস্কৃতিক ভূমিতে যার হিশেবনিকেশ আমরা একটু আগেই দিয়েছি। আসুন এবার ওই সিন্থেটিক সাংস্কৃতিক ভূমির ধারণাটাকে আর একটু বাড়িয়ে তুলে তাই দিয়ে আমরা আমাদের ঔপনিবেশিক ইতিহাসকে পড়ার চেষ্টা করি। কেমব্রিজ আর গুহ এই দুই অবস্থানই ইতিহাসটাকে পড়েছে একটা সিম্পল কালচারাল স্পেস দিয়ে। এবং তারপর ব্রিটিশধীন ভারতে সেই সরল সাংস্কৃতিক ভূমির নিরিখে হেজেমনির উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি নিয়ে ভেবেছে। এবার সময় হয়েছে সেই অপাপবিদ্ধ সরলমতি সাংস্কৃতিক ভূমির ধারণাকে গুডবাই জানানোর। নইলে ব্রিটিশ ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের হেজেমনি এবং তারপর উত্তরঔপনিবেশিক বাস্তবতায় তার ধারাবাহিকতাটাকে আমরা ধরতেই পারব না। আর এই বিদায় ঘোষণা করতে করতেই আমরা আর একটু ঘননিবদ্ধ রকমে আমাদের ঔপনিবেশিক বাস্তবতাটাকে ধরতে পারব, আর একটু গভীর ভাবে। ডালের মজা যেমন তলে তেমন কী সেই অষ্টাশি মজা যা উপ্ত রয়েছে কলোনিয়াল ক্ষমতার ল্যাবরেটরিতে? যেখানে একপিস সাতকেলে ট্রাডিশনাল মূল্যবোধকে তোলা হত পেট্রিডিশে এবং সেই শুন্ডির তখন ঠিক কী ভাবে পিন্ডি চটকানো হত যাতে তাকে বেমালুম লেপ্টে দেওয়া যায় মডার্নিজমের ঝিনচাক শরীরে? এবার টেস্টটিউব থেকে যে মাল বেরোলো তাতে ট্রাডিশনও আর ট্রাডিশন নেই, মডার্নিজমও আর মডার্নিজম নেই, দোস্ত দোস্ত না রহা, পেয়ার পেয়ার না রহা। তাই এখানে একটা মাইল্ড তফাত এসে যাচ্ছে গুহর সঙ্গে আমাদের দেখাতেও। তিনি যেখানে সমঝোতা দেখছেন, আমরা দেখছি ব্রিটিশ প্রভুর সচেতন বিকৃতিত্ব, বিকৃতি ঘটানোর কৃতিত্ব, নিজের প্রাথমিক পারসুয়েশনকে বদলে ফেলার ক্যালি। সমঝোতা মানে একটা মিশ্রণ। এখানে বদলটা হচ্ছে রাসায়নিক। ব্রিটিশ শাসন আমাদের ট্রাডিশনকে উল্টে দিচ্ছে, পাল্টে দিচ্ছে, এর কবন্ধের সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছে ওর মুণ্ড। দাড়িওলা মর্দ মুণ্ড তার স্তন্যদানরত শরীর ঢাকছে আঁচল টেনে, আর পেশীল শরীরের কুঙ্কুমপরা গৌরী মুণ্ড বিড়িতে দিচ্ছে সুখটান — জিও গুরু রাজশেখর বসু — তুমি সেই ঔপনিবেশিক টাইমেই বুঝেছিলে এই মজা, যা এরা এখনো বুঝল না। ব্রিটিশ শাসন ট্রাডিশনকেই বদলে দিচ্ছে, তাকে ওভারডিটারমিন করছে, ট্রাডিশন বলতে যা আমরা কিনে আনলাম স্বভূমির হেরিটেজ প্লাজা থেকে তার মধ্যেই রয়েছে আমেরিকা, বঙ্কিম যেভাবে গীতা পড়লেন তার মধ্যেই রয়ে গেল ব্রিটেন। আসছি সে কথায়।

কিন্তু গুহ তো মডার্নিজম আর ট্রাডিশনকে আলাদা আলাদা করে চেনেন। বিচ্ছিন্ন বিশ্লিষ্ট কর্তিত, টুলো মার্ক্সবাদের থিসিস আর অ্যান্টিথিসিসের মত। তাই গুহর কাছে একটা ঔপনিবেশিক বাস্তবতায় আধুনিকতার নীতিগুলো যত বেশি উপস্থিত (মানে ঐতিহ্যের নীতিগুলো যত বেশি অনুপস্থিত এবং অপনোদিত) তত বেশি সেই ঔপনিবেশিক শাসকের হেজেমনির সাফল্য। এবং আধুনিকতার শরীরে ঐতিহ্যের কিছু কিছু নীতির ওই অন্তর্ভুক্তি, আধুনিকতার দ্বারা কিছুটা পরিমাণে ঐতিহ্যের ওই আত্তীকরণ — এটাকে গুহ ডাকলেন 'ভুঁইফোড়' বা 'স্পুরিয়াস' হেজেমনি বলে। মানে যথার্থ অর্থে এ কোনো হেজেমনিই নয়, বরং যথার্থ হেজেমনির এ এক ব্যর্থতা।

আমরা তো আগেই বলেছি, যে এই বনাবটি হেজেমনি কখনোই ভুঁইফোড় না, বা এটা তার ব্যর্থতার চিহ্নও নয়। বরং জাস্ট তার উল্টোটা। আর একটু সূক্ষ্ম আর একটু দক্ষ একটা হেজেমনি। যাকে আমাদের ব্যাখ্যা করতেই হবে যদি ঔপনিবেশিক তথা উত্তরঔপনিবেশিক ক্ষমতার প্রসার এবং গভীরতা আমরা বুঝতে চাই। বা, বুঝতে চাই ঔপনিবেশিক মন, কোলোনাইজড মাইন্ড-এর খামতির জায়গাগুলো।

আমরা বাস্তব পরিস্থিতির এই অবয়বের বিষয়ে একমত, যে হ্যাঁ, কলোনিতে সিম্পল হেজেমনি কাজ করেনি, কিন্তু সমস্যা সেই পরিস্থিতির তাত্ত্বীকরণের ক্ষেত্রে। এই সিম্পল হেজেমনির অনুপস্থিতিকে গুহ মিলিয়ে ফেলেছেন হেজেমনির অনুপস্থিতির সঙ্গে। আমরা সেই একই অনুপস্থিতিকে বুঝছি এবং পাঠ করছি আর একটা কূটতর হেজেমনি বলে। আমরা তাকে ডাকছি সিন্থেটিক হেজেমনি। এবার গূঢ় তাত্ত্বিক প্রশ্নটা এখানেই যে কী করে এত অনাবিল অনায়াস রকমে আধুনিকতা তার নিজের শরীরে ঠাঁই দিল তার চিরশত্রু ঐতিহ্যকে? মডার্নিজম আর ট্রাডিশন এমন মর্মে মর্মে মিশল কী করে? তাহলে কি ব্যাপারটা এমন হতে পারে

যে, আসলে মডার্নিজম আর ট্রাডিশন ততটা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়? ততটা তারা এ অন্যের রাইভাল নয় যতটা আপাতদৃষ্টিতে দেখে তাদের মনে হয়, বা, যতটা বাজারে তাদের শত্রুতা নিয়ে প্রচার আছে? অতটা পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন বিশ্লিষ্ট কর্তিত যদি তারা হত তাহলে অমন মোলায়েম মিলন তাদের হয় কী করে?

আসলে, যতদিন ঐতিহ্য মার্কেটে একা খেলত, তার নিজের মত নিজের একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বনির্ভর অর্থ ছিল, একা একলা স্পষ্ট এবং ওয়েল-ডিফাইন্ড। বাংলাবাজারে আধুনিকতা ল্যান্ড করে যাওয়া মাত্র, বাস্তবতায় তার উপস্থিতিটাই ঐতিহ্য ব্যাপারটার বিষয়টার বর্গটার ধারণাটার পুরোনো অর্থকেই হাপিস করে দিল। বদলে দিল সেটাকে। একটা অতিনিয়ন্ত্রণ চলে এল। যেমন পুরোনো অভ্যস্ত 'মেল' শব্দটাকে ভাবুন, চিঠি বা ডাক এই অর্থে। এতদিন আমরা সেটাকে মেল বলেই জানতাম। যেই ইমেল বাজারে চলে এল, সেই মেল-এর অর্থ গেল বদলে, পুরোনো মেল এখন হল 'স্নেলমেল', শামুকচিঠি। বা, ধরুন বাঙালি। বাঙালি যতক্ষণ শুধু বাঙালি বাস্তবতাকেই চেনে ততক্ষণ কিন্তু 'বাঙালি' শব্দটার সেই অর্থই নেই, যে অর্থটা তৈরি হয়ে গেল যখন বাঙালি জানতে শুরু করল নেপালি বা বিলিতি বা গুজরাতি বাস্তবতাকে, সেই বাস্তবতার মানুষকে। ট্রাডিশনের ক্ষেত্রে অর্থের বদলটা আরো গভীর এবং ব্যাপক। কারণ, ট্রাডিশন শুধু একটা বর্গ বা ধারণা বা শব্দ নয়। একটা গোটা সমাজপদ্ধতি। একটা বাস্তবতা। যার ভিতর এখন আধুনিকতার নীতিগুলো ঢুকে আসতে থাকে। ট্রাডিশন এখন ট্রাডিশন হয়ে ওঠে বা ট্রাডিশন হয়ে বেঁচে বর্তে থাকে এই নীতিগুলোকে নিজের ভিতরে নিয়েই। অর্থাৎ, মডার্নিজম ট্রাডিশনকে স্থানান্তরিত করে দেয়, তাকে ডিসপ্লেস করে দেয়, তার নামটা একই থাকে, কিন্তু অর্থটা যায় বদলে। আধুনিকতার আলোয় আমরা আধুনিক বাস্তবতারই একটা অংশকে তখন দেখি — যার নাম ট্রাডিশন — মানে, আমরা আধুনিকতাকেই দেখি, আর এক রকমের আধুনিকতাকে, ট্রাডিশন নামের আধুনিকতাকে।

ট্রাডিশন আর মডার্নিজম, ঐতিহ্য আর আধুনিকতা পরস্পর অতিনির্ণীত হতে থাকে। (কিন্তু সেই অতিনির্ণয়ের মধ্যে রয়ে যায় একটা অতিনির্ণয়ের মিমিক্রিও। মডার্নিজম যেভাবে ট্রাডিশনকে অতিনির্ণয় করে, ট্রাডিশন সেভাবে মডার্নিজমকে করে না। এই অতিনির্ণীত বাস্তবতাতেও একটা ক্ষমতার ক্রমভেদ বা হায়েরার্কি রয়ে যায়। মডার্নিজম উপরে, ট্রাডিশন নিচে। আমরা একটু আগে সেসব আলোচনা করেছি। আরো আসছে।) আধুনিকতা আর ঐতিহ্যের মধ্যে এই অতিনির্ণয় আছে মানেই তারা আর পরস্পর জলঅচল মুখদেখাদেখি-হীন দুটো বর্গ নয়, তাদের পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের ওভারল্যাপের, ছড়িয়ে থাকার, মিশে থাকার জায়গা আছে। মডার্নিজম এখন ট্রাডিশনকে নির্মাণ ও নির্ণয় করে, এবং ট্রাডিশনও মডার্নিজমকে নির্ণয় ও নির্মাণ করে। আমরা কলোনিয়াল হেজেমনির ইতিহাসকে দেখতে চাই এই ট্রাডিশন ও মডার্নিজমের অতিনির্ণয় দিয়ে।

এই অতিনির্ণয়ের ধারণাকে ব্যাবহার করে আলথুসের আমাদের গোটা সমাজবাস্তবতাকে বুঝেছিলেন একটা জটের জট বা কমপ্লেক্স অফ কমপ্লেক্সেজ বলে। এই তিনটে জট হল ইকনমিক, কালচারাল, পলিটিকাল। অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক। যারা প্রত্যেকেই অন্য প্রত্যেকের দ্বারা অতিনির্ণীত। (শুধু এই ত্রিদেব ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর-এর শাসন কেন, দেবদেবী তো আমরা জানি তেত্রিশ কোটি অব্দি হতে পারে, সেই প্রশ্ন নিয়ে অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে প্রচুর।) তাই, আমাদের এই অতিনির্ণীত মডেলে মডার্নিজম যদি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক আর সাংস্কৃতিক-এর জটই হয়, তার মানে তার মধ্যেই মিশে আছে ট্রাডিশন-ও। কারণ, ট্রাডিশন নিজেই তো একটা সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সত্তা। তাকে মিলিয়েই তো বাস্তবতা। সে তো মিশে আছে প্রতিটি জটে এবং জটের জটে। কমপ্লেক্স অফ কমপ্লেক্সেজ-এ। তাই মডার্নিজম যখন ট্রাডিশনের সামনে আসে মডার্নিজমও যায় বদলে। আমাদের কাছে এই আলোচনায় তার চেয়েও বেশি গুরুত্বের অবশ্য এর ঠিক উল্টোটা — ট্রাডিশন যখন মডার্নিজমের মুখোমুখি হয় ট্রাডিশন বদলে যেতে থাকে, সে আর ট্রাডিশনাল ট্রাডিশন থাকে না। হয় মডার্ন ট্রাডিশন। আধুনিক ঐতিহ্য। এতে বহুসময় চেনাটাই দুষ্কর হয়ে ওঠে — ট্রাডিশন আর মডার্নিজম কে কখন কার মুখোশে হাজির হচ্ছে।

রামের রাজ্য রামরাজ্য গড়বে বলে রামমন্দির আর তাকে বানাতে বাবরি মসজিদ ভাঙার যে রাজনীতি (এবং এই লোকগুলোই আবার বামিয়ানের বুদ্ধ মূর্তি ভাঙায় শোকে আকুল হয়েছিল, তাও তো বামিয়ানের

ওই মূর্তিতে এখন আর কোনো উপাসনা হত না) — অ্যাজ এ হোল এই বিজেপি ভিএইচপি আরএসএস — এরা নিজেদের প্রোজেক্ট করে ট্রাডিশনের পক্ষে বলে। বিজেপির এই রাজনীতি হল আধুনিকের জায়গায় ট্রাডিশনকে আনার, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে স্বদেশী ঐতিহ্যের রাজনীতি। এভাবে এরা নিজেদের প্রচারও করে। অথচ রামের নামে গোটা ভারতকে একত্র করার পুরো প্রচেষ্টাটাই হল একটা পাশ্চাত্য সমগ্র-ধারণা বা টোটালিটিকে নিয়ে আসা, একটু বিকৃত একটা রকমে। অজস্র আঞ্চলিক প্রবণতাকে মিলিয়ে ভারতের সামগ্রিক রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্র ঘটে ওঠে নি, তাকে একটা সারোগেট রকমে ঘটিয়ে তোলার চেষ্টা। এই ইউনিভার্সালের বা বিকল্পে তার জায়গায় তার সারোগেটের ধারণা কোনো রকম ভাবেই ভারতীয় ঐতিহ্যে বা ট্রাডিশনে ছিল না। যে হিন্দুত্ব দিয়ে আদবানি উমা ভারতী মনোহর যোশীরা রাজনীতি করতে চাইছেন তার সঙ্গে ভারতীয় পুরাণশাস্ত্রাদির হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের কোনোরকমের কোনো সম্পর্কই নেই। আদবানি যোশীর এই রাজনীতিটা খুবই আধুনিক। একটুও ট্রাডিশনাল নয়। খুব বেশি পুরোনো হলে বলা যায় আর একটা রকমের মুসলিম মৌলবাদ, শুধু তার নামগুলো সব হিন্দু। তাই যদি হয়, তাহলেও সেটা যুদ্ধপীড়িত আরব উপজাতিগুলোর সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিককার ঐতিহ্য, ভারতবর্ষের গত দুতিনহাজার বছরের ঐতিহ্য নয়। মুসলিম মৌলবাদেরই একটা হিন্দু ভার্শন। সেদিক থেকেও অনেক আধুনিক। পাকিস্থান রাষ্ট্র তো সাতচল্লিশের আগে ছিলই না। অর্থাৎ, আধুনিক মৌলবাদী একটা নেশন ধারণাকে বিজেপি বেচতে চাইছে ঐতিহ্যের নামে।

ট্রাডিশন বলে ঔপনিবেশিক উত্তরঔপনিবেশিক মানুষ যাকে হাজির করে তা আসলে হয় সবসময়েই মডার্নিস্ট আলোকে আলোকিত, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক মনের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তাকে হাজির করা হয়, সেই মত ছাঁটকাট করে, অর্থাৎ, মডার্নিস্ট করে। সেই ঐতিহ্যের মধ্যে ইতিমধ্যেই সদাসর্বদাই, অলওয়েজ অলরেডি, মিশে থাকে মডার্নিজম। কারণ, যেমন বলেছি আগেই, মডার্নিজম আর ট্রাডিশন পরস্পর অতিনির্ণীত। মডার্নিজম ট্রাডিশনকে আত্তীকরণ করে এবং গজিয়ে তোলে একটা বনাবটি ট্রাডিশন। যা আসলে একটা সিন্থেটিক ভূমি। সেখানে ঐতিহ্য গুলোও বানানো ঐতিহ্য, সেই ঐতিহ্য প্রসূত ঔপনিবেশিক উত্তরঔপনিবেশিক শিকড় ও পরিচিতিও মডার্নিজমের বানিয়ে তোলা শিকড় ও পরিচিতি। ফলস আইডেন্টিটি ফলস রুটস।

এবার আমরা এই সিন্থেটিক সাংস্কৃতিক ভূমির সঙ্গে ভাভার থার্ড স্পেসের আত্মীয়তা ও পার্থক্যের জায়গাগুলো আর একটু খুটিয়ে লক্ষ্য করব, যাতে আমরা এই ঔপনিবেশিক ইতিহাসের সঙ্গে উত্তরঔপনিবেশিক ইতিহাসকে মিলিয়ে মিলিয়ে পড়তে পারি।

## ১০।। ভাভা, উত্তরউপনিবেশ, থার্ড স্পেস

ভাভা তার 'দি লোকেশন অফ কালচার'-এ দুটো আলাদা আলাদা অথচ পরস্পর সম্পর্কিত তলে তার আলোচনা করেছেন। একটা কলোনিয়াল, একটা পোস্টকলোনিয়াল। তার মূল মনোযোগের জায়গা পোস্টকলোনিয়াল, মাঝে মাঝে এসেছে কলোনির রেফারেন্স — সংক্ষিপ্ত বুদ্ধিদীপ্ত একটু গল্প বলার ঢঙে — তার মধ্যেও ছাপ আছে তার অর্ন্তদৃষ্টির এবং ভাবতে পারার। কিন্তু তার লেখার মূল কণ্ঠস্বর একজন পরবাসী ইমিগ্রান্টের, একজন আগন্তুকের। পশ্চিমের প্রথম বিশ্বের বিস্ময়ের পৃথিবীতে প্রথম পা রাখা তৃতীয় বিশ্ব থেকে আসা আগন্তুকের। গোটা ব্রহ্মাণ্ড তার কাছে দুটো জগতে বিভক্ত — সাহেব আর নেটিভ। এই অজানা অদেখা ভূমি এই আগন্তুককে পৌঁছে দিচ্ছে একটা অন্য ভূমির মুক্তিতে — সেটাই তৃতীয় ভূমি, ভাভার থার্ড স্পেস। এই তৃতীয় ভূমির খোলা দিকচক্রবালে সে হাঁটছে আর পেরিয়ে যাচ্ছে তার চেনা পুরোনো পৃথিবীর আবেগ উচ্ছ্বাস গতিময়তাগুলোকে। পেরিয়ে যাচ্ছে তার চেনা বর্গগুলোকে, ধারণাগুলোকে, শব্দগুলোকে, চিন্তা এবং তত্ত্বগুলোকে। পুরোনো পরিবারের গিঁটগুলো খুলে যাচ্ছে তার, পিছনে ফেলে যাচ্ছে তার এতদিনকার শিকড়, এতদিন যাদের সে শিকড় বলে ভাবত। এই ভূমি অনন্ত উণ্মুক্ত। এখানে শিকড় নেই, তাই শিকড় ছিঁড়ে উপড়ে যাওয়ার বেদনাও নেই। ভালোবাসা, বা যার অন্য নাম ঘৃণা, তারাও কেউ নেই এখানে। এমনকি ঘৃণা আর ভালোবাসার টানাপোড়েনে জটিল সম্পর্কের জটিলতর আকর্ষণও নেই। এই

ভূমির কোনো দিগন্তরেখা নেই, তাই এই ভূমি সর্বব্যাপী, সব জায়গা জুড়ে আছে, বা, কোনো জায়গাতেই নেই। সব ঠাঁই ঘর তো তারই থাকে যে তার নিজের ঘর জমি ভিটে হারিয়ে ফেলেছে আগেই। হারিয়েছে কুলপরিচয়। হারিয়ে ফেলেছে নিজের ভূগোল এবং ইতিহাস। এখন সে যাযাবর, পথ থেকে পথে, নিরন্তর প্রব্রজ্যায়। নোমাডিক আইডেন্টিটি।

ভাভার এই তৃতীয় ভূমিকে বুঝতে, এই ইমাজিনারিকে, কল্পবিশ্বকে বুঝতে অতিনির্ণয় বা ওভারডিটারমিনেশন খুব কাজে আসে। (এখানে এই ইমাজিনারি বা কল্পবিশ্ব শব্দে লাকাঁর একটা ছায়া রইল, পরে যেটাকে আমরা একটু ছুঁয়ে যাব।) ভাভা কিন্তু কোথাও এই ওভারডিটারমিনেশনের নাম করেননি। যদিও খুব তেরছা কিছু ইঙ্গিত আছে। ভেবে নিন একটা সাংস্কৃতিক ভূমিকে যেখানে মডার্নিজম আর ট্রাডিশন পরস্পরকে অতিনির্ণয় করছে। যেহেতু তারা দুজনেই দুজনকে নির্মাণ ও নির্ণয় করছে তাদের দুজনেরই মূল অর্থের অবয়বের চারপাশে জমা হচ্ছে কিছু উদ্বৃত্ত অর্থ। ফলতঃ তারা দুজনেই নিজের নিজের আইনসম্মত জমিকে অতিক্রম করে বেরিয়ে যাচ্ছে, অন্যের জমিতে অনুপ্রবেশ করছে এবং হাজির থাকছে। নিজের একার জমি বলেই আর কিছু না থাকায় আধুনিক আর ঐতিহ্য বলে কিছু থাকছে না, থাকছে না কোনো মূল বা ছিন্নমূলতা। গুলিয়ে যাচ্ছে স্বদেশী আর বিদেশী। সবাই-ই আছে প্রত্যেক জায়গায়, তাই, কেউ-ই কোথাও-ই নেই।

কিন্তু আমাদের অনেকদিনকার আদরের একটা জিনিষের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটে গেল এতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পরে সংবেদনশীল সাহিত্যে শিল্পে যে এলিয়েনেশন রুটলেসনেস ইত্যাদি আমরা পেয়েছিলাম এবং খেয়েছিলাম সেগুলো এবার সাতকেলে হয়ে গেল, একটুও আর ফ্যাশনের রইল না, আভাঁগার্দ রইল না। সবই যদি এভরিথিং আর নাথিং হয়ে যায় একই সঙ্গে তাহলে আলাদা করে কোনো নাথিংনেস থাকে না আর। এতদিনকার আভাঁগার্দরা হয়ে গেল জাস্ট আর এক রকমের টেলিভিশন সিরিয়াল, একটু ইন্টেলেকচুয়াল, বা হয়ত একটু পলিটিকালও। (কাকে বলে ইন্টেলেকচুয়াল, পলিটিকাল? আমি এক মিহিরকে চিনি, বচ্চনের অগ্নিপথ দেখতে গিয়ে, সরমার বাইরে ডাকবাংলার মোড়ে তেলেভাজা কিনতে কিনতে তার বৌকে বলেছিল, 'তুমি বুঝলে হয়, খুব পলিটিকাল, ইন্টেলেচুয়াল বই'। তার বৌ আলুর চপে কামড় দিয়ে বলেছিল, 'তুমি বলে দিও', যার অর্থ, না বুঝলেই বা কী, চপ তো খাচ্ছি, বেড়াতে তো এলাম, আজ আর শ্বাশুড়ির গাল শুনতে হল না। সার্ত্রের কয়েকশো তো নয় কয়েক লক্ষ পাতার বোর বোকামি 'বিয়িং অ্যান্ড নাথিংনেস' পড়তে পড়তে, মানে পড়ার চেষ্টা করে মাঝপথে ছেড়ে দিতে দিতে, আবার কি মনে পড়েনি মিহিরের বৌ-এর কথাগুলো? হতে পারে আসলে সার্ত্রের ওই বইটা একটা শব্দকল্পদ্রুম, সব জ্ঞানের আধার, ঈশ্বরের মত, অমরেশের মত, পণ্ডিত ও ধীমান, কিন্তু আমার ওতে কী হবে, আমার চপ খাওয়ার বেড়াতে যাওয়ার কোনো হেরফের?)

এবার ফেরত আসা যাক আমাদের সিন্থেটিক স্পেসের সঙ্গে প্রতিতুলনায়। যেমন বলেছিলাম, সিন্থেটিক স্পেস যদি সেই মানুষদের ভূমি হয়, যারা নিজের ভিটেয় পরবাসী, ভাভার থার্ড স্পেস হল সেই পরবাসী মানুষদের ভূমি যারা নিজেদের অস্তিত্বকে অতিক্রম করে যাচ্ছে এবং পরবাসেই খুঁজে পাচ্ছে তার নিজের ঘর, একটা পোস্টকলোনিয়াল প্রেক্ষিতে। আমাদের সিন্থেটিক স্পেস এর দৃষ্টিকোণ থেকে পোস্টকলোনিয়াল বিষয়ে ভাভার এই সময়-নির্দিষ্ট ইতিহাসবাদী হিস্টরিসিস্ট ধারণাকে অত্যন্ত প্রহেলিকাময় লাগে। ভাভা তার পরবাসী ইমিগ্রান্টকে এই উত্তরউপনিবেশে এসে পরবাসে তার নিজভূমি খুঁজে পেতে দেখছেন, তার আগে অব্দি নয়। এই হারানো আর খুঁজে পাওয়া ঘটছে সাতচল্লিশের ১৫ই অগাস্ট রাত ১১টা ৫৯মিনিট ৬০সেকেন্ড থেকে। (ভাভার এই ইতিহাসবাদের যান্ত্রিকতার কথা আমরা আগেও বলেছি।) ভাভা যেভাবে উপনিবেশকে বুঝেছেন তাতে সেখানে কোনো ঘরছুট দলছুট হাইব্রিড নোমাডিক ব্যক্তিসত্তা নেই, সেখানে সবই শান্ত সবই ভালো — ভাভার এই সত্যকে আমাদের বড্ড জমকালো লাগে। জমকটা, যেমন বলেছি আগেই, বোধহয় আসছে তার নিজের অবস্থানকে কম অপমানের কম বেদনার করে তুলতে গিয়ে। এটা সত্যিই বেশ অস্বস্তিকর, কারণ, আমরা এই তৃতীয় বিশ্বের আবাগির বেটাবেটিরা আমরা তো বহুদিন বহুবছর হল নিজভূমে পরবাসী হয়ে যাওয়া চিনে আসছি, বহু বছর, ধরুন আড়াইশো প্রায়। আমরা জানি আমাদের

আত্মপরিচিতি, আইডেন্টিটিগুলো নোমাডিক, অস্থির, সিন্থেটিক হয়ে আছে সেই ইংরাজ শাসনের প্রায় শুরু থেকেই। এই আড়াইশো বছরে কত রাজছত্র ভেঙে পড়েছে, রণডঙ্কারা বারবার শব্দ তুলেছে এবং স্তব্ধ হয়েছে জাতিসঙেঘর শান্তিতে, ইংরেজ ফরাসী হিস্পানিক প্রভুরা এশিয়ায় আফ্রিকায় লাতিন আমেরিকায় তাদের জয়স্তম্ভ ফেলে ফিরে গেছে ইউরোপে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পরে স্বাধীন সার্বভৌম হয়েছি আমরা একে একে। ভাভার পোস্টকলোনিয়াল ইমিগ্রেশন শুরু হয়েছে তার পর, শুরু হয়েছে পরবাসের প্রথম বিশ্বে তৃতীয় বিশ্ব থেকে আসা মানুষের ঘর খুঁজে পাওয়া। স্বাধীন দুই দেশের ভূগোলের সীমানা পেরিয়ে ভাভার অভিবাসী তার সত্তাকে পুনরাবিষ্কার করতে পারছে, খুঁজে নিতে পারছে তার নোমাডিক আইডেন্টিটিকে, তাহলে পনেরোই অগাস্ট রাত বারোটার সময়ের সীমা পেরোতে এত অপারগ কেন এরা? ভূগোলের সীমা ভাঙার তাত্ত্বিকরা কলোনিয়াল আর পোস্টকলোনিয়ালে বিভক্ত ইতিহাসের সীমা ভাঙতে হেরে যাচ্ছেন কেন বারবার? কলোনিয়াল এবং পোস্টকলোনিয়ালের ভিতর এই নাটকীয় পার্থক্যীকরণের নিরিখটা কী তাদের? উত্তরউপনিবেশে তারা ঠিক কী কী জিনিষ খুঁজে পাচ্ছেন যা উপনিবেশে নেই?

মানে, এমনটা তো ভাবা যেতেই পারত — 'পোস্টকলোনিয়াল' শব্দটির 'পোস্ট' অংশটা একটা ল্যাম্পপোস্টের মত, দাঁড়ি চিহ্নের মত, খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা বর্ডার, সীমান্ত। যাকে পেরিয়ে যাচ্ছে কোলোনিয়ালিজম, আরো বিস্তৃতি এবং গভীরতা পাচ্ছে, আরো সূক্ষ্ম এবং দুর্লক্ষ্য, আরো জটিল এবং সিন্থেটিক, এবং হয়ে উঠছে পোস্টকলোনিয়ালিজম। মানে একই থার্ড স্পেস, তাকেই খুঁজে পাওয়া যেত কলোনিতে এবং পোস্টকলোনিতে উভয় জায়গাতেই। কিন্তু ভাভারা তা পেলেন না, কলোনিতে পেলেন মিমিক্রি এবং পোস্টকলোনিতে থার্ড স্পেস। তফাতটা তারা কোথায় করলেন?

ভাভা তার তাত্ত্বিক যাত্রা শুরু করেছেন বাইনারি বৈপরীত্যের ধারণার বিরুদ্ধে অভ্যস্ত উত্তরআধুনিক অবস্থান থেকে। বিভিন্ন ধরনের এই বাইনারিবাদ বা দুই মেরুতে ভেঙে বাস্তবতাকে বোঝার প্রকরণ নিয়ে আমরা তো আগেই আলোচনা করে এসেছি। ভাভাদের এই বাইনারি-বিরোধিতার অবস্থানের অংশীদার আমরাও। ভাভারা এর সঙ্গে এনেছেন 'অস্তিত্ব এবং ইতিহাস নিয়ে এককেন্দ্রিক মতামতের রূপকথা' (*টোটালাইজিং ইউটোপিয়ান ভিশনস অফ বিয়িং অ্যান্ড হিস্ট্রি*), মানে সবটাকে একই সমগ্রের অন্তর্গত ধরে নিয়ে সবকিছুকে একই ফ্যাসিস্ট ফরমুলায় বুঝে ফেলা যাবে এই বিশ্বাস, এবং সেই অবস্থান থেকে বাস্তবতা সম্পর্কে কাল্পনিক মডেল। কাল্পনিক, কারণ, বাস্তব তো সেটা হতেই পারে না, শুরুই হয়েছে এই ভুল জায়গা থেকে সে সবটাকে আমি এক ফরমুলায় বুঝে ফেলতে পারব। এই ফ্যাসিস্ট সমগ্রবাদের একইরকম বিরোধী আমরাও। তার সঙ্গে ভাভা এনেছেন মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলোর পাকানো এক ভুঁইফোড় আন্তর্জাতিকতাবাদের কথা, যা আসলে এই বদলে যাওয়া দুনিয়ায় পুঁজির আর এক রকমের হেজেমনি : অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ফলতঃ মতাদর্শগত — যা ফলে ওঠে আমাদের তৃতীয় বিশ্বের সস্তা শ্রমশক্তির উপর (*দি ইকনমিক, পলিটিকাল অ্যান্ড রেজালট্যান্টলি ইডিওলজিকাল হেজেমনাইজিং অফ দি স্পুরিয়াস ইনটারন্যাশনালিজমস অফ দি এমএনসি-জ দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ম্যাপস দি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ক্যাপিটাল ইন্টু দি চিপ থার্ড ওয়ার্ল্ড লেবার*)।

এ গপ্প আমাদের এই তৃতীয় বিশ্বের তিন নম্বর ছাগলছানাদের আর নতুন করে বোঝানোর কী আছে? এতো আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝছি রোজই। কলকাতাকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বৃদ্ধাশ্রম করে দিয়ে বাথরুমে সব ক্বাথ ফেলে দিয়ে, যুবকেরা চলে যাচ্ছে ব্যাঙলোরে, বম্বেতে, আর শেষ অব্দি যাচ্ছে, যদি সেই ভাগ্যবান গাধাটার জুটে যায় সেই মহার্ঘ মুলো, সবার আর জোটে কই, আমেরিকায়।

এই তৃতীয় বিশ্ব আগত অভিবাসী শ্রমিকেরা আমেরিকানদের চেয়ে কম মাংস খায়, কম মাল খায়, কম খায় সবকিছুই, তাই কত কম মজুরিতেই তারা খাটে। এই মজুরিতে তো আমেরিকার কালো মজুরও খাটে না। কম মজুরি মানেই আরো মুনাফা, আরো বড় হচ্ছে মাল্টিন্যাশনালরা, আরো ক্ষমতাশালী। তারপর মাঝে মাঝে, যখন যেমন তার ব্যাবসার হ্রাসবৃদ্ধি, ছুঁড়ে তাদের ফেলে দিচ্ছে ডাস্টবিনে, তারা পালে পালে ফেরত আসছে দেশে। গরিব দেশের গরিব রসদ নিংড়ে শিক্ষিত হওয়ার পর এতদিন ভারতের প্রাপ্য উদ্বৃত্ত

আমেরিকায় দিয়ে এসে তারা আর কী করবে — যজ্ঞ ছাড়া? ব্যাঙলোরে হাজার হাজার সফটওয়ার বিশেষজ্ঞের বেকারি-তাড়ন যজ্ঞের কথা পড়েননি কাগজে?

তাও, স্বপ্ননির্মাণের হেজেমনি তো ওই এমএনসির হাতেই। 'চলো আমেরিকা'-র স্বপ্ন। যে হেজেমনি পথ খুলে দেয় আরো বড় হেজেমনির — দেশের অর্থনৈতিক সারপ্লাস বিদেশে চালান হয়ে যাওয়ার। এই ভুঁইফোড় হেজেমনি তো সত্যিই ভুঁইফোড়, কারণ, একটা সময় আঙুল তুলে দেখানো যেত, এই শুয়োরের বাচ্চাই ব্রিটিশ কলোনিয়ালিজম, আমাদের কঙ্কাল মায়েদের মাই শুকনো করে দিচ্ছে, তাতে ঝুলছে শুকনো টিকটিকির মত মরা বাচ্চা, দুর্ভিক্ষের সেই ছবি। আজ কাকে দেখাবে তুমি? কেউ নেই যাকে তুমি চিহ্নিত করতে পারো, কিন্তু তোমার সারপ্লাস হাওয়া হয়ে যাচ্ছে রোজই। তুমি আজো ঔপনিবেশিক কারণ তোমার উপর চলছে উপনিবেশের শোষণ, শুধু এই শোষণকর্তা ঔপনিবেশিক প্রভুর আলাদা করে আর নাম করা যায় না। আমাদের কাছে উত্তরঔপনিবেশিকতা বলতে এটাই — এই নামহীন ঔপনিবেশিকতা। (অন্যত্র আমরা এ আলোচনা বিশদ ভাবে করেছি, আমাদের বই 'মার্জিন অফ মার্জিন'-এ। আর খুব শিগ্গিরি এই বিষয় নিয়ে সিরিজে তিনটে লেখা বেরোনোর কথা, 'অন্য স্বর'-এ, অজিত চৌধুরীর, প্রণব বসুর, আর আমার)।

## ১১।। সাংস্কৃতিক পার্থক্য, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র

ভাভা এরপর তার এই সমাজবাস্তবতার ধারণার উপর দাঁড়িয়ে এই বিশ্ব-কাঠামোয় তত্ত্বের ভূমিকা আলোচনা করতে (*রোল অফ থিয়োরি ইন টুডেজ ওয়ার্ল্ড-অর্ডার*) অগ্রসর হন। এবং সেই আলোচনায় তার প্রবেশের বিন্দুটা হয় ওই সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক হাইব্রিডিটিগুলো যারা 'জাতীয় সংস্কৃতি' নামক বর্গের কোনো গম্ভীর/ বিশ্বস্ত/ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধারণার মাথায় এক কথায় জল ঢেলে দেয়। এই হাইব্রিড পরিচিতি এবং বর্গগুলো একটা বদলাতে থাকা ক্যালেইডোস্কোপের মত। তাদের আভ্যন্তরীন সীমানা গুলো প্রাথমিক ভাবেই অস্পষ্ট এবং সেগুলোও আবার শুধুই বদলাচ্ছে। এবং বর্গগুলো আবার তাদের বদলের এই পারস্পরিক সম্পর্ক দ্বারা নির্ণীত।

ধরুন পরপর দুটো হলিউড ফিল্ম হিট করে গেল যাতে জাপানি এশিয়ান এই পরিচিতিটা একদম ভিন্ন ভাবে চিত্রিত। ধরুন, তাতে জাপানি মানেই জাপানি মাফিয়া। এতে এশিয়ান অধ্যুষিত এলাকায় আফ্রিকান আমেরিকান আর আমেরিকান মানে কালো আর সাদা আমেরিকানদের মধ্যে এশিয়ানাতঙ্ক খুব বাড়ল। তাতে, ভারত বা কোরিয়া বা চিন মানে অন্যান্য জায়গার অজাপানি ইমিগ্রান্টরা আবার জাপানের সঙ্গে নিজেদের পার্থক্য খুব স্পষ্ট ভাবে উচ্চারিত করে তুলল। মানে, একজন চৈনিক তার নিজের দেশে যতটা চৈনিক তার চেয়েও বেশি চৈনিক করে তুলল নিজেকে, সে যে জাপানি নয় এটা প্রমাণ করতে। এই পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের পার্থক্যের গতিশীল চালচিত্রটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এখানে। আগেই যেমন বলেছি বাঙালি নিজে নিজে তো কোনোদিন বাঙালি হতে পারে না। সে বাঙালি হয় বিবিধ প্রকারের অবাঙালিদের সঙ্গে নিজেকে পৃথক করতে করতে। যেমন আমরা বাঁচি তিনমাত্রায় বা থ্রি ডাইমেনশনে। সেটা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। কিন্তু সেটা আমাদের পরিচিতি হয়ে উঠবে যদি আমরা কোনোদিন চারমাত্রার জীবদের সঙ্গে আলাপচারিতায় আসি। সেদিন আমরা 'তিনমাত্রিক প্রাণী' এই অভিধাটাই আমাদের পরিচয় বলে জানব।

তাই এখানে ওই চৈনিক বা জাপানি বা গুজরাতি বা বাঙালি এই পরিচয়গুলোর কোনো প্রদত্ত অর্থের, ঐতিহাসিক তথ্যগত বর্গের কোনো আর মানেই থাকছে না। বাঙালিত্ব কী? — যা তাকে গুজরাতি চিনে জাপানি আর আমেরিকানদের থেকে পৃথক করছে। যে কোনো কিছুই এখানে বাঙালিত্ব বলে চলে যেতে পারে, যদি সেটা অন্যদের সঙ্গে পার্থক্যীকরণের এই প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে, এবং যাই চলে যাক না কেন, তখন সেটাই তার বাঙালি এই পরিচিতি হয়ে দাঁড়াবে। যে দুর্গাপুজো লন্ডনে নিউইয়র্কে বা ওয়াশিংটনে হয় তা দুর্গাপুজো নামে প্রসিদ্ধ, কারণ, তা একবার চলে গেছে। দুর্গাপুজোর সামাজিক রাজনৈতিক পৌরাণিক ইতিহাস নিয়ে সেখানে কিছু এসে যায় না।

আগেই যেমন বলেছি আমরা, ভাভা এখানে ব্যবহার করছেন কালচারাল ডিফারেন্স আর কালচারাল ডাইভার্সিটি বলে দুটো বর্গ। কালচারাল ডিফারেন্স বা সাংস্কৃতিক পার্থক্য হল নড়তে থাকা সীমান্তের কাহিনী।

সাংস্কৃতিক পরিচিতিগুলো যেখানে শুধুই এ ওর এলাকা পেরিয়ে ঢুকে আসছে এবং বেরিয়ে যাচ্ছে। এটা একটা বোধের মননের সচেতন প্রক্রিয়া। 'এটা আমার পরিচিতি', এরকম আমি ভাবছি, সেরকম হয়ে উঠছি, এবং এই হয়ে ওঠাটাই আমার 'সাংস্কৃতিক পার্থক্য' — একজন বাঙালির বাঙালি হয়ে ওঠাটা একজন গুজরাতির গুজরাতি হয়ে ওঠার থেকে পৃথক হচ্ছে (*দি গেম অফ ক্রসিং দি বর্ডারস অফ কালচারাল আইডেন্টিটিজ অ্যান্ড ইনাপ্লিয়েশন অফ কালচার ইটসেল্ফ অ্যাজ নলেজেবল*)।

যেমন বললাম, একজন আধুনিক বাঙালি যুবক সারাজীবন বাগবাজারে বাস করে কোনোদিনই ক্যাসেটের মন্ত্র হাত জোড় করে আউরে যাওয়াটাকে তার নিজের বাঙালি হয়ে ওঠা বলে মনে না করতেই পারত, যা সে এখন করছে। কাকে কাকে বাঙালি বলা যায়, কী কী করে বাঙালি হয়ে ওঠা যায় এটা সে খুঁজছে এখন, যা কলকাতায় থাকলে কোনোদিনই খুঁজত না। এর উল্টোদিকে ভাভা রেখেছেন কালচারাল ডাইভার্সিটি বা 'সাংস্কৃতিক বৈচিত্র'। এটা হল সাংস্কৃতিক তফাত বোঝার ওই প্রক্রিয়ার সারবাদী বা এসেনশিয়ালিস্ট একটা রকম। আলাদা আলাদা সংস্কৃতিকে তাদের প্রদত্ত অর্থের ভাণ্ডারের নিরিখে তুলনা করে বোঝা। একটা সংস্কৃতি এবং তার চালু প্রথাগুলোর যেন একটা প্রদত্ত অর্থ আছে — যে অর্থ একটা গোটা সংস্কৃতিকে আর একটা গোটা সংস্কৃতি থেকে পৃথক করছে। এই সমগ্র সংস্কৃতির প্রতিটি অংশীদারের মধ্যেই যা বহমান, এবং যা এই সংস্কৃতির প্রত্যেককে অন্য সংস্কৃতির প্রত্যেকের থেকে পৃথক করে। এবং এই সমগ্রবাদী পার্থক্য তাদের ঐতিহ্য দ্বারা প্রদত্ত (*রিকগনিশন অফ প্রি-গিভেন কালচারাল কন্টেন্টস অ্যান্ড কাস্টমস*)। ভাভা, খুব সঙ্গত ভাবেই, এই সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের বিষয়টাকে একটা সমগ্রবাদী রূপকথার অংশ ভেবেছেন (*ইউটোপিয়ানিজম অফ এ মিথিক মেমরি অফ এ ইউনিক কালেকটিভ আইডেন্টিটি*)। কারণ, যে কোনো আদিম প্রদত্ত আবহমান পার্থক্যের ধারণার পুরোটাই এক ধরনের একটা এসেনশিয়ালিজম। নইলে মানতে হয়, ঈশ্বর গুজরাতিকে গুজরাতি করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, আর বাঙালিকে বাঙালি।

সাংস্কৃতিক পার্থক্য হল সেই জ্যান্ত প্রক্রিয়াটার নাম যার মধ্যে দিয়ে একটা সংস্কৃতির (বা সেই সংস্কৃতি বিষয়ক) বিভিন্ন বিবৃতি অন্যান্য সংস্কৃতির এই ধরনের বিবৃতিগুলোর সঙ্গে মুখোমুখি হয়, পারস্পরিকতায় আসে, কখনো বন্ধুত্ব করে, কখনো শত্রুতা, তৈরি করে তাদের নিজের নিজের বলরেখার তল, তাদের নিজস্ব নিজস্ব চিহ্ন, নথী, এবং শেষ অব্দি নির্মাণ করে দেয় সেই টেক্সট-এর সীমা বা সীমারেখা-টেক্সট যার শরীরে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ পরস্পরের সাক্ষাতে আসে। এখানে যে কোনো ক্রিয়াই এক একটা সাংস্কৃতিক বিবৃতি। কমল হাসান রতি অগ্নিহোত্রীর একটি ছবি এসেছিল অনেক বছর আগে, 'এক দুজে কে লিয়ে'। ভারতের সমাজের বদল সবচেয়ে যেখানে স্পষ্ট ভাবে চিহ্নিত হয় সেটা বম্বের সমাজ, অজস্র যেখানে জনগোষ্ঠী, পাশাপাশি থাকে তারা। সেই রকম দুটো আলাদা জনগোষ্ঠীর দুটি তরুণ আর তরুণী এবং তাদের প্রেম। ছেলেটি দক্ষিণী ব্রাহ্মণ পরিবারের, এবং মেয়েটি যতদূর মনে পড়ছে মারাঠী। এবং এদের পরস্পরকে প্রেমনিবেদনের একটা গান ছিল একটি লিফটের মধ্যে যে গানটা পুরোটাই লেখা হয়েছিল বিভিন্ন পপুলার হিন্দি সিনেমার নাম ব্যবহার করে।

(পপুলার হিন্দি সিনেমা — এটা একটা বিশাল তল, এবং অত্যন্ত বেশি গতিশীল। প্রতিমুহূর্তে সেখানে নতুন নতুন নানা উপাদান আসছে এবং উধাও হয়ে আসছে। এবং সেই আসা এবং উধাও হয়ে যাওয়া পুরোটাই ভারতবর্ষের জ্যান্ত ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে। ভারতের ইতিহাসের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ছায়াপাত হয়েছে হিন্দি পপুলার সিনেমায়। চীন ভারত যুদ্ধের সময়ে কমুনিস্ট ঘেন্নার দেব আনন্দ সিনেমাগুলোর কথা ধরুন, বা তারো আগের বলরাজ সাহনি এ কে হাঙ্গলদের খুব উচ্চারিত বামপন্থী সংস্কৃতির ছবিগুলো, যার রেশ এখনো বয়ে যাচ্ছেন অল্পবিস্তর গুলজার বা জাভেদ আখতার। খুব সাম্প্রতিক ইতিহাসে বম্বে বম্ব ব্লাস্ট এবং তার পরবর্তী দাঙ্গার ইতিহাস নিয়ে সরাসরি বানানো 'বম্বে' বা 'ক্রান্তিবীর'। সাম্প্রদায়িক বাস্তবতার বিপরীত কথা খুব স্পষ্ট বলা হয়েছে 'ঘুলাম-এ-মুস্তফা' বা 'সরফরোশ'। যেখানে খুব অস্পষ্ট এটা সেরকম পুরোপুরি অ্যাকশনের ছবি 'অর্জুন পণ্ডিত' বা কাদের খান ডেভিড ধাওয়ান গোবিন্দার ক্যাওড়া সিনেমাগুলোও কী আভ্যন্তরীন তাগিদ থেকে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী কথা বলে চলে। মনোপলি ক্যাপিটাল যে আমাদের কাস্ট আর ক্রিডের স্মৃতির বাইরে আনে তার এর চেয়ে বড় কোনো উদাহরণ হয়

না। এসব বড় বড় ঘটনা বা প্রবণতা ছেড়ে দিন শুধু নিতান্ত এই পোস্টকলোনিয়াল হাইব্রিডিটি নিয়েই কতগুলো হিন্দি সিনেমা হয়ে গেছে বলুন তো। সেই সুদূর অতীতের অনিল কাপুর শ্রীদেবীর 'লমহে' দিয়ে শুরু। তারপর পরপর চলেছে 'দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে জায়েঙ্গে', 'পরদেশ', 'বিরাসত', এবং তারপরেও আরো অনেক। গোবিন্দা উর্মিলার 'কুঁয়ারা' বা গোবিন্দা সুস্মিতা করিশমার 'বিবি নাম্বার ওয়ান' বা সলমন-উর্মিলার 'জানম সমঝা করো' বা প্রশান্ত-ঐশ্বর্যর 'জিনস' এই হাইব্রিডিটির থিমের চারপাশেই বানানো সিনেমা। বম্বে পপুলার সিনেমায় ইতিহাসের এই অন্য পাঠের জোরের জায়গাটা অনস্বীকার্য। জনপ্রিয়তা এই পাঠের সবচেয়ে বড় সাপোর্ট। লোকের মনোমত হয় বলেই এরা বিক্রি হয় এবং পয়সা আনে। জায়গায় জায়গায় যখন তৃণমূলকে হারাতে সিপিএম নেতাদের বিজেপি বাঁচিয়ে বক্তৃতা দিতে হচ্ছিল তখন বারবার মনে পড়ছিল হিন্দি সিনেমার কথা। ধর্মের রাজনীতির প্রতি মানুষের প্রতিরোধের এ একটা খুব বড় জোরের জায়গা। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য ভারতের ইতিহাসের যদি একটা জায়গাতেও সত্যি হয়ে থাকে সেটা এই পপুলার বম্বে সিনেমা। সরফরোশ ভাবুন, হিন্দু নায়কের ভূমিকায় একজন মুসলিম স্টার, আর তার বীর মুসলিম সঙ্গী সেলিমের ভূমিকায় একজন মারাঠী ব্রাহ্মণ। লোকে দেখে যখন এগুলোও তাদের মাথায় থাকে।)

তা, যা বলছিলাম, সেই 'এক দুজে কে লিয়ে' সিনেমায় যখন কমল হাসান রতি অগ্নিহোত্রীকে তার প্রেমনিবেদন করছে পরপর হিট সিনেমার নামগুলোকে ব্যবহার করে তখন সে সেই লিমিট-টেক্সটকে ব্যবহার করছে, তার প্রতিমাগুলো আইকনগুলো দিয়ে, এই সিনেমাগুলো এবং তাদেরকে ঘিরে তৈরি হওয়ার আবেগগুলোর শরিক তারা দুজনেই, আবার পপুলার হিন্দি সিনেমার পর্দাতেই আমরা সেই বিভিন্ন সংস্কৃতির বিভিন্ন অর্থগুলোকে পরস্পরের মুখোমুখি হতে দেখছি। কমলের আর রতির। যখন সত্যিই দুটো জনগোষ্ঠী আলাদা থাকত, তামিল তামিলনাড়ুতে, আর মারাঠী মহারাষ্ট্রে তখন তো তাদের এই সাক্ষাত হত না, এখন হচ্ছে, ওই নায়ক আর নায়িকার, তার পিছনে কমল আর রতির, তাদের মত অন্য অনেক যুবক যুবতীর যারা জনগোষ্ঠী এবং পরিচিতি না মেনে, তাদের জীবন ও যৌবনের জোশে, রোজই প্রেমে পড়ছে বম্বের পথে ঘাটে। তাদের আলাদা আলাদা জনগোষ্ঠীর। যেখানে কমলের বাবাকে অতিকৃত দক্ষিণী উচ্চারণে কথা বলতে হচ্ছে, যেমন নানা হিন্দি সিরিয়ালেই হয়, তার নিজের পরিচিতির কালচারাল ডিফারেন্সে — মনে রাখবেন, কালচারাল ডাইভার্সিটিতে নয়।

কিন্তু কালচারাল ডিফারেন্স আর কালচারাল ডাইভার্সিটির এই বিরোধ তো আসলে দুই ধরনের দুটো সময়ের লড়াই। এই দুটো সময়ধারণার ভিতর এখন একটা স্প্লিট বা ছেদ আসে। একটা রূপকথার সময় — পৌরাণিক জাতিসত্তার। আর একটা চালু সময়ের শরীরে আবিষ্কৃত পুনরাবিষ্কৃত হতে থাকা কালচারাল ডিফারেন্সের সাম্প্রতিকতা। নতুন অর্থ নতুন সব সঙ্কেত যেখানে প্রতি মুহূর্তেই গজিয়ে উঠছে। এই নতুন নতুন ক্রমগজায়মান সব কোডেরা নিয়তই তাদের প্রদত্ত পৌরাণিক অর্থের আধার অতিক্রম করে এপার ওপার যাতায়াত করে। এই নিরবচ্ছিন্ন ফেরি পারাপার একটা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের পদ্ধতিকে চিহ্নিত করে। একে আর পুরোনো নিগেশনের ধারণা দিয়ে বোঝা যায় না, এর জন্যে দরকার পড়ে নেগোসিয়েশন, দরকষাকষি। যেখানে কেউই কাউকে সম্পূর্ণ নাকচ করে না। বা নাকচ হয়ও না। এই নিয়ত নেগোসিয়েশনের ভিতর এলোমেলো হয়ে পড়ে সব পুরোনো নিশ্চয়তাগুলো, সব বাইনারি বিরোধগুলো, যেখানে সাদা আর কালো আলাদা ছিল, এখন তো শুধুই নানা ধরনের ধূসরের দরকষাকষি। এখানে অতীত ঐতিহ্যের নামে যা চলে তা সবই আসলে ক্ষমতার এক একটা কৌশল, যে অতীতটুকু আমার বাস্তবতা আমায় রাখতে অনুমতি দিচ্ছে, সেটুকুই রাখতে পারছি আমি। তারপরে তাকেই আমি আমার অতীতের স্মৃতি বলে ঘোষণা করছি, আমার জাতিসত্তা, আমার পৌরাণিক পরিচয়। ক্যাসেটে মন্ত্রপাঠ আমার অতীতের অংশ হতে পারে না, তাও সেটা করেই আমায় দুর্গাপুজো করে বাঙালি হতে হবে, কারণ সেটাই আমার জাতিসত্তা বলে ক্ষমতা স্বীকার করে নিয়েছে। তাই, এই অতীত তো ক্ষমতার হাতে নির্মিত। অতীতের স্মৃতি বলেই আর কিছু নেই। (আমাদের তত্ত্বের ভাষায় ভাভার এই মতামতের মানে দাঁড়ায়, আমার অতীত আর বর্তমান অতিনির্ণীত হয়ে বসে আছে, আধুনিকতা আর ঐতিহ্য ওভারডিটারমিন্ড হয়ে গেছে)। দুই সময়ধারণার এই

ছেদ থেকে, কালচারাল ডিফারেন্সের এই প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয় এক নতুন সাংস্কৃতিক ভূমি — যা সব জাতিসত্তা এবং পরিচিতির বাইরে, যার নাম তৃতীয় ভূমি, থার্ড স্পেস।

কালচারাল ডাইভার্সিটি বা সাংস্কৃতিক বৈচিত্র সেই সারবাদী এসেনশিয়ালিস্ট বর্গ যা জাতীয় সংস্কৃতির একটা মিথ্যা স্মৃতিকে নির্মাণ ও প্রচার করে। তার জায়গায় আসে কালচারাল ডিফারেন্স বা সাংস্কৃতিক পার্থক্য, নিজের আভ্যন্তরীন করে নেয় একটা জটিল ও বহুমুখী আলোচনাগত ভূমিকে, যেখানে নিগেশন নয়, চলে নেগোসিয়েশন। ভাভার এই নেগোসিয়েশন (যাকে ট্রান্সলেশন বলেও ডেকেছেন ভাভা) আর একটা নতুন ধরণের সময়বোধকে হাজির করে আর একটা নতুন ধরনের দ্বন্দ্ব বা ডায়ালেক্টিক সহ যা কোনো আদি ও সনাতন ইতিহাসকে ধরে নেয় না (*এ টেম্পোরালিটি উইথ এ নিউ ডায়ালেক্টিক দ্যাট নো লংগার প্রিসাপোজেজ এ টেলেওলজিকাল অর ট্রানসেন্ডেন্টাল হিস্ট্রি*)। (এই নতুন ডায়ালেক্টিক হল ভাভার নিজের মত করে ওভারডিটারমিনেশনকে বুঝতে চাওয়া, যেখানে থিসিস এবং অ্যান্টিথিসিস দুজনের কেউ কাউকে আর অ্যানিহিলেট বা হত্যা করে না, বরং প্রত্যেকেই অন্য প্রত্যেকের দ্বারা নির্ণীত ও নির্মিত।)

## ১২।। বিভিন্ন অবস্থানের দরকষাকষি

ভাভার কাজ উত্তরআধুনিক উত্তরঔপনিবেশিক সংস্কৃতিবিদ্যার তলে ক্রিটিকাল থিয়োরি বা সমালোচনা-তত্ত্ব। সেখানে সব তত্ত্বই আসে ডিসকোর্সের সাপেক্ষে, বিদ্যাচর্চা ও আলোচনার সঙ্গে মিলিয়ে। আমাদের পলিটিকাল সোশাল ডিসকোর্স মানে, এক অর্থে, বিভিন্ন নির্দিষ্ট অবস্থানের মধ্যে একটা পোলেমিক বা আলোচনা প্রতিআলোচনার উতোর চাপান। রাজনৈতিক সমাজনৈতিক আলোচনার এই প্রতিটি অবস্থানকেই একটা নিয়ত নেগোসিয়েশন ও ট্রান্সলেশন-এর মধ্যে দিয়ে যেতে দেখছেন ভাভা। যেখানে প্রতিটি অবস্থানই অবিরত অন্য অবস্থানগুলো থেকে নতুন নতুন অর্থ আহরণ করছে, নিজের করে নিচ্ছে। এবং এই প্রতিটি অবস্থানেরই একটা নিজস্ব আরব্ধ আছে, একটা পৌঁছতে চাওয়া, একটা অবজেক্ট। সেই অবজেক্টগুলোর প্রতিটিই অন্য অবজেক্টগুলোর সঙ্গে তার সম্পর্কের দ্বারা নির্ণীত, এবং প্রতিটি আলোচনাতেই এই অবজেক্টগুলো অন্য অবজেক্টদের সাপেক্ষে একটু একটু করে নড়ে যেতে থাকে, ট্রান্সলেটেড, নেগোশিয়েটেড, ডিসপ্লেসড। (আবার খেয়াল করুন, নিজের মত করে, ডিসকোর্স-এর তলে, বিভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থানগুলোর ভিতর ওভারডিটারমিনেশনকে আনছেন ভাভা।)

এই রাজনৈতিক অবস্থানগুলোর ভিতর কিছু অবস্থান র‍্যাডিকাল বা চালু অবস্থার পরিপন্থী, পরিবর্তনাকাঙ্খী। আর কিছু অবস্থান বা তাদের আভ্যন্তরীন প্রবণতা হল চালু অবস্থার পক্ষে। এখানে এই নেগোসিয়েশন বা ট্রান্সলেশন দুটো খুব জরুরী কাজ করে বলে ভাভা মনে করেন।

এক, সমালোচনার কর্তা ও কর্মর ভিতর (কর্তা মানে যে অবস্থান থেকে আলোচনা করা হচ্ছে, এবং কর্ম মানে ওই অবস্থানের যে আরব্ধ, মানে যেখানে পৌঁছতে চাইছে) যে একটা ঐতিহাসিক সংযোগ আছে সেটা স্বীকার করা (*অ্যাকনলেজমেন্ট অফ দি হিস্টরিকাল কানেক্টেডনেস বিটুইন দি সাবজেক্ট অ্যান্ড অবজেক্ট অফ ক্রিটিক*)। মানে, কেউই আদি ও সনাতন কিছু বলছে না, প্রত্যেকটা অবস্থান এবং তার আরব্ধ ও আলোচনা নিতান্তই তার সাম্প্রতিক ইতিহাসে আক্রান্ত। আর তার চেয়েও বড় কথা, এই একই ইতিহাস একই সাথে প্রভাবিত করছে আমার আলোচনা এবং আমার আরব্ধকে। আমি বদলালে আমার আরব্ধও বদলাচ্ছে। এটা খুব স্পষ্ট হয় মার্ক্সবাদী রাজনীতির দিকে তাকালে। একই শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি, কিন্তু সেই আরব্ধ কি একই সাথে সম্পর্কিত নয় সেই সময়ের ইতিহাসের উপর? লেনিন যে আরব্ধকে মাথায় রেখে তত্ত্ব নির্মাণ করেছিলেন তাঁর আলোচনায়, সেই একই আরব্ধ কি আসে বুদ্ধ-সুভাষের আলোচনায়? ভাভা যে জায়গাটার উপর জোর দিতে চাইছেন তা এই যে কোনো তত্ত্ব বা অবস্থান একটা প্রদত্ত কিছু নয়, কোনো বেলিনের লেখা থেকে যে আমাদের লেনিনের তত্ত্ব বুঝতে হবে তা নয়, কারণ, যাই আমরা শেষ অব্দি বুঝে উঠি না কেন, আলোচনায় আনি না কেন, তা হবে নিতান্ত আমাদের, আমাদের সাম্প্রতিক ইতিহাসের, লেনিনের নয়, বেলিনের তো নয়ই। আমার লেখায় 'শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি' হবে নিতান্তই আমার ও আমার সময়ের, কিছুতেই সেটা লেনিনের হবে না। লেনিনের মুন্ডুর ছাপ মেরে আমি শেষ অব্দি আমার ব্র্যান্ডের গেঞ্জি ও জাঙ্গিয়াই

বেচব। (কারা জানি খুব খার খেয়ে গেছিলেন না, রুশ একটা ফ্যাশন শো-য় একটি মেয়ে কাস্তে-হাতুড়ি ছাপ প্যান্টি পরে হেঁটেছিল বলে?)

আর, দুই, লড়াকু র‍্যাডিকাল অবস্থানগুলোর বহুমুখী ও অসমস্বত্ত্ব উৎসের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আমাদের খেয়াল করায় যে কোনো রাজনৈতিক রেফারেন্টের (মানে যাকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, সে কোনো ঘটনা, কোনো পদ্ধতি, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাই হোক না কেন) কোনো অপ্রশ্নেয় আদি সনাতনতা নেই এবং রাজনৈতিক আরব্ধগুলোও খুবই বহুমুখী ও অসমস্বত্ত্ব (*অ্যাবসেন্স অফ এনি প্রাইমর্ডিয়ালিটি অন পার্ট অফ দি পলিটিকাল রেফারেন্টস অ্যান্ড দি হেটেরোজেনেইটি অফ দি পলিটিকাল অবজেক্ট*)। ধরুন একটা কীর্তনের আসর। কী ভয়ানক গতিময় সেই কীর্তন, ভেবে দেখুন। চারপাশের নানা কারনে সুর এবং কথা বদলে যাচ্ছে নিয়তই, জ্যান্ত ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে। ধরুন কয়েকজন পরপর আফগানী ঢুকল সেই সভাঘরে, তখনই কীর্তনের কথাগুলো হয়ে গেল পুশ্‌তু। আবার ধরুন পরপর মড়া নিয়ে যাচ্ছে কীর্তনঘরের বাইরে দিয়ে, সুরটা হয়ে গেল করুণ, কান্নার। এই অব্দি গেল ভাভার এই দুই জোরের জায়গার প্রথমটা। আর এই দুই নম্বরটা আরো চিত্তির। ধরুন, আপনি শুনছেন যে গাওয়া হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের কীর্তন, ওই গোপবালাটালাদের নিয়ে, এই গোপ বদলে কখন গোঁফ হয়ে গেছে, আপনি এখন গাইছেন গোঁফের আমি গোঁফের তুমি ... ইত্যাদি। আসলে আমাদের রাজনৈতিক সমাজনৈতিক ডিসকোর্সের পলেমিকগুলো এইরকম একটা ভারি গতিশীল কীর্তন। ভাভা মনে করছেন এই দুই সচেতনতাই আমাদের মধ্যে নিয়ে আসার ভারি কাজ দেবে তার ওই নেগোসিয়েশন বা ট্রান্সলেশন-এর ধারনা।

কিন্তু এই দরকষাকষির মাধ্যমে একাধিক অবস্থানের ভিতর পারস্পরিক বদল বা ট্রান্সলেশন একমাত্র তখনই হতে পারে যদি এই ডিসকোর্সের ভিতরে ক্ষমতা প্রভাবিত টানাপোড়েনগুলো আমাদের ধারণায় থাকে। বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান, মানে, প্রতিষ্ঠানপন্থী বা প্রতিষ্ঠানবিরোধী দুই-ই (কারণ, প্রতিষ্ঠানবিরোধিতাও তো আর এক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে) এবং তাদের প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতা এই দুয়ের মধ্যেকার টেনশনগুলোর একটা ধারণা — এটা আমাদের মাথায় থাকা দরকার। এটা একটা জরুরী পূর্বশর্ত বলে ভাভা মনে করছেন। মানে ডিসকোর্সের গতিশীলতার পিছনে ক্রিয়াশীল ক্ষমতার গোপন গতিগুলো সম্পর্কে সচেতন থাকা। এবং তখনই ভাভার আলোচ্য সেই 'তত্ত্বের অন্য জগত' বা 'আদার সাইট অফ থিয়োরি' খুঁজে পাব আমরা।

এখানে দুটো জিনিষ ভাভা আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন। এক, অনেকগুলো পোস্টস্ট্রাকচারালিস্ট ভাবনা নিজেরাই এনলাইটেনমেন্ট মানবতাবাদ আর নন্দনতত্ত্বের বিরোধী। আর, দুই, বিষয়ী-অবস্থান, বা চিহ্ন-উৎপাদন বা আলোচনাগত নির্মাণ — এদের প্রত্যেকটিরই আভ্যন্তরীন সময়ধারণাগুলো বদলে ফেলা দরকার।

(উপরের প্যারাগ্রাফে আসা বিষয়গুলো ঠিকভাবে বিশদ করতে গেলে অনেকটা জায়গা দরকার পড়বে, এবং তার চেয়েও বড় কথা আমাদের এই প্রবন্ধের মূল গতি থেকে অনেকটা দূরে সরে যাব আমরা। তবু একটু ছুঁয়ে যাওয়া যাক। ক্ষমতার একটা নিজস্ব ব্যাকরণ আছে। ক্যাপিটালিস্ট ক্ষমতা যেমন ডিসকোর্সের উপর নিজের প্রভাব খাটায় তেমনি আবার কমুনিস্ট পার্টিকে কেন্দ্র করে একটা বদলি প্রতিষ্ঠান বা একটা বদলি ক্ষমতা ডিসকোর্সের উপর তার নিজের প্রভাব খাটায়। যেমন ধরুন মডার্নিজমের মূল যে ধাক্কাটা — বিজ্ঞান এবং যুক্তি দিয়ে সে সব অন্ধকারকে দূর করে দেবে, যে মতাদর্শেরই অন্য নাম এনলাইটেনমেন্ট বা আলোকপ্রাপ্তি মতাদর্শ — এর শরিক কিন্তু মার্ক্সবাদী চিন্তাপ্রক্রিয়াগুলোও। ক্যাপিটালিস্টের এই 'এনলাইটেনমেন্ট' নামক খেলাটা আসলে আর একটা রকমের ইম্পিরিয়ালিজম বা সাম্রাজ্যবাদ। তাই অন্য আর সব ইম্পিরিয়ালিজমগুলোর মত এটাও মানুষবিরোধী এইরকম ভাবে অনেকেই ভাবতে পারেন। অনেক তাত্ত্বিকই এই মতাদর্শের শরিক। কিন্তু মার্ক্সবাদ তা নয়। মার্ক্সবাদ এভাবে ভাবে না। এনলাইটেনমেন্ট আধুনিকতার শরিক ক্যাপিটালিজম আর মার্ক্সিজম দুজনেই, তাদের আভ্যন্তরীন শত্রুতা নিয়েই। আবার ক্যাপিটালিজম যেমন ডিসকোর্সের উপর নিজের ক্ষমতা ফলাতে শুধু পারসুয়েশন না কোয়েরশনেও কসুর করেনি, সেইরকম কসুর করেনি কমুনিস্ট ক্ষমতাও। আমেরিকার মত স্কেলে না হলেও রাশিয়ার ছিল হাঙ্গেরি

বা আফগানিস্থান এবং চিনের ছিল তিববত। তাই, পোস্টমডার্ন ভাবনা, যার একটা বড় এলাকাই এসেছে সরাসরি পোস্টস্ট্রাকচারালিজম থেকে, তার ভিতর এনলাইটেনমেন্টের পক্ষে এবং এনলাইটেনমেন্টের বিরুদ্ধে — এই দুই প্রবণতাই কাজ করেছে। গায়ত্রী স্পিভাক এই দুই প্রবণতার একটা উল্লেখ করেছিলেন তার 'ক্যান দি সাবঅল্টার্ন স্পিক?' প্রবন্ধে। পশ্চিমের দু ধরনের বুদ্ধিজীবীর কথা বলতে গিয়ে। দেলুজ গুয়াতারি সাইকোঅ্যানালিসিস সহ অন্যান্য এনলাইটেনমেন্ট কলকব্জার প্রাণপণ বিরোধিতা করেছেন। ধরুন ফুকোর আবিষ্কারগুলো — জেল সংস্কার, শিক্ষাবিজ্ঞানের বদল, নতুন চিকিৎসা প্রথা, নতুন ধরনের মনোবিজ্ঞান — যেগুলো ওই এনলাইটেনমেন্ট হিউম্যানিজম বা যুক্তিশীল মানবতাবাদের অংশ বলে ধরতাম আমরা এতদিন তারা আসলে ক্ষমতাকে আরো গভীর আরো প্রসারিত করে মানববাস্তবতার প্রতিটি স্তরে চারিয়ে দেওয়ারই কলকব্জা। এবার কেলোটা দেখুন, কোনদিকে যাব আমরা? আমরা কি বলব এগুলো ভালো? যেমন ক্যাপিটালিজম বলে? আমরা কি বলব, এগুলো খারাপ, কিন্তু এছাড়া কোনো পথ নেই, যেমন মার্ক্সবাদীরা অনেকেই বলে, মার্ক্সের সেই বিখ্যাত ওয়ে থ্রু সুইসাইড? এই দ্বিতীয় পথ যদি নিই, তাহলে, এর ভিতর কিন্তু একটা সময় ধারণা বা ক্রোনোলজি রয়ে যাচ্ছে। এটার চেয়ে ওটা ভালো, অন্তত ভালো কিনা এটা না বলতে পারলেও ওটা পরের, এবং অবশ্যম্ভাবী, এবং পথ ওই ওটার মধ্যে দিয়েই — অর্থাৎ, সময়ের একটা নির্দিষ্ট গতিমুখে বিশ্বাস। এটাও কিন্তু আক্রান্ত হয়েছে পোস্টমডার্নিজমে। ভাভা এই সবগুলো প্রবণতার বিষয়েই সচেতন করছেন আমাদের। ডিসকোর্সের অন্দরমহলে খেলা করে বেড়ানো ক্ষমতার গোপন ব্যাকরণ বিষয়ে।)

কিন্তু এই রি-হিস্টরিসাইজিং বা সময়ধারণার পুনর্নবীকরণ তো কোনো প্রদত্ত অর্থের (মানে এসেনশিয়ালিস্ট) কালচারাল ডাইভার্সিটি দিয়ে হতে পারে না। পারে কেবল সচেতন সাংস্কৃতিক অর্থের পুর্ননির্মাণের প্রক্রিয়া কালচারাল ডিফারেন্স দিয়ে। কালচারাল ডিফারেন্স প্রথমেই ধরে নেয় যে কোনো সংস্কৃতির একলা একা কোনো সত্তা বা পরিচয় বা অস্তিত্ব হতে পারে না। সংস্কৃতি সবসময়েই বাচে বহুবচনতায়। কিন্তু বহুবচনতা মানে কোনো 'ইন্ডিয়া অ্যান্ড হার পিপল' বা 'বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য' গোছের কোনো মানবতাবাদী সর্বধর্মসম্মেলন নয়। কোনো টোটালাইজিং নয়। বা, এই বহুবচনতা কোনো রীতি ও প্রথাগত আপেক্ষিকতা দিয়েও নয়। একটি সংস্কৃতি হল একটি টেক্সট, যে টেক্সট বেঁচে থাকে আর সব গুলো টেক্সট-এর সঙ্গে একই সাথে, তাদের পারস্পরিক পার্থক্যের প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে।

'আমি বাঙালি, তুমি গুজরাতি, তোমার সঙ্গে আমার এই এই পার্থক্য' — এটা নয়। আমি বাঙালি বাঙালি হয়ে উঠলাম, এবং তুমি গুজরাতি গুজরাতি হয়ে উঠলে ওই পার্থক্যের প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে। বাঙালিত্ব এবং গুজরাতিত্বের সব অর্থই তৈরি হচ্ছে ওই পার্থক্যের ক্রিয়ায়। কোনো প্রদত্ত আবহমান অর্থ দিয়ে পার্থক্য তৈরি হচ্ছে না। পার্থক্য থেকে অর্থ, অর্থ থেকে পার্থক্য নয়। এটা কোনো পাত্রাধার তৈল এবং তৈলাধার পাত্রের কূটতা নয়। একটা এসেনশিয়ালিজমকে মেনে নেওয়া এবং না নেওয়ার প্রশ্ন। সব গুলো সংস্কৃতিই বেঁচে থাকে তাদের চিহ্নগত উপস্থাপনা বা সিম্বলিক রিপ্রেজেন্টেশনের পার্থক্যের কাঠামোর ভিতর। এই ডিফারেন্স বা পার্থক্য তাই দুটো সাংস্কৃতিক ভূমির মধ্যেকার বিনিময়। তাহলে তার অর্থ রূপ পেয়ে ওঠার জন্যে প্রয়োজন পড়বে একটা তৃতীয় ভূমি। এই ভাবেই আমরা ভাভার তৃতীয় ভূমি বা থার্ড স্পেসে পৌঁছই।

আগের সেকশনে আমরা বলেছিলাম, সাংস্কৃতিক পার্থক্য আর সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের লড়াইটা আসলে দুটো সময়ধারণার মধ্যে একটা লড়াই। এখানে একটা ছেদ বা স্প্লিট কাজ করছে। দুটো সময়ধারণার মধ্যে এই ছেদ বা স্প্লিট-টা সাংস্কৃতিক জ্ঞানের পিছনে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার পরম্পরা এবং বিবর্তনের যুক্তিশৃঙ্খলকে, দি লজিক অফ সিনক্রনিসিটি অ্যান্ড ইভলিউশন-কে, ভেঙে দেয়। তাই আক্রমণ করে সেখানের সমগ্রবাদী সাংস্কৃতিক সঙ্কেতের ক্রমবর্দ্ধমান মহাবিশ্বকে। আবহমান পশ্চিমী সাংস্কৃতিক পুঁথিগুলো যেভাবে ভেবে এসেছে এতদিন। সেখানে সবকিছুই একটা ল্যাবরেটরির শৃঙ্খলায় সাজানো। তুমি একটু কালাহারি জেনে এলে, এখনকার? বাঃ, চমৎকার, ভাই ওটা আফ্রিকার কে-তম ফাইলে রাখো, ওপরে ট্যাগ লাগিয়েছো — এই বছরের? গুড। তুমি কী এনেছো? ভারতের বৈষ্ণব সাহিত্য? উনবিংশ শতাব্দী, বাঃ, এটার ট্যাগ হবে এশিয়া বাই ইন্ডিয়া বাই উনিশ বাই ভি। দেখোতো, সারা বিশ্বের সমস্ত সংস্কৃতির সমগ্রটা

এখানে আছে, কী চমৎকার, মোট ছাপ্পান্ন লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার আটশো উনত্রিশটা ফাইলে। ফাইল কটা পড়ে ফেলো — মোট বিশ্বের মোট সংস্কৃতি তাদের পার্থক্য তাদের উদ্দেশ্য তাদের বিধেয় তাদের রক্তমাংস তাদের চশমা তাদের প্যান্টালুন মায় তাদের হাই অব্দি তুমি জেনে যাবে। এবং তার চেয়েও বড় কথা মানবসভ্যতার একদম শুরুর দিন থেকে আজ পর্যন্ত তারা কী ভাবে বদলাচ্ছে। তার মানে, এককথায়, সমগ্র বিশ্ব সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তনের চালচিত্র।

ভাভা বললেন, যে কোনো সাংস্কৃতিক বিবৃতিই উদ্ভূত হয় একটা দ্বর্থপ্রবণ এবং পরস্পরবিরোধী, কন্ট্রাডিক্টরি অ্যান্ড অ্যাম্বিভ্যালেন্ট, উচ্চারণ থেকে — যেখান থেকে গজিয়ে ওঠে তৃতীয় ভূমি। (এখানে নারায়ণ সান্যালের বিশ্বাসঘাতকের একটা উদাহরণ দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না। ফিজিক্সের জগতটা হল সঠিক প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জগত। সেখানে এমনকি ভুলের সম্ভাবনা থাকলে সেই সম্ভাবনাটাও অঙ্ক কষে দেওয়া হয়। ধরুন পাঁচ শতাংশ ভুল বা দশ শতাংশ ভুল। এবার সাংস্কৃতিক বিবৃতিগুলো পরস্পরবিরোধী মানে ধরুন পরস্পরবিরোধিতার মাত্রা নববই শতাংশ। মানে সম্ভাব্য সঠিকতা দশ শতাংশ। তার মধ্যেও আবার অ্যাম্বিভ্যালেন্স। ধরুন, আপনি আপনার বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান করবেন, ক্যাটারার ডাকলেন। বললেন দেখো বাপু একশো লোক খাবে। আমার তথ্যটা একটু কন্ট্রাডিক্টরি তবে দশ শতাংশ ঠিক এবং একটু অ্যাম্বিভ্যালেন্ট। মানে, লোকের সংখ্যা দশও হতে পারে, আবার একশো নববইও হতে পারে। আর তারা বিশুদ্ধ নিরামিষাশী হতে পারে, বা বিশুদ্ধ আমিষাশীও হতে পারে। তুমি শুধু দেখো বাবা যাতে খাবার ফেলা না যায় বা লোক না খেয়ে ফেরতও না যায়।) এই তৃতীয় ভূমি কিন্তু নিজে নিজেকে উপস্থাপনা করতে পারে না। তার আধারে বেঁচে থাকে উচ্চারণের সেই আলোচনাগত শর্তগুলো যে সাংস্কৃতিক অর্থ এবং চিহ্নগুলোর কোনো আদি এবং প্রদত্ত নিশ্চয়তা নেই, কোনো সনাতন ঐক্য নেই। তৃতীয় ভূমি সেই 'মাঝামাঝি...' বা 'আন্তঃ...', মানে সবসময়েই যা একাধিক অর্থ বা আধারের মাঝখানে ঝোঝুল্যমান। ট্রান্সলেশনের সেই উদ্যত কাটারি যা যে কোনো অর্থকে নিয়ত কুপিয়ে দিচ্ছে, কেটে কুচো করে দিচ্ছে, অন্যটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, সাড়ে বত্রিশ ভাজা বানিয়ে দিচ্ছে। এপার গঙ্গা আর ওপার গঙ্গার মধ্যিখানে সেই চর যা মহেশ্বর শিব সদাগরের ভার বহন করছে, মানে সাংস্কৃতিক অর্থের ভারের পাহাড়। এই হল ভাভার পোস্টকলোনিয়াল থার্ড স্পেস। তার একটা সারসংক্ষেপ।

এবার প্রশ্ন হল এইটাই যে কী এমন বিশেষত্ব এই পোস্টকলোনিয়ালিটির যে ভাভা তার এই জাদুকরী তৃতীয় ভূমির গৌরব শুধু উত্তরঔপনিবেশিককেই দিলেন? তিনি যা যা উত্তরঔপনিবেশিকের বিশিষ্ট চিহ্ন বললেন তা সবই কি ঔপনিবেশিকেও ছিল না? একই ভূমির মধ্যে অন্য ভূমির, অন্য অনেক ভূমির, সমস্ত ভূমির উপস্থিতি? যার অন্য নাম বোরহেসের আলেফ, তা কি ঔপনিবেশিকে ছিলনা? ছিল, ভাভা দেখতে পাননি।

## ১৩।। বোরহেসের আলেফ

জর্গ লুই বোরহেসের 'দি আলেফ' গল্পটায় ছিল একটা সিন্ধুদর্শনের বিন্দুর কাহিনী। সেই বিন্দুটার নাম আলেফ। অজিত চৌধুরী এই আলেফ গল্পটাকে ডিকন্সট্রাক্ট করেছিলেন বাংলায়, রাক্ষস পত্রিকায়, 'অউম' নামে। সেখান থেকে একটু দীর্ঘ একটা অংশ তুলে দিচ্ছি। মূলতঃ পড়ার মজার জন্যে।

> "আজ আলেফের শেষ দিন। তুমি একবার ওকে দেখতে যাবে? এই ডাইনিং রুমের ঠিক নিচে, বেসমেন্টে", সে আরো বলেছিল।
>
> "কিন্তু ওখানে তো ঘুটঘুটে অন্ধকার", আমি বলি।
>
> "অন্ধকার"। এইবার বিনয় বার্স্ট করে, "যেখানে সমস্ত তারারা থাকে সেই আলেফ অন্ধকার! মূর্খ, মূর্খ তুমি", সে বলে। "এক থেকে উনিশটি ধাপ গুনে দেওয়ালের দিকে তাকাবে — আলেফ দেখতে পাবে", সে আরো বলেছিল।
>
> নিশ্ছিদ্র সেই অন্ধকারে, আমি, মানব, প্রথম ভয় পেয়েছিলাম যেন কেউ আমাকে মহাকাশযান থেকে ছুঁড়ে দিয়েছে মহাশূন্যে। আমি আমার শৈশব দেখি। আমি স্থির নিশ্চিত হই যে বিনয় পাগল এবং আমাকে

খুন করতে উদ্যত। মৃত্যু : একবার পিছন ফিরি এবং ফেরার পথ নেই জেনে সামনে — এক দুই তিন করে উনিশটি সিঁড়ি গুনি যা দেওয়ালটির শরীর বেয়ে সর্পিণীর মত উঠে গেছে এবং

আমি দেখলাম যুদ্ধফেরত সৈনিকেরা পায়রার ঠোঁটে গুঁজে দিচ্ছে পিকচার পোস্টকার্ড

আমি দেখলাম নীল ঘন, নীল সমুদ্র, মহিমান্বিত সূর্যোদয় এবং দিবাবসান

আমি দেখলাম এক শরীর্ময়ী নারী, নিবিড় নিতম্বিনী, দীর্ঘকায়া সেই নারীর সোনালী চুল উড়ছে বাতাসে, ঈষৎ অবনতমুখী সে, তার ব্রেস্ট ক্যান্সার

আমি একটা সুড়ঙ্গপথ দেখলাম এবং বুঝলাম : লন্ডন

আমি দেখলাম একটা চিল এক চড়ুইপাখির বাচ্চার দিকে ধেয়ে যাচ্ছে, চড়ুইপাখির মা-আ-আ—

আমি দেখলাম নেকড়ে বাঘ, বাইসন, জলোচ্ছ্বাস এবং মিলিটারিদের জিপ

আমি দেখলাম তুষারমানবীরা রোদ্দুরে মেলে দিয়েছে তাদের পিঠ, বুক, সরু সরু পা গুলো

আমি স্পষ্ট দেখলাম একটা ডাইনি হাড় চিবুচ্ছে, তার ঠোঁটে, গালে, হাতের পাতায় ছোপ ছোপ রক্ত

আমি মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ছাপা হতে দেখলাম

আমি দেখলাম একটা প্রজাপতি এসে বসল এক কিশোরীর চুলের ওপর আর তার সখীরা সমবেত হেসে উঠল কলরব করে

আমি দেখলাম মহিমান্বিত শহীদমিনার, ফোর্ট উইলিয়াম এবং অশ্বারোহী পুলিশদের

আমি দেখলাম আমার শয্যা যা নিঃসঙ্গ

আমি বিনয়ের টেবিলের ড্রয়ারে চান্দ্রেয়ীর লেখা চিঠিগুলো পড়তে পারলাম : অব্‌সিন

আমি দেখলাম দিগ্বিদিক আকাশ, নক্ষত্ররাজি এবং চাঁদের অন্যপিঠ

আমি হিমালয়ের বুকে এক সন্ন্যাসীকে দেখলাম তপস্যারত

আমি দেখলাম সাহারা মরুভূমি কেমন করে নদীর মত সমুদ্রে মেশে

আমি একই সঙ্গে তামাক, বারুদ এবং ফুলের গন্ধ পেলাম এবং বুঝলাম : ল্যাটিন আমেরিকা

আমি আমার মুখ দেখলাম

আমি দেখলাম সন্ধ্যার শাঁখ বাজছে আর এক পিম্প একটি বেশ্যাকে চুমু খেল

আমি দেখলাম শেষহীন অসংখ্য দর্পণ যারা কেউ আমাকে প্রতিবিম্বিত করে না

আমি দেখলাম পুষ্করিণীতে একটি উড়ন্ত চিল এবং গাছেদের প্রতিচ্ছবি এবং কয়েকটি মাছ

আমি দেখলাম অসংখ্য নালী উপনালীর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত আমার অন্ধকার রক্ত

আমি দেখলাম সমাধি থেকে ফুল এবং ডেডবডি পাচার করছে একদল চোর

আমি দেখলাম এস্কিমো শিশুরা একে অপরকে তুষার ছুঁড়ে মারছে, ছুটছে, খেলছে, হাসছে

আমি দেখলাম প্রতিটি মরুভূমির তলদেশে আছে তরল সোনা : তেল  আমি তোমার তলপেট দেখলাম, নারী

আমি ন্যাশনাল লাইব্রেরির বইগুলির হলুদ পাতাগুলো, পাতাগুলির প্রতিটি শব্দ এবং কয়েকটি ভাঙা শব্দর টুকরো দেখতে পেলাম

আমি দেখলাম একজন যুবক তার নারীটিকে বাসে তুলল, হাত নেড়ে বিদায় জানাল এবং তারপর উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে হিসি করতে থাকল

আমি হোয়াইট হাউসের ভিতরটা দেখলাম

আমি দেখলাম সমবেত মানুষেরা আমার দিকে তাকিয়ে আছে যেন আমি এক দর্পণ — একজন যুবক আমার দিকে তাকিয়ে তার চুলটা ঠিক করে নিল

আমি দেখলাম চন্দ্র পৃথিবীকে, পৃথিবী সূর্যকে এবং সূর্য যেন আর কাকে প্রদক্ষিণ করছে

আমি দেখলাম শুকনো মাটির উপর ধুলি উড়িয়ে এক অশ্বারোহী আসছে চিঠি হাতে

আমি আমার হলুদ দাঁত, অন্ত্রনাড়ী এবং হৃদয় দেখলাম

আমি তোমার মুখ দেখলাম।

তারপর আলো এসে পড়ল আমার মুখে — বেসমেন্টের দরজা খুলে গেছে এবং স্মিতহাস্য বিনয় তার প্রিয় অভিভাবকের মত দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ফ্ল্যাশলাইট হাতে।

"দেখলে তো — আলেফ আছে", সে বলেছিল।

আলেফ ওই বেসমেন্টে অপেক্ষা করে আছে। সিঁড়ির তলায়, সেই অপরিচিত অনালোকিত অমনোযোগিত অন্দরে। তুমি তাকে প্রত্যক্ষ করতে পারো। আবার ভুলেও যেতে পারো অনায়াসে। তাতে আলেফের কিছু এসে যায় না। সে অপেক্ষা করে আছে কারুর আকস্মিক পতনের জন্যে, হঠাৎ, সিঁড়ি থেকে পা পিছলে, একটুও জেনে নয়, সম্পূর্ণ অজান্তে, কাকতালীয় ভাবে, কেউ কখনো আবিষ্কার করে ফেলবে তাকে। আলেফকে। আলেফ — বিন্দুতে সিন্ধু, শুধু সিন্ধু কেন, মরুভূমি, মালভূমি, বেলাভূমি, লীলাভূমি, মনোভূমি — কী নেই আলেফে? নিছক একটা শূন্যর আধারে সে অসীম, অনন্ত। চোখের এক পলকে এক লহমায় সে নিরবধি কাল, সুদূরতম অতীত এবং অজ্ঞাততম ভবিষ্যত। এক অস্তি যার মধ্যে সব অস্তিত্ব। সেখানে রয়েছে সব মৃত্যু এবং সব প্রাণ, সমস্ত প্রাণী। রয়েছে সৌরমণ্ডলের এই তৃতীয় গ্রহের সকল এবং প্রতিটি প্রাণী — প্রাণীদের সেই প্রাচীন শ্রেণীবিভাগ তো আমাদের সকলেরই জানা : (১) যারা সরকারি চিড়িয়াখানার সম্পত্তি, (২) যাদের গায়ে মলম লাগানো হয়েছে, (৩) যারা ইতিমধ্যেই পোষ মেনেছে, (৪) মায়ের বাঁট চোষা শুয়োরের বাচ্চারা, (৫) জলপরী এবং স্যালামান্ডাররা, (৬) যারা দুর্দান্ত এবং রোমাঞ্চকর, (৭) জৈষ্ঠের চৌরঙ্গীর আওয়ারা কুত্তারা, (৮) এই শ্রেণীবিভাগে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জন্তু, (৯) যারা ক্ষেপে গেছে এবং চীৎকার করছে তারস্বরে, (১০) অগণন সংখ্যক, (১১) যাদের আঁকা হয়েছে সূক্ষ্ম উটের লোমের তুলি আর দামী রং দিয়ে, (১২) ইত্যাদি ইত্যাদি, (১৩) যারা জলের কলসীটা এইমাত্র ভেঙে ফেলল, (১৪) যাদের দূর থেকে দেখলে ঠিক একটা মাছির মত মনে হয়। (অদ্যাবধি পৃথিবীর প্রাণীদের সবচেয়ে রোমহর্ষক এই শ্রেণীবিভাগটা বোরহেসের পাকানো, তাঁর দি বুক অফ ইমাজিনারি বিইংস-এ, বোরহেস যেমন করতেন, কোনো এক প্রাচীন চৈনিক বিশ্বকোষের নামে চালিয়েছেন। ফুকো আবার তার অর্ডার অফ থিংস শুরু করেছিলেন এটা দিয়ে। তালিকার আট নম্বরটা সবচেয়ে ঘোড়েল। রাসেলের সেই প্যারাডক্স, একটা সেট নিজেই নিজের সভ্য কিনা।)

হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আলেফ। সে রয়েছে বেসমেন্টে, আমার তার এবং সখার, প্রত্যেকের বেসমেন্টে। তুমি জানো ইয়া না জানো, মানো ইয়া না মানো, আলেফ রয়েছেই। এখন আর কাউকে কালাপানি পেরিয়ে সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে কাস্টমস চেক পেরিয়ে তবে নিজের সময়-স্থান-সংস্থানের বাইরেটা জানতে হয় না। ওরকম কোনো সংস্থান আর নেই-ই মোটে। মনুর বাচ্চাকাচ্চারা আভ্যন্তরীন ভাবেই অভিবাসী হয়ে গেছে, ইমিগ্রান্ট, পরবাসী। সবাই-ই তো আজ পরবাসী। ঘরবাসী আর কেউ নেই-ই মোটে, এই পৃথিবীর মাটিতে জলে হাওয়ায়। একটি সময়-স্থান-সংস্থান বা স্পেস-টাইম-কন্টিনুয়াম মানে একসাথে সমস্ত স্পেস-টাইম-কন্টিনুয়াম। সময় আর স্থানের সংস্থানটাই তো বিশ্বায়িত গ্লোবালাইজড হয়ে গেছে। পথের পাশে হাটুরে দোকানের তাকে রাখা জিনিষ — সেও তো বাঁচে বাজারে, আর বাজার তো এখন একটাই, বিশ্ববাজার। বিশ্ববাজারের সুপারমার্কেটে অগণন সংখ্যক তাকে পরপর রাখা আছে প্রতিটি প্রত্যেকটি বস্তু। যা যা আছে এবং যা যা নেই, যা যা অতীত, মানে চলে গেছে, পরিত্যক্ত, এবং যা যা স্বপ্ন মানে অনাগত, তাদের সবাইকেই পরপর রাখা আছে তাকে। আপনি গাঁজা খাবেন? আছে। গাঁজা ছাড়ার ওষুধ বা নেশাগ্রস্থদের রিহ্যাবিলিটেশন? হ্যাঁ, তাও পাবেন? আপনি সেইসব তত্ত্ব পড়তে চান যারা বলে গাঁজা খাওয়া বা ছাড়া কিছুতেই কিছু হয় না? হ্যাঁ, তাও পাবেন, সব আছে, পরপর অনন্ত তাকের এই সুপারমার্কেটে। পরপর অত ঘুরে ঘুরে খুঁজবেন কী করে, তার চেয়ে এখানটায় বসুন, এই কনসোলে দেখুন, কী সুন্দর ব্যবস্থা, যা খুঁজছেন সেটা টাইপ করে দিন, এই সার্চ ফিল্ডটায়, সেই বস্তুটার নাম, বা তার কোনো বিশেষত্ব। এবার এন্টার মারুন। বা ক্লিক করুন এই সার্চ লেখা সুইচ। সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠবে তার নাম ধাম দাম। আজ সব প্রতিটি কিছু এক একটা চিহ্ন এক একটা লেবেল এক একটা মার্কা।

কিন্তু ভাভা এটা বোঝেনি, এই আলেফকে, যেখানে কলোনি আছে, পোস্টও আছে, মিমিক্রি আছে, হাইব্রিড আছে, হ্যাঁ আছে, না আছে, এই বিষয়ে লেখা প্রবন্ধটা আছে, প্রবন্ধটায় যা যা নেই তাও আছে। তাই ভাভারা বড্ড বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছেন পোস্টকলোনিকে। তারা গোলমেলে নড়বড়ে অস্থির বর্গগুলোকে খুঁজে পেয়েছেন শুধু পোস্টকলোনিয়ালে। আসলে তারা উপনিবেশেই ছিল। যথেষ্ট নড়বড়ে, গোলমেলে,

এলোমেলো। কন্ট্রাডিক্টরি এবং অ্যাম্বিভ্যালেন্ট। দ্বন্দ্বময় এবং দ্বর্থপ্রবণ। আমরা এবার খুঁজতে যাব সেই কলোনিয়াল আলেফ।

## ১৪।। ঔপনিবেশিক-ও যখন গোলমেলে

অভিবাসীকে ইমিগ্রান্টকে ভাভা যেরকম পাখির চোখের মণি মাত্র দেখতে পাওয়া অর্জুনের মত কখনো দৃষ্টিচ্যুত করছেন না, মূল মনোযোগের বিন্দু থেকে নড়তে দিচ্ছেন না, সেটা আমাদের কাছে অনাবশ্যক বাহুল্য বলে বোধ হচ্ছে। এর মানে পোস্টকলোনিয়ালকে একটু ভুল ভাবে বোঝা। এই ভুল বোঝাটাকে খুব স্পষ্ট চেনা যায় ভাভার 'মিমিক্রি অ্যান্ড ম্যান' প্রবন্ধে। এই লেখায় 'মেটোনিমি' খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নিয়ে আছে। আমরাও আমাদের এই সংক্রান্ত আলোচনাকে বুঝব ওই মেটোনিমি দিয়েই।

আর একবার মনে পড়িয়ে নেওয়া যাক, মেটোনিমি মানে হল, যখন একটা চিহ্নকে আমরা আর একটা চিহ্ন দিয়ে প্রতিস্থাপিত করছি। এই প্রতিস্থাপক চিহ্নটা মূল চিহ্নের খুব ঘনিষ্ঠ কিন্তু সচরাচর খর্বীকৃত একটা চিহ্ন। যেমন রাজা নামক শব্দ/ধারণার জায়গায় রাজদণ্ড, ইত্যাদি। (এই লেখার পাঁচ নম্বর সেকশন)। রাজা আর রাজদণ্ডের সম্পর্কটাকে আমরা ডাকতে পারি 'একই কিন্তু পুরোপুরি না', 'সেম বাট নট কোয়াইট'। রাজদণ্ড রাজার সমান, কিন্তু পুরোপুরি নয়। একটু কমা রাজা। রাজদণ্ডে রাজার উপস্থিতি একটু পার্শ্বীয়, খর্বীকৃত। আমাদের কাছে মেটোনিমি মানেই এই পার্শ্বীয় উপস্থিতি।

ভাভা কলোনিয়াল সংস্কৃতির মধ্যে কলোনাইজারের সেই পার্শ্বীয় উপস্থিতিকে ধরতে চেয়েছিলেন যা সবসময়েই সাহেবের সঙ্গে হুবহু এক হয়ে উঠতে চায়, আর মজার কেলোটা এইখানেই যে, ওই চাওয়াতেই আরো না-সাহেব হয়ে যায়, আরো কম এক হয়ে যায়, কারণ কোনো সাহেবকে তো কখনোই সাহেব হওয়ার চেষ্টা করতে হয় না। কলোনাইজারের মানে সাহেবের যে সংস্কৃতি — তার চিহ্নমালা, তার সঙ্কেতকাঠামো, সেই সঙ্কেত পাঠের উপায়, মানে এককথায় সেই সংস্কৃতিভূমি থেকে ছড়ানো যে সিগনাল — তারা সবসময়েই বসবাস করছে কলোনাইজড মানে নেটিভ প্রজার সংস্কৃতিতে। তার বাচনে, বাগধারায়, ব্যাকরণে, প্যারাডাইমে। কিন্তু এই উপস্থিতি তো পার্শ্বীয়, পারশিয়াল — তার পূর্ণ উপস্থিতি হয়ে ওঠার বাসনায়, তার নকলে, তার মুখ ভ্যাংচানোয় — তাই এই উপস্থিতি মিমিক উপস্থিতি। ভাভা এই মিমিক উপস্থিতি গজিয়ে ওঠার প্রক্রিয়াকেই ডাকলেন 'মিমিক্রি' বলে।

কলোনিয়াল ক্ষমতা ও জ্ঞানের কায়েমী থাকার একটা প্রকরণ হিশেবে, উপায় হিশেবে মিমিক্রিকে ভেবেছেন ভাভা। যে পদ্ধতিতে ঔপনিবেশিক ক্ষমতা তার এক সুসংস্কৃত অপরকে, তার রিফর্মড আদারকে গড়ে তোলে। এমন এক আদার যাকে সে চিনে নিতে পারে, যার সঙ্গে সে আলাপ পরিচয়ে আসতে পারে। কথা বলতে পারে, গপ্পগাছা করতে পারে, তার গপ্প যে আদার বুঝতে পারবে, তার উপন্যাস যে পড়তে, কিনতে পারবে। এমন আর এক বিষয়ী সংস্থান, সাবজেক্ট পজিশন, যা কলোনিয়াল ক্ষমতার নিজের থেকে পৃথক, কিন্তু খুব কাছাকাছি। প্রায় সমান, কিন্তু পুরোপুরি নয়।

খেয়াল করুন, মিমিক্রির মধ্যেই কিন্তু একটা গঠনগত অনিশ্চয়তা আছে। একটা পার্থক্য যা নিজেই নিজেকে হত্যা করতে চায়। মিমিক্রি সেই প্রক্রিয়া যা পার্থক্যকে অপনোদন করতে চায়, আর তাই, একটা নিবিড়তর পার্থক্য গড়ে তোলে। ক্ষমতার দ্বারা তার নিজের অপরকে খেয়ে ফেলার, আত্তীকরণ করার মাধ্যম হিশেবে পার্শ্বীয় উপস্থিতির একটা জটিল কৌশল। ঔপনিবেশিক ক্ষমতা তার নিজের ভৌগোলিক বলয়ের চারপাশে একের পর এক উপনিবেশ গড়ে তুলতে থাকে, আর নিজের সংস্কৃতির চারপাশে টেনে আনতে থাকে তার ঔপনিবেশিক অপর মানে উপনিবেশের সাংস্কৃতিক ভূমিগুলোকে। তাদের সংস্কৃতিকে তার নিজেরই সংস্কৃতিরই উপনিবেশ করে তোলার একটা যন্তর মিমিক্রির এই পার্শ্বীয় উপস্থিতি।

মিশনারি শিক্ষা, এবং তার মাধ্যমে, একের পর এক রাজনৈতিক এবং নৈতিক সংস্কার, পলিটিকাল এবং মরাল রিফর্ম। ইংরিজি তথা পাশ্চাত্য বিদ্যা এবং বিদ্যালয় এবং বিদ্যাচর্চার মধ্যে দিয়ে একটা ক্রমবহমান এবং চলমান প্রক্রিয়া। অ্যাসেম্বলি লাইনের একদম পয়লা গর্তে কাঁচামাল ফেলা হয়েছিল, কলোনির কচি মন, একদম কাঁচা, পশ্চিমের কোনো ছাপ যাতে নেই। বিদ্যাচর্চার অনুশীলনের শেষে ফিনিশড গুড যা বেরোলো

তা হল পশ্চিমের ছাঁচে ঢালাই হওয়া রিফর্মড অনুশীলিত পরিশীলিত কলোনিয়াল — মানে, একটা নকল মানুষ, মিমিক ম্যান। এই পরিশীলন বা রিফর্মের পদ্ধতিটা কিন্তু সবকিছুকেই এবার গোলমেলে করে দিল। ওই পরিশীলিত কলোনিয়াল মিমিক ম্যানের কাছে সবকিছুই বেশ ঘোলাটে হয়ে গেছে। তার জাতিগত এবং সাংস্কৃতিক পরিচিতি, তার গুরুত্বের ধারণা, মানে, কোনটা তার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সাহেব হওয়া না নেটিভ হওয়া, কোন পরিচিতিটা তার আসল পরিচিতি? সাহেব তার মুন্ডুটা ফুটোস্কোপে দেখে ফেলার পর, মুন্ডুর ভিতরটা পড়ে ফেলার পর, মুন্ডুর ভিতরটা বদলে দেওয়ার পর তার এবার মনে হল, আমি তবে কেউ নই? এবার সে কী করবে? যদি সে গরু হত জাবর কাটত, কুকুর হলে চেঁচাত এবং লেজ নাড়ত, এমনকী ভ্রমর হলে অব্দি ঘরের ভিতর গুনগুনিয়ে চলে আসতে পারত। কিন্তু সে তো কেউ নয়, কিছুই তার করার নেই। মিমিক ম্যান হয়ে দাঁড়াল অক্রিয় মানুষ — নন-অ্যাকশনাল ম্যান। টোটাল রিকল-এর বজ্রাহত শোয়ার্জনেগারের মত, যখন সে জানল, এমনকী তার নিজের স্মৃতিটাও তার নিজের না, সেটাও নির্মিত, একটা মাইক্রোচিপে করে তার মাথার ভিতরে বসানো। নিজের বৌকে আদর করতে গিয়েও সে পারছে না, তার মনে পড়ছে, এ তার বৌ নয়, যে ছবি তার মনে পড়ছে এর সঙ্গে সঙ্গমের তা আসলে বানানো, তার মাথায় বসানো।

কলোনির এই মিমিক ম্যানের কাছে এখন গৌরবের হল সাহেব হয়ে ওঠা, যা সে চায়, আর সেই জন্যেই সে সাহেব হতে পারে না। এটাকেই ভাভা ডেকেছেন 'ডাবল-ভিশন' বলে। এই দ্বিধা-দৃষ্টিই ঔপনিবেশিক মানুষের আভ্যন্তরীন ঘাপলা। যা একইসঙ্গে দুইদিকে তাকাতে চায়, তাই কোনোদিকেই তাকিয়ে উঠতে পারে না। কলোনিয়াল ইতিহাসের, বিদ্যাচর্চার, আলোচনার, ডিসকোর্সের গঠনগত দ্বর্থপ্রবণতা, পরস্পরবিরোধিতা। অ্যাম্বিভ্যালেন্স, কন্ট্রাডিক্টরিনেস। ক্ষমতা যখন তার অপরের আধারে নিজেকে পুনর্নির্মাণ করতে চায়, গড়ে ওঠে আর একটা উপস্থিতি, পূর্ণ নয় পার্শ্বীয়। ক্ষমতার কেন্দ্রিকতা এখানে ব্যাহত বিঘ্নিত হয় পার্শ্বীয় উপস্থাপনায়, উপস্থিতির মেটোনিমে।

গ্রান্ট কল্পিত সেই আংশিক নকলনবিশ ঔপনিবেশিক মানুষ, মেকলের পরিকল্পিত অনুবাদক, বা নইপল চিত্রিত কলোনিয়াল রাজনীতিবিদ — এরা সবাই প্রত্যেকেই একটা কলোনিয়াল শাসনের অংশ। এক একটা নাটবল্টু। এরা সবাই এবং এদের মত আরো অনেকে মিলে ঔপনিবেশিক ক্ষমতার সেই অপর বা আদারনেস। তাই এরা প্রত্যেকেই সেই ঔপনিবাসিক বাসনার মেটোনিমির-ও অংশ। যার কথা আমরা এইমাত্রই বললাম। সেই সাহেব হওয়ার বাসনা যা তার নিজেরই আত্মহননকে বহন করে নিজের জঠরে। এই বাসনা নিজেরই পুনরাবৃত্তির মধ্যে দিয়ে, বারবার নানা ভাবে সাহেব হওয়ার চেষ্টায়, মিমিক্রির একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে, যাবতীয় সাংস্কৃতিক জাতিগত এবং ঐতিহাসিক পার্থক্যকে আরো স্পষ্ট এবং প্রতীয়মান করে তোলে। যে পার্থক্যকে নাকচ করতেই সে চেয়েছিল। এবং এই পার্থক্যগুলো কিন্তু নিষ্ক্রিয় নয়। তারা কলোনিয়াল ক্ষমতার আত্মরতিপরায়ণ চাহিদার সামনে প্রত্যাখ্যান ডেকে নিয়ে আসে। কলোনিয়াল ক্ষমতা চেয়েছিল নিজেরই ছকে গড়ে তুলতে তার অপরকে। সেই প্রক্রিয়ার কাছে এই পার্থক্যগুলো অত্যন্ত বিপজ্জনক — মূর্ত করে তোলে কলোনিয়াল ক্ষমতার অক্ষমতাকেই। কিছুটা আটকেও দেয় ঔপনিবেশিক আত্তীকরণের প্রক্রিয়াকে, মানে সাহেব অজগরের নেটিভ গেলার গতিটাকে।

এবং এই পার্থক্যেরা মিলে গড়ে তোলে কলোনাইজার প্রভুর, সাহেবের উপস্থিতির উপর একটা আংশিক প্রহরা, একধরনের মাইল্ড একটা স্পিডব্রেকার গড়ে দেয় তার এমনিতে ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদলশোভিত রাস্তায়। আমাদের ছোটবেলায় আমরা স্পিডব্রেকারকে ডাকতাম বাম্প। তা সেই বাম্পে বাম্পে বাম্প খেতে খেতে সাহেব সংস্কৃতির ইঞ্জিনকে মাঝেমাঝেই দম নিতে হয়। সেই ফুরসতে একটু একটু মুখ বাড়ানোর মওকা পায় কিছু প্রান্তিক উপাদান, যারা অস্তিত্বের মূল গতির, মানে কলোনাইজার প্রভুর আর তার নেটিভ মিমিক ম্যানের জীবন-ব্যাকরণের ধার ঘেঁষে, মার্জিনে, কোনোক্রমে তাদের জান টিকিয়ে রাখছিল। সকল সাহেবতার মধ্যে সেই সব একাকী মুহূর্তগুলো আসে যখন তার প্রার্থনার সকল সময় শূন্য মনে হয়, রূপার ডিবের মত চাঁদের বিখ্যাত মুখ দেখতে দেখতে তার করতলে বিশুদ্ধ আমলকি পাওয়ার সাধ যায়। কিন্তু এতে ঘটে যায় আর একটা সমূহ কেলেঙ্কারি। মাঝখান থেকে ঔপনিবেশিক মানুষের বিষয়ী অবস্থান বা সাবজেক্ট পজিশনটাই যায়

ফেটে। তার মননের চিন্তনের অনুভূতি সামগ্রিক ঐক্যটাই চটকে যায়। এবার সে হেঁটে বেড়ায় তার ফাটা সার্বভৌমতায়, ফাটা মননের ব্রোকেন মানুষেরা ইন দিস ব্রোকেন ওয়ার্ল্ড — হোয়ার এভরিথিং ইজ ব্রোকেন — যে কোনো গলাতে গাইলে হবে না, বয়স্ক ববের ফাটা গলাতেই গাইতে হবে।

ভাভা এই ঔপনিবেশিক মিমিক্রিকে ফ্যান্টাসির বা দিবাস্বপ্নের সঙ্গে মেলাতে চেয়েছিলেন। খণ্ড বা মিশ্র উৎস থেকে আসা ঔপনিবেশিক ব্যক্তি মানুষের ফ্যান্টাসির — সেই ফ্যান্টাসিও তো তার নির্মাণে এইরকমই খণ্ড এবং পার্শ্বীয়। তারা সাদামানুষোপম হতে চায়, তার থেকেই আরো বেশি করে ফুটে বেরোয় তাদের বিশিষ্ট প্রকৃতি, স্ট্রাইকিং ফিচার, তাদের জন্মের কালো ইতিহাস, কালো মানুষীর গর্ভের ইতিহাস, তার কালো উৎস। কারণ, একমাত্র কালো মানুষীর বাচ্চা কালো মানুষই সাদা সাহেব হতে চায়, হতে চেয়ে চেষ্টা করে, নকল করে। তাই, এই সাদামানুষোপম অসাদাতর মানুষেরা সাদা মানুষের বানানো সমাজ ও ইতিহাসে সেই সম্মাণ পায় না, যা তারা বিশুদ্ধ সাদা হলে পেত। বিশুদ্ধ হলে এবং সাদা হলে পেত।

ভাভা এই নকল করার বাসনা বা মিমিক্রিকেই সেই বিশিষ্ট প্রকৃতি, বা স্ট্রাইকিং ফিচার ভেবেছেন যা নিজের উপর নিজেই নিষেধাজ্ঞা জারি করে। সাদা হওয়ার বাসনাই কালো মানুষের সেই বিশিষ্ট প্রকৃতি যা তাকে কালোতর করে। ভাভা মিমিক্রিকে একটা মোচন বা ক্যাথারসিস বলে ভাবছেন। ঔপনিবেশিক ক্ষমতার নিচে শাসিত একটা কলোনিয়াল সংস্কৃতিতে ভীষণ ঘোলাটে এবং অস্পষ্ট হয়ে আসা অর্থনির্মাণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত এই মোচন বা ক্যাথারসিস। আমরা আগেই বলেছি কলোনিয়াল সাংস্কৃতিক ভূমিতে ফেটে যাওয়া ঘোলাটে হয়ে পড়া সাবজেক্ট পজিশনের কথা। সেখানে অর্থ নির্মাণের প্রক্রিয়ায় দুটো গতি কাজ করে। কলোনাইজার প্রভুর সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান এবং সিগনাল এখানে হাজির থাকে তাদের মেটোনিমে এবং মেটাফরে। তাদের মিলিত উপস্থিতি পুরো ব্যাপারটাকে আরো জটিল করে দেয়।

সেই জটিল পরিস্থিতিতে নিজের বাসনা এবং বাসনা না মেটার বেদনা মোচনের জন্যে কলোনিয়াল সাবজেক্টের দরকার পড়ে ওই মিমিক্রির। সে দেখে সবকিছুই নিয়ে যায় সাহেব, তাই সে সাহেব হতে চায়, সাহেবের মত ক্ষমতাবান, সে নকল করে, তাই সে আরো অসাহেব হয়, আরো নেটিভ। আর তার মধ্যে উপস্থিত প্রান্তিক সব নেটিভ উপাদান এবং মানুষ হিশেবে তার আত্মাভিমান যা তার সাহেব-নকলের প্রক্রিয়ায় কিছুতেই বাস্তবায়িত হতে পারল না, বরং নিরুদ্ধ হল, তারা সব মিলে তার মধ্যে তৈরি করে টানাপোড়েন। সেই টানাপোড়েনের সঙ্গে নিজের প্রাত্যহিক বাস্তবতার ভারসাম্যে আসতে হলে তাকে ওই মোচন করতেই হয়, তার চারপাশে পুরো বাস্তবতা জুড়েই তো বসবাস করছে শাসক ক্ষমতার মেটাফর এবং মেটোনিমরা।

লাকাঁর 'কামুফ্লাজ' বা 'আত্মগোপন' ধারণার সঙ্গে একটা তুলনা টেনে, ভাভা মিমিক্রিকে মনে করছেন একটা পদ্ধতি যা 'তাল মেলানো' বা 'হারমোনাইজেশন' নয়, বরং 'একটা সাদৃশ্য যা উপস্থিতি নয়'। সাহেবের সঙ্গে নেটিভ পাতিসাহেবের একটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু, সেই সাদৃশ্যের যে ভিত্তি, মানে সাহেব অস্তিত্ব, যাকে নকল করে নেটিভ, সেই সাহেব অস্তিত্বের কোনো উপস্থিতি ওই সাদৃশ্যের মধ্যে নেই। কারণ, এই সাদৃশ্যের মধ্যে একটা ভয় লুকিয়ে আছে। ওই ভয়কে ঘিরেই তৈরি হয়েছে সাদৃশ্য। সাহেবকে ভয় পেতে হয়, সাহেব ক্ষমতাবান, আমি যদি সাহেব হতে পারি আমিও ক্ষমতাবান হব, আমিও তাই সাহেবকে নকল করছি, কিন্তু আমি তো আসলে সাহেব নই, তাই আমি তো সাহেবকে ভয় পাবই।

মিমিক্রি হল সাদা উপস্থিতি আর তার কালো সাদৃশ্যের ভিতর একটা সাক্ষাৎকার। এই সাক্ষাৎকারকে ঘিরে হাজির হয় মিমিক্রির দ্বর্থপ্রবণতা, অ্যাম্বিভ্যালেন্স। ঔপনিবেশিক শাসনের আত্মরতিপরায়ণ প্রভুত্ব, নারসিসিস্টিক অথরিটি এবার এই মিমিক্রি থেকে চুঁইয়ে আসা পার্থক্যে এবং বাসনায়, এই অ্যাম্বিভ্যালেন্সে, ব্যাহত হতে থাকে। 'জাতিগত, সংস্কৃতিগত এবং ইতিহাসগত' গুরুত্বপ্রদানের, প্রায়রিটির একটা জ্ঞান তথা আলোচনা কাজ করে চলে পশ্চিমের ডিসকোর্সের ভিতরে। পশ্চিমের সাদা মানুষের জাতি, লেখা, ইতিহাস সেখানে প্রাথমিক, প্রায়র। অন্য ডিসকোর্সগুলো, অন্য জাতি, লেখা, এবং ইতিহাসের অবস্থানগুলো তার পরের। সেই প্রায়রিটি বা প্রাথমিকতাকে নিয়ে আসে মিমিক্রি, তার কামুফ্লাজের তলায় তলায়। নকল করার ক্রিয়াটা দেখে মনে হয়, নিতান্তই বাসনার, সাহেবের সদৃশ হওয়ার বাসনার ক্রিয়া। সাহেব হল সব বাসনার

আধার। সাহেবের সব আছে, নেটিভের নেই। চলো, সাহেব সাজি। বাসনার এই ক্রিয়ার ভিতরে ভিতরে রয়ে যায় এই জাতিগত, বিদ্যাগত, ইতিহাসগত প্রভুত্বের ক্রিয়া। অর্থাৎ, প্রেজেন্স বা উপস্থিতিকে তার অপরের তলে, তার আদারনেসে, আর একবার খুঁজে নেওয়া। উপস্থিতিকে পুনরুচ্চারণ করা। এই পার্শ্বীয় উপস্থিতির কথা তো আমরা আগেই বলেছি।

এইভাবে, ভাভা দেখালেন, গোটা ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সটাই ফেটে যায়, যেভাবে কলোনিয়াল প্রজার বিষয়ী সংস্থান বা সাবজেক্ট পজিশনটা ফেটে গিয়েছিল। দুটো সম্পূর্ণ আলাদা প্রবণতা তৈরি হয়ে যায় সেখানে। বাইরের বাস্তবতা, এক্সটারনাল রিয়ালিটিকে কী ভাবে দেখব এর দুটো আলাদা ধাঁচ। এক, একটা দৃষ্টিভঙ্গী যা বাইরের বাস্তবতাটাকে স্বীকার করে এবং মেনে নেয়। আমি সাহেব নই, নেটিভ, কী আর করব, সাহেবের প্রভুত্ব মেনে নিতে হবে বৈকি। আর, দুই, একটা দৃষ্টিভঙ্গী যা অস্বীকার করে বাইরের এই বাস্তবতাকে আর তার জায়গায় বসায় বাসনার একটা ক্রিয়াকে — একটা বদলি বাস্তবতা — যা মিমিক্রির আধারে পুনরাবৃত্তি করতে থাকে একটা বাসনাসম্মত বাস্তবতার। আমার ঘরে আমার চেয়ারে আমি নেটিভ আর বসে নেই, আছে এক সাহেব, সে প্যান্টালুন পরে, তার গালের পাশে থাকে ঝুলপি, সে কুলপি খায় না, আইসক্রিম খায়, এই তো উপস্থিত আছে এক সাহেব, আমার চেয়ারে একজন ক্ষমতাবান বসে আছে, আমিই ক্ষমতাবান।

কলোনিয়াল শাসনের আভ্যন্তরীন দ্বর্থপ্রবণতা বা অ্যাম্বিভ্যালেন্স খেলা করে দুটো মেরুর মধ্যে। সাহেব যখন বাসনা-পুরনের মডেল, আর সাহেব যখন আতঙ্ক। সাহেব বাসনা-পুরনের মডেল হওয়া মানে সাহেবকে নকল করছি, মিমিক্রি করছি। আত্মরতি মিটছে আমার — আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, হাই সাহেব, 'হাউ ডু ইউ ডু?' আমার নিজেরই প্রতিবিম্ব আমায় ভুরু নাচিয়ে উত্তর দিল, 'হাউ ডু ইউ ডু?' আর অন্য মেরুটা সাহেব মানেই আতঙ্ক, মেনেস। তখন আমার চারপাশে ঔপনিবেশিক সাহেব বাস্তবতার প্রতি আমি প্যারানইয়ায় ভুগছি। ভয়ে এবং হীনমন্যতায়। এবং, ঠিক এই অ্যাম্বিভ্যালেন্স থেকেই গজিয়ে ওঠে ঔপনিবেশিক ইতিহাসের ভাভা কথিত সেই 'স্লাই সিভিলিটি', 'মিচকে ভদ্রতা'।

## ১৫।। নথীবদ্ধতার খণ্ড উপস্থিতি

প্রতিটি কলোনিয়াল শাসনের ইতিহাসেই, কোনো না কোনো পর্যায়ে আমরা এই মিচকে ভদ্রলোকদের পাই। সাহেবের ঔপনিবেশিক ক্ষমতা এবং তার নেটিভ প্রজাদের ভিতর সেই ক্ষমতার পার্শ্বীয় উপস্থিতি এই দুটোর মধ্যে রয়েছে একটা গ্যাপ, দূরত্ব। যে দূরত্ব থেকে সাহেব হতে চাওয়ার বাসনার সৃষ্টি। এই বাসনা থেকেই আসে মিমিক্রি। যেন সাহেব অস্তিত্বের নকল করতে করতে, মিমিক পুনরাবৃত্তি করতে করতে এই দূরত্বটা চলে যাবে। দূরত্ব বা গ্যাপটা দূর করার চেষ্টায় মিমিক্রির এই পুনরাবৃত্তির প্রক্রিয়া থেকেই আসে 'মিচকে ভদ্রতা'।

এই লেখার দুই নম্বর সেকশনে জন স্টুয়ার্ট মিলের লেখা থেকে রেকর্ডেশনের, নথীবদ্ধ লিপিবদ্ধ রাখার প্রক্রিয়ার কথা আমরা প্রথম উল্লেখ করেছিলাম। তার পরে আরো অনেকবার এসেছে। সেই রেকর্ডেশনের কথা ভাবুন। মিচকে ভদ্রতার মূল কথা এই রেকর্ডেশন। যা বাস্তবতার পুনরাবৃত্তি করে কাগজে পেনে নথীতে, এবং সেই পার্শ্বীয় উপস্থিতিকে নিয়ে উৎসব করে। এই অশ্বত্থামারা পিটুলিগোলাকেই দুধ বলে ভাবে, প্রচার করে, পত্রিকায় লেখে, এবং টাউন হলে বক্তৃতা দেয়। এই রেকর্ডেশন বা নথীবদ্ধকরণই তার কাছে প্রতিনিধিত্ব বা রিপ্রেজেন্টেশন। কলোনিয়াল মানুষের কাছে যে প্রতিনিধিত্ব ঘটলেই ঘটে যেতে পারত, কিন্তু ঘটল না। সেই ঘটা এবং না-ঘটার মধ্যে গ্যাপ বা খামতিটা এবার পূর্ণ করে রেকর্ডেশন।

মানে সাহেব ক্ষমতার উপস্থিতি এবং তার পার্শ্বীয় প্রকরণের মধ্যেকার ফাটলটা জোড়া দিতে চায় এই রেকর্ডেশন। আর, খেয়াল করুন, তার মানেই, রেকর্ডেশনের এই মেটোনিমির মধ্যে উদ্ভূত হচ্ছে একটা হাইব্রিডিটি — ঔপনিবেশিক হাইব্রিডিটি। একটা কলোনিয়াল থার্ড স্পেস, যদি আমরা ভাভার ভাষায় বলতে চাই। ভাভা কলোনিয়াল হাইব্রিডিটিকে তৈরি হতে দেখলেন একটা 'একই কিন্তু পুরোপুরি নয়', 'সেম বাট নট কোয়াইট' উপস্থিতি বা প্রেজেন্স-এর ভিতর দিয়ে। সাহেব ক্ষমতা উপস্থিত হল সেখানে, কিন্তু

পার্শ্বীয়, পুরোপুরি নয়। এই হাইব্রিডিটিকে ভাভার কাঠামো দিয়েই দেখা যায়, কিন্তু ভাভা নিজে দেখতে পেলেন না। একটু মায়া নিয়ে যদি আমরা ভাভা পড়ি, একটা সিম্প্যাথেটিক রিডিং দিই, তাহলে এই সম্ভাবনাটা আমাদের মাথায় আসে। একটা কলোনিয়াল থার্ড স্পেস এর সম্ভাব্যতাটা। কলোনাইজার সাহেব আর তার কলোনাইজড নেটিভ নকল এরা তো এক না, সমান না, এখানে নেটিভ পাতিসাহেব হল লালমুখো বিলিতি সাহেবের একটা মেটোনিমিক উপস্থিতি। তা ই এই ঔপনিবেশিক ভূমি পশ্চিম-ও নয়, আবার তার অপর বা আদার-ও নয়। কারণ মিমিক্রির বা নকলনবিশির ক্রিয়া তো তার অপর বা আদার হওয়ার যোগ্যতাটাকে নষ্ট করে দিয়েছে। তাই এই ভূমি হল সেই 'এটাও নয়, ওটাও নয়', আমি তবে কেউ নই। মানে, একটা নতুন আলোচনাগত ভূমি বা ডিসকার্সিভ স্পেস — থার্ড স্পেস যার নাম দিয়েছেন ভাভা পোস্টকলোনিয়াল আলোচনায়। আবার ফেরত আসা যাক— যে প্রশ্নটা আমরা আগেই একবার করেছি : কী সেই গৌরব পোস্টকলোনিয়ালের, কী সেই বিশেষত্ব, যাতে থার্ড স্পেস শুধু উত্তরঔপনিবেশিকেই হতে পারে, ঔপনিবেশিকে নয়? যা একজন অভিবাসীর আছে কিন্তু একজন কলোনির প্রজার নেই?

আসলে ঔপনিবেশিক হাইব্রিডিটিকে বোঝার জন্যে খুব স্পষ্ট এবং উচ্চারিত একটা ওভারডিটারমিন্ড বা অতিনির্ণীত কাঠামোর দরকার পড়ে। কী করে ঐ উপস্থিতি এবং তার আংশিকতার মধ্যে ফারাকটা ভরাট হয় ঐতিহ্যকে দিয়ে এটা বোঝার জন্যে। সেই ঐতিহ্য যা আর ঐতিহ্য নেই। বদলে গেছে, স্থানান্তরিত হয়েছে, অতিনির্ণীত হয়ে গেছে উত্তরআধুনিক জীবনবাস্তবতার অন্য সব উপাদানদের দিয়ে। থার্ড স্পেসকে শুধু পোস্টকলোনির করে ভাবার ভাভার এই ভুলটার নানা সম্ভাব্য খুঁটিনাটি অবশ্যই ভাভার লেখায় নেই, থাকার কথাও নয়, থাকলে তো ভুলটাই থাকত না। কিন্তু এই ভুলটা হওয়ার কিছু কারণ আন্দাজ করার চেষ্টা করা যেতে পারে। এবার আমরা সেই কথায় আসব ভাভার মিমিক্রির প্রতি আমাদের সমালোচনা দিয়ে, মিমিক্রি অফ মিমিক্রি দিয়ে। আসছি সেই কথায়।

ভাভার তত্ত্বে ওই পার্শ্বীয় বা আংশিক উপস্থিতির মেটোনিমিকে ভালো ব্যাখ্যা করা যায় লাকাঁর 'গ্যাপ'-এর ধারণা দিয়ে। এখানে এই গ্যাপটা বোঝায় কলোনির নেটিভ প্রজার তরফে স্বাভিমান বা আত্মমর্যাদাবোধের, সেল্ফ-এস্টিম-এর খামতিটাকে। এই খামতিটাই আবার, আগেই যা বলেছি আমরা, তার অসাহেবতার বিশিষ্ট প্রকৃতি বা স্ট্রাইকিং ফিচার। কিন্তু এ সবই তো হল আমাদের মায়ার দৃষ্টিতে ভাভা পড়ার, সিম্প্যাথেটিক রিডিং-এর ফলাফল। পোস্টকলোনিয়াল হাইব্রিডিটি নিয়ে ভাভার যে অবস্থান, যা আমরা একটু আগেই বিবরণ দিয়েছি, তার সঙ্গে কি ঠিক ভাবে যায় আমাদের এই সিম্প্যাথেটিক রিডিং? একটা ঝঞ্ঝাট সেখানে পাকিয়ে ওঠে। যা আমরা এবার সমাধান করব।

ভাভার মিমিক্রি হল ইংরিজি কেতার নেটিভ প্রজাকে 'একই কিন্তু পুরোপুরি নয়' সাহেব করে তোলার পদ্ধতি। একটা পার্শ্বীয়, মানে মেটোনিমিক, উপস্থাপনা। কলোনাইজার সাহেব প্রভু সামনে এগিয়ে দেয় তার নিজের একটা আংশিক উপস্থিতি। এই মেটোনিমিক উপস্থিতি ভারি আমোদের জিনিষ একটা। সবই সেখানে সমান কিন্তু পুরোপুরি না, সেম বাট নট কোয়াইট। ওই নেটিভ প্রজার অধিকার সেখানে সাহেব প্রভুর সঙ্গে সমান কিন্ত পুরোপুরি না। কলোনাইজার সাহেব প্রভু তাই তার নেটিভ প্রজাদের কোনো যথার্থ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করে না। যথার্থ প্রতিনিধিত্ব মানে সরকারি সংস্থায়, শাসনতন্ত্রে এবং আইনবিভাগে জ্যান্ত নেটিভদের শারীরিক প্রতিনিধিত্ব। সেই জ্যান্ত শারীরিক প্রতিনিধিত্বের জায়গায় সাহেব ক্ষমতা পাকিয়ে তোলে একটা আংশিক প্রতিনিধিত্ব, মানে রেকর্ডেশন। নেটিভ প্রজারা সরকারে বা শাসনে অংশ নিতে পারে না, তারা পায় শুধু লিপিবদ্ধ ভাবে নথী হিশেবে টিকে থাকার অধিকার।

এই লিপিবদ্ধ রাখার প্রক্রিয়া বা রেকর্ডেশনও কিন্তু একটা আংশিক বিপদে ঠেলে দেয় কলোনাইজার ব্রিটিশ প্রভুর শাসনের প্রত্যক্ষ সংস্থাগুলোকে। সাবধান, সব কিছু লিখে রাখা হচ্ছে, রেকর্ড রাখা হচ্ছে, এবং যদি কোনো বেগড়বাই করো পরে তোমাদের ক্যাঁক করে চেপে ধরা হবে। এবং ব্রিটিশ শাসনের এই এজেন্টদের একটা উত্তর দেওয়ার বাধ্যতাও থাকবে সেখানে। কোনো দুষ্টু লর্ড ক্লাইভ যদি বজ্জাতি করে, তাকে পরে, কোনো একদিন, কান ধরে বেঞ্চির উপর দাঁড়াতে হবে। অন্তত নিলডাউন।

লিপিবদ্ধতার নথীনির্মাণের এই নীতি শাসক হিশেবে ব্রিটিশ সরকারকে অবশ্যই একটা মর্যাদা দেয়। যারা একধরনের একটা 'সামাজিক ন্যায়', 'সোশাল জাস্টিস' দিয়ে শাসন করে। স্পষ্ট সাদা কালো অক্ষরে লেখা একটা পুঁথি রয়ে যাচ্ছে, সদাসর্বদা, মহাফেজখানার তাকে পরপর সারিসারি, গম্ভীর কালো রঙের চামড়ায় বাঁধানো তাদের পোস্তানি, যাতে শ শ বছর টিকতেও কোনো অসুবিধে না হয়। এই পুঁথিটা ঝুলে আছে সবার মাথার উপরে, উদ্যত খাঁড়ার মত, নির্বাক কিন্তু অতন্দ্র পেয়াদার মত, সবাইকে সবকিছুকে লক্ষ্য করে যাচ্ছে প্রতি পল অনুপল। তুমি এই ব্রিটিশ শাসনের খেলার নিয়মগুলো মানছো না মানছো-না। আফটার অল, ব্রিটিশরা তো স্পোর্টসম্যানের জাত (যদিও বিশ্বকাপ ফুটবলে, পেলে বা ক্রুয়েফ বা মারাদোনার সঙ্গে, সেটা খুব কমই মালুম হয়)। এবং এই নিরিখে, নিশ্চিতভাবেই, ঔপনিবেশিক শাসক হিশেবে, ব্রিটিশদের পজিশনটা ফরাসী বা স্প্যানিশদের চেয়ে উঁচুতে। ফরাসিরা যা খুশি তাই করে, ব্রিটিশরা অন্তত তার একটা রেকর্ড রাখে। বেদনা হয়ত দিল, অন্তত বেদনার গাথাটা লেখা রইল কোথাও।

এই ভাবে, কালাপানির ওপার থেকে আসা বণিকেরা, রাজ্যপাট জয় করে নেয়, জয় করে দেশ, মানুষ, সংসার গ্রাম, মানুষের শরীর — আর শুধু এই শরীর না, শরীরের উপরদিকে অনেকগুলো হাড়ের নিচে নিশ্চিন্ত নিরাপত্তায় নিয়ত ধুকধুক করতে থাকা তাদের জ্যান্ত হৃদপিণ্ড। চাবুকের নিচে তারা শুধু রথের দড়িই টানে না, টানতে টানতে শ্বাস নেওয়ার তালে তালে তারা রাজার গানও গায়, জয়গান। মহারাজ কত ভালো, মহারাজ কত ফরসা। (সুমনের 'ভগবান কত ভালো' গানটার ওই তীব্রতাটাই থাকত না, যদি দ্বিতীয় লাইনে 'ফরসা' শব্দটা না থাকত, ওখানে শব্দটা অমোঘ, আমাদের মনের গোপন তলে মনে পড়িয়ে দেয় ফরসা লালমুখো গোরা সাহেব শাসকদের স্মৃতি।) তারা এই গান গায়, ব্রিটিশ প্রভু শুধু তাদের না, তাদের মনন চিন্তন অনুভূতিকেও শাসন করতে শুরু করে। মানে, এভাবেই জন্মায় ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের হেজেমনি।

কলোনাইজড মানে কলোনির নেটিভরা এবার কী ভাবে ভাবে? কী হয় তাদের দৃষ্টিভঙ্গী? স্বদেশীরা মানে আমাদের দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকারীরা নিজেদের বোঝায় যে তারা অন্তত কিছু কিছু ন্যায় পায় বৈকি — কিছু ন্যায়, পুরোপুরি নয়। ব্রিটিশ শাসনের কাছ থেকে ব্রিটিশ প্রজা, মানে সাহেব নাগরিক যে ন্যায় পায় তার সঙ্গে সমান কিন্তু পুরোপুরি নয়, সেম বাট নট কোয়াইট। কিছুটা ন্যায় তো মিলবেই — যতই হোক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি আমাদের শাসন করছে। নিটশের সেই 'দোকানদারদের জাত', বা 'ভেজা বুড়ো ব্যাঙদের জাত' এই যে ভারতীয় জনমানসে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি হয়ে গেল, সেটাই ওই হেজেমনির প্রমাণ, ঔপনিবেশিক হেজেমনির।

যথার্থ প্রতিনিধিত্বের জায়গায় রেকর্ডেশনের আংশিক প্রতিনিধিত্ব দিয়ে গড়ে ওঠে এই ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ হেজেমনি। ব্রিটিশ আমলের সংস্কারগুলোও ঠিক ওই একই রকম, একটা আংশিক খণ্ড এবং পার্শ্বীয় তাদের চরিত্র এবং কাজ। সোশাল-কে, সামাজিক বাস্তবতাকে তারা সেই 'প্রায় কিন্তু পুরোপুরি নয়' আলোকপ্রাপ্ত ব্রিটিশ মান অব্দি ঠেলে নিয়ে যায়। শিল্পবিপ্লবের এবং পুঁজিতন্ত্রের ব্রিটেনে বাস্তবতা যেরকম — কলোনি ভারতের বাস্তবতাও হয়ে ওঠে তার সঙ্গে একই কিন্তু পুরোপুরি নয়। আর এতে চমৎকার ভাবে, শ্যামও থাকছিল আর কূলও থাকছিল। কলোনাইজড নেটিভ ভারতীয়দের ধর্মীয় আবেগেও এতে কোনো আঘাত পড়ছিল না, কারণ সেই ধর্মীয় আবেগ মানে ঐতিহ্য নিজেও তো ইতিমধ্যেই হয়ে পড়েছিল পার্শ্বীয়, আংশিক, খণ্ড — একটা পরিবর্তিত অবয়ব, মেটোনিমিক উপস্থিতি, পার্শ্বীয় রকমে সেই ভারতীয় ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যে উপস্থিত ছিল ব্রিটিশ ক্ষমতা নিজেই।

উপস্থিতির মেটোনিমি মানে উপস্থিতির থেকে অন্য কিছু, আরো কিছু — অর্থাৎ, উপস্থিতির অভাবের একটা উপস্থিতি — প্রেজেন্স অফ এ ল্যাক অফ প্রেজেন্স। সঠিক উপস্থিতি সেখানে নেই, আবার যা নেই তা তো সেইটারই না থাকা, বা, খণ্ড এবং পার্শ্বীয় রকমে থাকা, তাই সেটা অনুপস্থিতি নয়, অ্যাবসেন্স নয়, প্রেজেন্স অফ এ ল্যাক অফ প্রেজেন্স। (ধরুন মারাদোনা পরপর তিনজনকে কাটিয়ে বল নিয়ে পৌঁছল পেনাল্টি বক্সে। পুরো গতিপথটাকে দেখুন। এটা মারাদোনার গতিপথ। কিন্তু এই গতিপথের পুরো সময়টার ভিতর কোনো একটা নির্দিষ্ট মুহূর্তে মারাদোনা কিন্তু ওই গতিপথের কেবল একটা বিন্দুতেই আছে,

অন্যগুলোয় নেই, অথচ তারা সবাই মিলেই গতিপথ। তাহলে সেই মুহূর্তে অন্য বিন্দুগুলোকে আমরা কী বলব? সেটা তো মারাদোনার অনুপস্থিতি হবে না, হবে এ ল্যাক অফ প্রেজেন্স। মারাদোনার উপস্থিতির অভাব। সেটা অন্য কারোর উপস্থিতির অভাব না, পেলের না, ক্রুয়েফের না, ইউসোবিওর না, শুধু মারাদোনারই, তাই সেটা একটা উপস্থিতিও। প্রেজেন্স অফ এ ল্যাক অফ প্রেজেন্স অফ মারাদোনা। মারাদোনার উপস্থিতির অভাবের উপস্থিতি। একটা পরিবর্তিত রকমে সেটা তো একটা উপস্থিতি বটেই। মারাদোনার গতিপথটা ঠিক কী সেটা বুঝতে হলে তো আমাদের একটা মুহূর্তকে বুঝলে চলবে না, শুধু জানলে চলবে না মারাদোনা এই মুহূর্তে কোথায় আছেন, জানতে হবে, তিনি আগের এবং পরের মুহূর্তগুলোয় কোথায় ছিলেন বা থাকবেন মানে এখন নেই।)

যে কোনো মেটোনিমিক উপস্থিতি মানেই একটা খামতি, একটা গ্যাপ বা একটা ল্যাক। আসল বা রিয়াল থেকে একটা ল্যাক। যা ওই আসল বা রিয়ালের প্রতি একটা বাসনাকে জাগিয়ে তোলে। ঘ্রাণে ভোজনের একটা অর্ধেক মানে আংশিক উপস্থিতি যেমন, ভেসে আসা ঘ্রাণ ধরে ধরে আমরা মনে মনে হেঁটে যাই ভাজা হতে থাকা রিয়াল ইলিশ বা কষতে থাকা রিয়াল পাঁঠার রিয়াল মাংসের দিকে, যারা আমাদের বাসনায় উদ্বেল করে তোলে। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের হেজেমনিক ক্ষমতার ওই মেটোনিমিক উপস্থিতিতে রিয়াল হল মডার্নিজম এবং ডেমোক্রাসি, আধুনিকতা এবং গনতন্ত্র। যা শিল্পবিপ্লবোত্তর আলোকপ্রাপ্ত ব্রিটেনে ছিল, বা অন্তত ছিল বলে মনে করত ভারতের নেটিভ প্রজা। আসলের প্রতি, আসল গনতান্ত্রিক এবং আধুনিক ন্যায়ের প্রতি, রিয়াল জাস্টিসের প্রতি বাসনাই ঔপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশ হেজেমনির ভিত্তি। আধুনিকতার হেজেমনি তৈরি হয়েছিল এই ব্রিটিশ ন্যায়ের প্রতি বাসনা দিয়ে। তাই, মডার্নিজম তার কলোনিগুলোতে উপনিবেশগুলোতে শাসন করে আসলে তার মেটোনিমিক উপস্থিতি দিয়ে, তার উপস্থিতির অভাব দিয়ে, ল্যাক দিয়ে। খণ্ড পার্শ্বীয় আংশিক উপস্থিতি দিয়ে। যে খণ্ডতায় উত্তরঔপনিবেশিক তাত্ত্বিকরা শাসনের অসম্পূর্ণতা দেখেছেন, হেজেমনির অনুপস্থিতি দেখেছেন তা আসলে এক দক্ষতর উপস্থিতি, মেটোনিমিক উপস্থিতির হেজেমনি।

## ১৬।। খণ্ড থেকে পূর্ণের বাসনা

আধুনিকতার এই মেটোনিমিক উপস্থিতি মানে উপস্থিতির এই অভাব বা ল্যাক থেকে গড়ে ওঠে বাসনা। রিয়াল মডার্নিজমের প্রতি বাসনা। যে বাসনা দিয়ে ফুঁসলে ওরা নিয়ে যায় ঔপনিবেশিক ভারতের মিমিক্রিরত নেটিভের হৃদয়। গুংগা যন্ত্রের মন্ডা মিঠাইয়ের মত নেটিভ ভারতীয়র চোখের সামনে ঝোলে রিয়াল মডার্নিজম এর হাতছানি, চারুলতার অমল পিয়ানোয় সুর করে গেয়ে ওঠে আকুল গান, তার একটাই শব্দ 'মেডিটেরানিয়ান', এতই তার আকুলতা যে প্রেমিকা বৌদিকে ফেলে চলে যাওয়া যায়। এই ছেনাল সিডাক্টিভ মডার্নিজম আর চোখের সামনে সবকিছুতে তার মেটোনিমিক উপস্থিতি গড়ে তোলে আসল মডার্নিজমের প্রতি অপ্রতিরোধ্য বাসনা। একটা সত্যিকারের উপস্থিতি বরং এই বাসনা ও হাতছানিকে অনেকটাই ভেঙে দিতে পারত। যখন ঔপনিবেশিক নেটিভ আদতটাকে, রিয়াল-টাকে, গোটাটাকেই প্রত্যাখ্যান করে দিত। উপনিবেশে শেষ অব্দি ঘটে ওঠা অ্যাকচুয়াল বা বাস্তবিক আধুনিকতাকে প্রত্যাখ্যানটা হয়ে দাঁড়াত গোটা আধুনিকতার প্রতি, ব্রিটিশ শাসনের প্রতি প্রত্যাখ্যান। রিয়াল আধুনিকতাকে প্রত্যাখ্যান। এক্ষেত্রে সেটা ঘটে না। আধুনিকতার পার্শ্বীয় উপস্থিতি দিয়ে জাগিয়ে তোলা আধুনিকতার প্রতি বাসনা ব্রিটিশ শাসনকে প্রত্যাখ্যানের বিপদ থেকে রক্ষা করে।

ভাভার যুক্তিকাঠামোয় আলোকপ্রাপ্ত ঔপনিবেশিক মন মানে এই রিয়াল বা আসল আধুনিকতার প্রতি একটা উঞ্ছবৃত্তি মাত্র। তাই, ভাভা তার ছকে, মিমিক্রির ঔপনিবেশিক ভূমি আর হাইব্রিডিটির উত্তরঔপনিবেশিক ভূমির মধ্যে সংযোগটা ধরতে পারেননি। কারণ, মিমিক্রির ফলাফলটা পুরো খতিয়ে দেখেননি ভাভা। দেখেননি কী ভাবে একটা ঔপনিবেশিক ভূমির মিমিক্রি জায়গা করে দেয় আর এক রকম একটা থার্ড স্পেসের। একটা ঔপনিবেশিক থার্ড স্পেস। যে থার্ড স্পেসকে ভাভা শুধু উত্তরউপনিবেশেই দেখেছেন। ভাভা মিমিক্রিকে বুঝেছিলেন একটা পার্শ্বীয় এবং খণ্ড উপস্থিতি হিশেবে — প্রায় সাম্য তবে

পুরোপুরি না, প্রায় সাদা তবে পুরোপুরি না। এই আংশিক উপস্থিতি থেকে গজাচ্ছিল একটা আংশিক সঞ্চার — একটা আংশিক রকমে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল একটা ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি। যা গড়েই উঠেছে একটা ঔপনিবেশিক নির্ভরতার, কলোনিয়াল ডিপেন্ডেন্স-এর কাঠামোর চারপাশে। সাহেব ক্ষমতা ও সংস্কৃতির প্রতি নেটিভ নির্ভরতার সেই কাঠামোটাকে আরো পোক্ত করে তোলে এই ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির সঞ্চার। তার খামতির জায়গাগুলোকে বানিয়ে তোলে, ভরাট করে দেয়। এবং, খুব মন দিয়ে লক্ষ্য করুন, এই কলোনিয়াল নির্ভরতার (মানে কলোনিয়াল অধীনতার) আংশিক সঞ্চারের ক্রিয়াই তাকে একসময় উদ্বুদ্ধ করে কলোনিয়াল স্ব-অধীনতার দিকে। স্বাধীনতার সংগ্রাম জেগে ওঠে চারপাশে। যখন তার মন আর ওই আংশিক উপস্থিতির ললিপপে ভুলছে না। সিগারেট লজেন্স চুষতে চুষতে এবার সে সিগারেট চাইছে। তার বয়স হচ্ছে না? এবার আর খণ্ড উপস্থিতি নয়, তার চারপাশে এই কলোনিয়াল সংস্কৃতি সঞ্চার করে যাওয়া নয়, এবার চাই আদত আসল মাল। রিয়াল প্রেজেন্স, আসল উপস্থিতি।

গোলাম।। যে দেশে বায়ু না মানে
বাধ্যতামূলক বিধি
সে দেশে দহলা তত্ত্বনিধি
কেমনে করিবে রক্ষা কৃষ্টি—
সে দেশে নিশ্চিত অনাসৃষ্টি।

রাজা।। থাক, আর প্রয়োজন নেই। এটা চতুর্থবর্গের পাঠ্য পুস্তকে চালিয়ে দিয়ো। তাসবংশীয় শিশুরা কণ্ঠস্থ করুক।

ছক্কা।। রাজাসাহেব, তোমার চতুর্থবর্গের শিশুবিভাগের ছাত্র নই আমরা। আজ হঠাৎ মনে হচ্ছে, আমাদের বয়স হয়েছে। ও ছন্দ মনে লাগছে না।

পঞ্জা।। ওগো বিদেশী, সমুদ্রের ওপারের ছন্দ আমাদের কানে দিতে পার?

রাজপুত্র।। পারি, তবে শোনো। (গান)

ঔপনিবেশিক প্রভুর, ক্ষমতার, ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির পার্শ্বীয় খণ্ড মেটোনিমিক উপস্থিতি। কাজ করে চলেছে খণ্ডকে দিয়ে জাগানো আসলের প্রতি বাসনার ভিত্তিতে। সেই খণ্ড উপস্থিতি ও বাসনার ভিত্তিতে আসছে ঔপনিবেশিক নির্ভরতা ও অধীনতা। তার চারপাশে গজাচ্ছে বাড়ছে তৈরি হচ্ছে সঞ্চারিত হচ্ছে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি। একটা সময় আর এই খণ্ড উপস্থিতিতে তার মন আর ভুলছে না। সে চাইছে পূর্ণ উপস্থিতি। পূর্ণ উপস্থিতি মানেই সাহেবহীন হওয়া, কারণ সাহেবের মডেলে সাহেবের তো কোনো সাহেব নেই। তাই এবার চাই স্বাধীনতা। এতদিন ধরে সমুদ্র পেরিয়ে আসা রাজকুমারের নাচ গান তাদের নড়াচ্ছিল, এবার চাই পুরোপুরি সেই সমুদ্রপারের আধুনিকতার গান।

কলোনিয়াল অধীনতার ওই আংশিক সঞ্চার ছড়াতে ছড়াতে তৈরি করল খিদে, কলোনিয়াল স্বাধীনতার খিদে, বদলি বিকল্পের জায়গায় রিয়াল মডার্নিজম পাওয়ার খিদে। পার্শ্বীয় উপস্থিতির ঔপনিবেশিক দৃষ্টি, মেটোনিমিক কলোনিয়াল গেজ, এবার স্থিরনিবদ্ধ হয়ে যায় ওই রিয়ালের প্রতি বাসনায় — ডিজায়ারাল ফিক্সেশন, চাই স্বাধীনতা, চাই আসল আদত মডার্নিজম।

ভাভা মিমিক্রি অব্দি ভাবলেন, কিন্তু খেয়ালই করলেন না এর ইন্টারেস্টিং জায়গাটা। মেটোনিমিক ঔপনিবেশিক দৃষ্টি এবং প্রহরা কী ভাবে পর পর এক গুচ্ছ ঔপনিবেশিক খণ্ড-বস্তু এবং খণ্ড-ঘটনা, কলোনিয়াল পার্ট-অবজেক্টস এবং পার্ট-ইভেন্টস, নির্মাণ করতে করতে যায়। যারা সবাই মিলে তৈরি করে একটা আংশিক আলোচনার, পার্শিয়াল ডিসকোর্স-এর তল। যা দিয়ে ঔপনিবেশিক সাহেব ক্ষমতা এবং তার নির্মিত খণ্ড-বিষয়ীরা, পার্ট-সাবজেক্টরা নিজেদের মধ্যে আদান প্রদান করে। একদম হরির নাম খাবলা খাবলা বলতে যা বোঝায়। খাবলা বিষয়ী রয়েছে তার খাবলা বস্তুদের নিয়ে, বানাচ্ছে খাবলা ডিসকোর্স, তাই দিয়ে বিনিময় করে যাচ্ছে প্রভুর ক্ষমতার সঙ্গে। আর এই খাবলাতন্ত্র একটা ম্যাজিক দেখাচ্ছে এবার। কোনোকিছুই পুরো না হওয়ার এই খাবলামো সেই আদতের প্রতি বেমক্কা বাসনা, মানে ডিজায়ারাল ফিক্সেশন দিয়ে সবকিছু নির্ণীত হতে আর দিচ্ছে না। বরং বদলে দিচ্ছে সেই বেমক্কা বাসনাকেই, রিয়ালের প্রতি স্থিরনিবদ্ধ

দৃষ্টিকে খাবলায় খাবলায় মচকে দিয়ে বানিয়ে দিচ্ছে একটা কমপ্লেক্স স্পেস বা জটিল ভূমির প্রতি বাসনা। যে ভূমিতে সবকিছুই আছে খাবলায়। (কমপ্লেক্স স্পেস নিয়ে আমাদের গোড়ার দিকের আলোচনাটা মনে করুন) । এই ভূমি আংশিক-কলোনিয়াল, মানে পশ্চিমের বিজ্ঞান নাও কয়েক খাবলা, তার ধর্মকে নিও না, খেরেস্তান হোয়ো না। আংশিক-নেটিভ, মানে অনেক খাবলা ধর্ম ঐতিহ্য ইত্যাদির হরির লুট সেখানে আছে। কয়েক খাবলা তামাক এবং কয়েক খাবলা ডুডু, কয়েক খাবলা ধর্ম এবং কয়েক খাবলা ধর্মতলা দিয়ে নগরের রাস্তা দিয়ে দৌড়ে বেড়ানো জ্বলন্ত জিরাফ মানে লুই বুনুয়েল ব্রান্ড প্রতিমাবিদ্বেষ, আইকনোক্লাজম। (শক্তি নিশ্চয়ই এই বুনুয়েলের জিরাফকে নিয়েই ভেবেছিলেন তার বইয়ের নাম, 'ধর্মেও আছি জিরাফেও আছি'! বুনুয়েল-এর মত প্রতিমাবিদ্বেষী আইকনোক্লাস্ট কে আছে আর, যতদূর মনে পড়ছে, বুনুয়েলের বালক বয়সে তার বাবা একবার তাকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিল কারণ বুনুয়েল বলেছিল তার মিশনারি ইস্কুলে যে সুপটা খেতে দেওয়া হয়, সেটা পাদ্রীর জাঙ্গিয়া সিদ্ধ করে করে বানানো।)

## ১৭।। কমপ্লেক্স নয় সিন্থেটিক শাসন

রিয়াল বা আসল মডার্নিজমের প্রতি স্থিরনিবদ্ধ ওই দৃষ্টি শেষ অব্দি থিতিয়ে আসে এবং পাকিয়ে তোলে একটা কমপ্লেক্স হেজেমনি। খুব স্পষ্ট এবং নিখুঁত ভাবে এটা লক্ষ্য করেছেন পার্থ চ্যাটার্জি তার জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত আলোচনায়। বিশেষ করে যেখানে বঙ্কিমের লেখা নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। ভারতের ঔপনিবেশিক ইতিহাসে কমপ্লেক্স হেজেমনি নিয়ে ভারি বুদ্ধিদীপ্ত সেই আলোচনা।

আমরা আগেই দেখিয়েছি, কমপ্লেক্স হেজেমনিক স্পেস আদতে একটা গ্রামশিয়ান অবস্থান। যেখানে সঙ্গত স্বাভাবিক ইউনিভার্সালটা, সমগ্রটা ঘটে উঠছে না। তাই ক্ষমতাকে বানিয়ে তুলতে হচ্ছে একটা সারোগেট বা কানাই-জননী ইউনিভার্সাল যিনি না বিইয়েই মা হয়ে বিখ্যাত। একটা বদলি বিকল্প বানিয়ে তোলা সারোগেট ইউনিভার্সাল জন্ম নিচ্ছে। সঙ্গত আদত ইউনিভার্সালের জায়গায় এবার যাকে দিয়ে ক্ষমতা শাসন করবে।

হেগেলের যুক্তিবিদ্যায় সমস্ত বস্তু ও সত্তা একত্রে হাজির থাকে তাদের ইউনিভার্সালে, তাদের সার বা এসেন্স মারফত। হেগেলের এই সারবাদী বা এসেনশিয়ালিস্ট লজিক এখানে, গ্রামশির এই সারোগেট বা উৎপাদিত ইউনিভার্সালে হাজির থাকছে একটা স্থানান্তরিত রকমে। হেগেলের সারবাদী যুক্তির একটা জায়গা এখানে আক্রান্ত হচ্ছে। ইউনিভার্সাল-এর ধারণা এখানে আর আগের মত থাকছে না। স্বাভাবিক সঙ্গত ইউনিভার্সালের ধারণা পরিত্যক্ত হচ্ছে। এবং এই সারোগেট ইউনিভার্সালের অংশগুলোর মধ্যে, বিভিন্ন উপাদানগুলোর মধ্যে, যে বাইনারি বৈপরীত্য সেটা মূল হেগেলিয়ান মডেলে কোনো মিত্রতা ঘটতে দেয় না। যেমন থিসিস আর অ্যান্টিথিসিস পুঁজিতন্ত্র আর সামন্ততন্ত্র কোনো মিত্রতায় আসতে পারে না। কিন্তু এখানে তারা মিত্রতায় আসছে এবং তার ভিত্তিতেই গড়ে উঠছে ওই সারোগেট ইউনিভার্সাল। বা ধরুন, মডার্নিজম আর ট্রাডিশন — দুজনে পরস্পরের শত্রু। তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথা নয়। পার্থ চ্যাটার্জি আমাদের দেখাচ্ছেন কী ভাবে ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক পরে উত্তরঔপনিবেশিক পরিপ্রেক্ষিতে এরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। থিসিস আর অ্যান্টিথিসিস দুজনে মিলে গড়ে তুলেছিল একটা সারোগেট সিন্থেসিস, ঘটে উঠেছিল একটা সারোগেট ইউনিভার্সাল।

পার্থ চ্যাটার্জির ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই বনাবটি ঐক্যবদ্ধতাটা উৎপাদিত হয়েছিল একটা তৃতীয় ধারণা দিয়ে, যার নাম নেশন। রাষ্ট্র। ন্যাশনালিজম বা জাতীয়তাবাদী আবেগই সেই বন্ধন যা এদের দুজনকে একত্রে বেঁধেছিল, আধুনিকতা আর ঐতিহ্য নামের এই দুই শত্রুকে। পার্থ চ্যাটার্জি এখানে গ্রামশির যে পদ্ধতি দিয়ে এই নেশন ঘটে ওঠাটাকে ব্যাখ্যা করেছিলেন সেটার নাম প্যাসিভ রেভলিউশন বা পরোক্ষ বিপ্লব। যে পদ্ধতিতে থিসিস অ্যান্টিথিসিসকে অপসারণ না করে বরং তার একটা অংশকে আত্তীকরণ করে ওই মায়া সিন্থেসিস বানিয়ে তোলে সেটারই নাম এই পরোক্ষ বিপ্লব।

কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, পার্থ চ্যাটার্জি যেখানে প্যাসিভ রেভলিউশন এবং নেশনের কমপ্লেক্স হেজেমনি দেখলেন, সেখানে আসলে কাজ করছে আরো জটিল একটা হেজেমনি। যার নাম সিন্থেটিক

হেজেমনি। পুরো সাংস্কৃতিক ভূমিটা হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা সিন্থেটিক ভূমি (সিন্থেটিক ভূমি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা তো আমরা আগেই করে এসেছি)। এবং এই সিন্থেটিক ভূমিতে আধুনিকতা আর ঐতিহ্যের মিলমিশের প্রক্রিয়াটাও আর প্যাসিভ রেভলিউশন নেই, হয়ে দাঁড়িয়েছে প্যাসিভ রিইভ্যালুয়েশন, পরোক্ষ পুর্নমূল্যায়ন।

এই ধারণাটাকে প্রথম আনেন অজিত চৌধুরী ও কল্যাণ সান্যাল, গ্রামশি নিয়ে তাদের আলোচনায়। পরে এটা নিয়ে অন্যত্র অনেক দীর্ঘ আলোচনা আমরা করেছি। দুটো পদ্ধতির মূল পার্থক্যটা ভালো বোঝানো যায় অঙ্কের কন্টিনিউয়িটি এবং ব্রেক দিয়ে। ধরুন, ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীত। তাদের প্রচুর প্রচুর পার্থক্য। তাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হল, মীড় হওয়া এবং না-হওয়া। সা রে গা পা পা ধা নি এবং ডো রে মি ফা সো লা টি এই দুই স্বরকাঠামোর মধ্যে গঠনগত ফারাক আছে, শ্রুতির তফাত আছে। তাও যদি এই দুই সরগমকে আমরা তুল্যমূল্য ধরে নিই, এবার একটা বড় পার্থক্য এইখানে দাঁড়ায় যে ভারতীয় সঙ্গীতে একটা নোট বা স্বর থেকে আর একটা স্বরে যাওয়া যায় একটা নিরবচ্ছিন্ন পথ ধরে। ধরুন, ভাঁয়রোর রিওয়াজের একটা চলন, সা থেকে আন্দোলিত কোমল রে হয়ে গা মা গা রে আবার সা। এই পুরোটা একটা একটানা আওয়াজ দিয়ে করা যায়, এবং ভারতীয় মার্গসঙ্গীতে এটা সবসময়েই করা হয়ে থাকে, একটা নোট থেকে একটানা একটা আওয়াজে আমরা চলে গেলাম সম্পূর্ণ আলাদা একটা নোটে। মধ্যে আরো বহু নোট ছুঁয়ে গেলাম। এবার এই যাচ্ছি যখন, তখন শুধু সা আর রে এই দুটো নোট গাইছি না, গাইছি তাদের মধ্যেকার আরো বহু অসংখ্য নোট, যারা সা থেকে বাড়তে বাড়তে ক্রমে রে হচ্ছে। আর পাশ্চাত্য সঙ্গীতে দুটো নোট আলাদা আলাদা। তাদের মধ্যের বিন্দুগুলো দিয়ে এই একটানা চলন হয় না। সেখানে চলনগুলো স্টাকাটো, কাটা কাটা। ডো কাট রে কাট মি কাট ইত্যাদি। মানে মধ্যের বিন্দুগুলো লাফিয়ে আমরা অন্য নোটে যাচ্ছি। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে মীড় হয় না। এটাকে অঙ্কের ভাষায় বললে বলা যায় ব্রেক। আর ভারতীয় মার্গসঙ্গীত কাজ করে কন্টিনিউয়িটি দিয়ে।

গ্রামশিয়ান প্যাসিভ রেভলিউশনের সঙ্গে প্যাসিভ রিইভ্যালুয়েশনের একটা বড় তফাত প্যাসিভ রেভলিউশন বুঝছে ব্রেক দিয়ে। আর প্যাসিভ রিইভ্যালুয়েশন একটা একটানা নিরবচ্ছিন্ন কন্টিনিউয়াস পদ্ধতি। প্রতি মুহূর্তে সেখানে আধুনিকতা আর ঐতিহ্য পরস্পর পরস্পরকে পুর্নমূল্যায়ন করছে এবং সেই মোতাবেক নিজেকে বদলাতে বদলাতে যাচ্ছে। এবং, প্যাসিভ রেভলিউশন পদ্ধতিটা একটা গ্রামশিয়ান হেগেলিয়ান তাত্ত্বিক তলে কাজ করে। কমপ্লেক্স স্পেসে। যেখানে সমগ্রের আলাদা আলাদা অংশগুলো পরস্পর পরস্পরের থেকে স্পষ্ট ভাবে আলাদা। প্যাসিভ রিইভ্যালুয়েশন কাজ করে একটা অতিনির্ণীত তলে। সিন্থেটিক স্পেসে। যেখানে প্রতিটি অংশ অন্য প্রতিটি অংশের দ্বারা নির্ণীত ও নির্মিত। দুটোর মিলের জায়গা একটাই — প্যাসিভ বা পরোক্ষ। কোনো সচেতন প্রত্যক্ষ সরাসরি বলপ্রয়োগ এখানে হচ্ছেনা, যেমন প্রচলিত মার্ক্সবাদী কাঠামোয় জনগনতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে হওয়ার কথা।

তাই, আমাদের সঙ্গে পার্থ চ্যাটার্জির ফারাক ঘটছে এইখানে যে পার্থ চ্যাটার্জি যেখানে কমপ্লেক্স স্পেসে প্যাসিভ রেভলিউশন দেখছেন আমরা সেখানে দেখছি সিন্থেটিক স্পেসে প্যাসিভ রিইভ্যালুয়েশন। মডার্নিজম আর ট্রাডিশন, আধুনিকতা আর ঐতিহ্য, দুজনে দুজনকে একটানা নিরবচ্ছিন্নতায় নির্ণয় আর নির্মাণ করে চলেছে, অতিনির্ণয় করে চলেছে, দুজনে দুটো বিচ্ছিন্ন বিশ্লিষ্ট কর্তিত সত্তাই আর থাকছে না — যেমন ভেবেছেন উত্তরঔপনিবেশিক তাত্ত্বিকরা।

মডার্নিজম আর ট্রাডিশন দুজনেরই সারপ্লাস মিনিং বা উদ্বৃত্ত অর্থ এবার দুজনকে ছাড়িয়ে উপচে যাচ্ছে, ঢুকে যাচ্ছে অন্যের ভিতরে, নিজেদের মধ্যে দরকষাকষি করে, নেগোশিয়েট করে, নাকচ বা নিগেট না-করে, তৈরি করছে একটা সিন্থেটিক ভূমি। বা ভাভার ভাষায় থার্ড স্পেস। যেখানে আধুনিকতা আর ঐতিহ্য দুজনেই তাদের আদত প্রাথমিক অর্থ হারিয়ে ফেলেছে এবং হয়ে উঠেছে দুই ত্রিশঙ্কু বর্গ, ইন-বিটুইন ক্যাটিগরি। একটা কলোনিয়াল ভূমি ইতিমধ্যেই সদাসর্বদাই অলওয়েজ অলরেডি একটা থার্ড স্পেস বা সিন্থেটিক স্পেস হয়ে বসে আছে। এই খবরটা ভাভা পাননি। তাই থার্ড স্পেসকে জাস্ট

উত্তরঔপনিবেশিকের জন্যে তুলে রেখেছেন, আর মিমিক্রি বরাদ্দ হয়েছে তার ঔপনিবেশিক ইতিহাসে। ভাভা এই ভুলটা করলেন কেন? কেন এই সহজ পয়েন্টটা ধরতে পারলেন না?

কারণ, ভাভা কলোনির ভূমিকে শূন্য বলে ভেবেছেন। তার তত্ত্বের মধ্যেই অন্তঃসলিলা এই অবস্থানটা আছে — ভাভা ধরে নিয়েছেন যে একটা ঔপনিবেশিক ভূমিতে মিমিক্রি ঘটে একটা শূন্যস্থানে। ভয়েড-এ। একটা শূন্যতার আধারে কলোনাইজড নেটিভ প্রজারা তাদের কলোনাইজার সাহেব প্রভুর মিমিক্রি করে চলে। কিন্তু, আসলে, কলোনাইজার সাহেব প্রভুর খণ্ড উপস্থিতির চিহ্নগুলো — তার মেটোনিমগুলো — যে ভূমিতে ঘটে ওঠে তা কখনোই শূন্য নয়। সেখানে রয়েছে এমন একটা সংস্কৃতি যা এই মেটোনিমগুলোর সঙ্গে, সাহেব উপস্থিতির এই চিহ্নগুলোর সঙ্গে পারস্পরিকতায় আসে, ইন্টেরাক্ট করে, এবং একগুচ্ছ বদল ঘটায়। এই বদলগুলো মিলে মিলেই তৈরি হয় ঔপনিবেশিক থার্ড স্পেস, সিন্থেটিক স্পেস।

ভাভা নেটিভের ভিতর সাহেবের খণ্ড উপস্থিতির এই চিহ্নগুলো পড়ে উঠতে পারলেন না। তার চেয়ে আর একটু এগোলেন পার্থ চ্যাটার্জি। দেখালেন, কী ভাবে এবং কেন আধুনিকতার আংশিক উপস্থিতি ঐতিহ্যের সঙ্গে সহবাস করতে পারে এবং করেছে, আমাদের ঔপনিবেশিক বাস্তবতায় রেগুলারলি করেছে। কিন্তু পার্থ চ্যাটার্জি তার নিজেরই এই খুঁজে পাওয়াটাকে পুরোটা টেনে নিয়ে গেলেন না, তার নিজেরই যুক্তির সম্পূর্ণ বিস্তারটা দেখলেন না। এই সহবাস সহাবস্থানটা কেমন করে আধুনিকতা আর ঐতিহ্য এই দুইয়ের অর্থটাই বদলে দেয়, বা, কেমন করে এরা ত্রিশঙ্কু ইন-বিটুইন বর্গ হয়ে ওঠে, গড়ে তোলে একটা তৃতীয় সিন্থেটিক ভূমি। এবং, গড়ে তোলে ঔপনিবেশিক ইতিহাসেই, যাকে ভাভা চিনেছিলেন নিছক একটা উত্তরঔপনিবেশিক বৈশিষ্ট বলে।

## ১৮।। ডাবল-ভার্শন সাম্য

ভাভা যেভাবে লাকাঁ থেকে তার 'মিমিক্রি' ধারণাটাকে এনেছেন এবং নিজের প্রয়োজনে তাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে নিয়েছেন তার মধ্যে দিয়ে একটা চমৎকার ব্যাপার ঘটেছে — উত্তরঔপনিবেশিক সংস্কৃতিবিদ্যা তার নিজস্ব একটা দৃষ্টি বা প্রহরা বা গেজ পেয়েছে। এটা বলতে আমরা ঠিক কী বোঝাচ্ছি আসছি সে কথায়। তার আগে ঔপনিবেশিক হেজেমনি নিয়ে আমাদের এতক্ষণের আলোচনাটাই শর্টে একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক। যে আলোচনায় আমরা বারবারই এই প্রহরা বা গেজ-এর ধারণাটাকে হাতড়েছি, আঁকড়ে ধরেছি, নাড়াচাড়া করেছি।

কলোনিয়াল হেজেমনিটা গজিয়ে ওঠে কীভাবে তা নিয়ে আমাদের আলোচনাটা আর একবার একটু মনে পড়িয়ে দিই। আমরা বলেছিলাম, এই হেজেমনির উৎস হল একটা ঘনীভবন, কন্ডেন্সেশন। কলোনাইজার সাহেব প্রভুর পারসুয়েশন বা প্রভাবের নীতিগুলো কলোনাইজড নেটিভ প্রজার সাংস্কৃতিক ভূমিতে স্থানান্তরিত বা ডিসপ্লেসড হয়ে যায়। এই স্থানান্তরিত প্রভাব বা পারসুয়েশন নীতিগুলোর একটা ঘনীভবন বা কন্ডেন্সেশনই কলোনিয়াল হেজেমনির উৎস। ডিসপ্লেসমেন্ট এবং কন্ডেন্সেশন — স্থানান্তর এবং ঘনীভবন — এই দুই বর্গ আমাদের ঔপনিবেশিক হেজেমনির আলোচনায় খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই স্থানান্তরিত বা ডিসপ্লেসড হওয়ার প্রশ্নটা আসছে এই কারণে যে কলোনাইজার সাহেব প্রভুর পারসুয়েশন নীতিগুলো যদি তাদের আদত চেহারায় অবিকৃত থাকে তাহলে কলোনাইজড নেটিভ প্রজা সেটাকে বুঝতেই পারবে না। তাদের প্রয়োগ করা যাবে না, ছড়িয়ে দেওয়া যাবে না, কমিউনিকেট করা যাবে না। তাই তাদের কাজে লাগাতে হবে কাজে লাগার মত করে বদলে নিয়ে। বা, এক কথায়, তাদের স্থানান্তর ঘটাতে হবে। এখানে এই 'স্থানান্তর' বর্গটার চেয়ে আরো ভালো যায় লাকাঁর 'মেটোনিমি'।

স্থানান্তর চিহ্নিত করে প্রাথমিক পারসুয়েশন নীতির পরিবর্তিত বিকল্পগুলোকে। কিন্তু মেটোনিমি বোঝায় তার চেয়ে আরো একটু বেশি কিছু। বোঝায় যে ওই পরিবর্তিত বিকল্পগুলো তাদের আদত অবয়ব থেকে খর্বীকৃত খণ্ডীকৃত হয়ে এসেছে — তাদের মেটোনিমিক প্রতিনিধি হয়ে গেছে। এবং, ঠিক এইখানটাতেই, আদত পারসুয়েশন নীতির মেটোনিমিক প্রতিনিধিদের নিয়েই তৈরি হয় ঔপনিবেশিক হেজেমনি।

এটা তো আমরা আগেই দেখিয়েছি এই মেটোনিমি একটা বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে কী ভাবে মিমিক্রি তৈরি করে। কলোনাইজার সাহেব প্রভুর জন্যে রিপ্রেজেন্টেশন বা প্রতিনিধিত্ব, সরকারে শাসনতন্ত্রে সমস্ত জায়গায়। আর কলোনাইজড নেটিভ দাসের জন্যে রেকর্ডেশন বা নথীবদ্ধকরণ, খাতায় তুলে রাখা। রিপ্রেজেন্টেশন এর জায়গায় রেকর্ডেশন — এই প্রক্রিয়ার মধ্যে কাজ করছে একটা মেটোনিমিক বদল। 'সাম্য' বা 'ন্যায়' এই ধারণাগুলো ঔপনিবেশিক শাসনের বিস্তীর্ণ প্রান্তর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আসছে, আর একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে। তাদের একটা মেটোনিমিক বদল ঘটছে। যে তেলেজলে সোমত্থ শরীরের কালোকোলো বাঁজা বৌ আর মার খেতে না পেরে মাঠে নেমেছিল সে যখন বৈশাখের ধুধু মাঠ পেরিয়ে, তালডিহির পাথুরে প্রান্তর পেরিয়ে এপারে এসে পৌঁছল, তার শরীর কঙ্কাল, নুড়ি নুড়ি ঝুলছে ট্যানা, চুল পাকিয়ে জট, সে ডাইনি হয়ে গেছে, তাকে দেখে চণ্ডীমণ্ডপের আরতি করতে আসা বৌয়েরা কচিকাঁচাদের লুকোল নিজের নিজের কোলে। প্রথম বিশ্বে সরকারের গঠন যেমন হয়, কলোনিতেও তাই হচ্ছে, শাসনতন্ত্র ঠিক যে ভাবে সংগঠিত হয় বিলেতে, সেই একই ভাবে হচ্ছে কলোনি ভারতেও, একই তবে পুরোপুরি নয়। কলোনির নেটিভদের হাতে যা তুলে দেওয়া হচ্ছে তা বিলেতে সাহেবরা যা পায় তার একটা মিমিক্রি। মিমিক্রি দিয়ে ঔপনিবেশিক হেজেমনি গড়ে ওঠার তিনটে ধাপ।

এক, মিমিক্রির প্রক্রিয়ায় নেটিভ প্রজার ভিতরে নির্মিত ও সঞ্চারিত হয় একটা অভাববোধ। সে একটা খামতি অনুভব করে। একটা ল্যাক। যেখান থেকে তার আসল বা রিয়ালের প্রতি বাসনা তৈরি হয়।

দুই, রিয়াল পুরোপুরি হচ্ছে না, তার খামতি থাকছে, সেখান থেকে তৈরি হচ্ছে রিয়ালের বা আসলের প্রতি বাসনা, এই আসল → খামতি → বাসনা-র সঞ্চারপথটা যে ভূমিতে ঘটে সেটা কোনো শূন্যতা নয়। সেই ভূমির নিজস্ব একটা প্রকৃতি আছে, বৈশিষ্ট আছে। যে বৈশিষ্ট অনুযায়ী এই ক্রিয়ার ফলাফলগুলো রচিত হয়। ঐতিহ্য, মানে কলোনাইজড নেটিভের সাংস্কৃতিক ভূমিটা নিজেই ক্রমে আধুনিকতার হেজেমনির একটা হাতিয়ার হয়ে ওঠে। পয়দা হয় হেজেমনিহীন হেজেমনি, যাকে হেজেমনির অভাব ভেবে গুলিয়ে ফেলেছেন আপামর উত্তরঔপনিবেশিক সংস্কৃতিবিদ।

তিন, নেটিভের দিক থেকে, সাম্যের (বা ন্যায়ের) স্বপ্নটাই ফলতঃ মচকে যায়, বদলে গিয়ে হয়ে ওঠে একটা ভিন্ন স্বপ্ন, সে আর সাম্যের স্বপ্ন দেখেই না মোটে, এখন সে দেখে কলোনিয়াল ইকুয়ালিটি বা ঔপনিবেশিক সাম্যের স্বপ্ন। সাহেব-এ আর নেটিভ-এ পুরো সাম্য কি কখনো হয় রে পাগল? ওই যা হয় সেটুকুই নয় হোক — আমরা বেঁচেবর্তে থাকি। মিষ্টির দোকানের প্যাকেটে সদ্য অক্ষর-পরিচিত খোকা রসগোল্লা সন্দেশ ইত্যাদি আমোদের পরেই 'ফোন নং' দেখে, আমি ফোন্নং খাব, বলে চেল্লাচ্ছিল, সবগুলোকে একইরকম সিগনিফায়ার ভেবে। তার মত ইমপ্রাক্টিকাল নয় কলোনির নেটিভ। সে আর সাহেবের সমান সাম্যের আশায় চন্দ্রাহত হয়ই না মোটে। 'যথার্থ সাম্য' 'যথার্থ গনতন্ত্র' ইত্যাদি কেরোসিনের দিকে সে আর হাতই বাড়ায় না। যথার্থ সাম্যের অভাবটা সেখানে ইতিমধ্যেই স্বীকৃত এবং গৃহীত হয়ে গেছে।

অনেকেই মাঝেমধ্যে আমাদের দেশপ্রেমিক স্বদেশী বিপ্লবীদের একটু ছোট করে বকে দেন এই বলে যে এইসব দগ্ধেন্দ্রিয়রা বুঝলই না মোটে ব্রিটিশ শাসনের মহিমা। পড়ত অন্য কারুর হাতে, ফ্রান্স, পর্তুগাল, বা স্পেনের, ঠেলা সামলাতে জান বেরিয়ে যেত। কিন্তু, হায় ঈশ্বর, এই কলোনিয়াল সাম্যও যে সবসময় ঘটে ওঠে না। জিলিপি ভাজার শেষ পাকের মত উল্টোদিকে প্যাঁচ মারে মাঝে মাঝেই। এই কলোনিয়াল সাম্যেরও যে কিছু লিমিট আছে, কিছু সীমা। যার পরে সমাজবাস্তবতার নবজাগরিত চামড়ায় জুহির গোপন রহস্যময় ত্বকের উজ্জ্বলতা ফেটে বেরিয়ে পড়ে দগদগে ঘা, দুর্গন্ধ পুঁজ চোঁয়াচ্ছে, পাঁচির ভিকুর বসিরের। মানে সিম্পটম। (একসময় তো পাঁচি ভিকু বসিরেরা তাদের নিজের নিজের অসুখকে ভালোবেসেও ফেলে, ওই ঘা যে চোখ টানে, সাহেবের দয়াময় দৃষ্টি, পয়সা পড়ে থালায়, তখন তাকে বলে সিম্বোম। যাকগে, সে আলোচনা অন্যত্র।)

আর এই ঔপনিবেশিক সাম্য ফেটে গেলে তৈরি হয় এক ধরনের একটা প্রতিরোধ, কলোনির নেটিভ সমাজের এলিটরা তখন বেদনায় কেঁদে ফেলে, অভিমানে চীৎকারও করে, অবগুণ্ঠন খুলে শশী দেখে জিনাতের মুখের অন্য দিক, আর্তনাদ করে আতঙ্কে, সেদিনও লতা মঙ্গেশকরের গলায় একই পন্‌ঘটে ভোর

আসে, নটখট শাম উঁকি ঝুঁকি দেয়, গাঁয়ের মেয়েরা জল আনতে যাচ্ছে, শহরের সত্যম শিবম সুন্দরম মন্ত্র জপ করা এলিটদের ওই সাম্য নিয়ে তাদের কিছু এসে যায় না, তারা কোনোদিনই নিজেদের সমান বলে ভাবেনি। শহরের এলিটরা ভেবেছিল, সাহেবের সাম্য না হোক, অন্তত তার কলোনিয়াল কোটাটা চেয়েছিল। ডাবল ভার্শন সাম্যের ঔপনিবেশিক সংস্করণটা।

ভাভা আর গুহর মধ্যে এখানে একটা তুলনা টানা যায়। শাসনতন্ত্রের সরকারি কাঠামোয় কলোনাইজড নেটিভ প্রজার বিষয়ী সংস্থান তথা মননের চিন্তনের সাবজেক্টিভিটির আংশিক প্রতিনিধিত্বের নীতির ভিতর গুহ লক্ষ্য করেছিলেন হেজেমনির অভাবের একটা সূচক বা চিহ্ন। এবার, গুহর এই ভাবনাটাকে নিয়ে ভাবুন। গুহর এই হেজেমনির অভাবের ধারণাটাকে। ভাভার মিমিক্রিকে আর একটু বাড়িয়ে তুলে আমরা কি গুহর এই ধারণাটার ভিতরে একটা অন্য হেজেমনির চিহ্ন খুঁজে পেতে পারি না? 'গুহর তত্ত্বধারণা'-টা যেখানে তত্ত্বের বিষয় হয়ে যাচ্ছে? একটা অভাববোধ, হেজেমনির অভাব। তার থেকে তৈরি একটা বাসনা। পরিপূর্ণ যথার্থ হেজেমনি খুঁজে পাওয়ার? আধুনিকতার, মডার্নিজমের একটা হেজেমনি? মিমিক্রি আসলে কলোনিয়াল হেজেমনিকেই নিশ্চিত করে। অভাববোধ থেকে বাসনা বানিয়ে তোলার ওই কলকব্জা মারফত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন ১৯১৩-য়। এর আগে পরে কিছু ঘটনা ঘটেছিল যা দিয়ে এই কলোনিয়াল সাম্যের জায়গাটাকে ভালো ধরা যায় — কলোনিয়াল সাবজেক্ট-এর সাবজেক্টিভিটি মানে ঔপনিবেশিক প্রজার মনন কাঠামো বা বিষয়ী সংস্থান কী ভাবে কাজ করে। শরতচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসে স্বদেশী তথা অন্যান্য দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের প্রতি শরতচন্দ্রের নিজের মত করে একটা তীব্র আবেগ ছিল। ইংরেজ সরকার, স্বাভাবিক ভাবেই, এই উপন্যাস নিষিদ্ধ করে দেয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এতে বরং ব্রিটিশ সরকারের মহানুভবতাই দেখেছিলেন। যে, উপন্যাসটাই নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সরকার যদি খুব খারাপ হত তাহলে লেখককেও তো গ্রেপ্তার করতে পারত। (এই ঘটনা সত্যিই ঘটনা কিনা তাতে কিছু এসে যায় না, আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার নয়, সংস্কৃতির ইতিহাস। অনেক লোক এই ঘটনা বিশ্বাস করেন, তাঁরা এইভাবে দেখেন এবং ভাবেন পুরোটাকে। আমাদের এই আলোচনার রবীন্দ্রনাথ যদি লোকধারণায় বিধৃত রবীন্দ্রনাথ হন, বাস্তব ঘটনার রবীন্দ্রনাথ না হয়ে, তাতে এই আলোচনায় কোনো পার্থক্য ঘটছে না।) এই ধরনের আরো উদাহরণ আছে। দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূল যুক্তিটা এখানে বোঝা মোটেই শক্ত নয়। একটা ঔপনিবেশিক সমাজে মিমিক্রির দুটো সম্ভাব্য মুহূর্ত — এক, ঔপনিবেশিক সাম্য, কলোনিয়াল ইকুয়ালিটি, এবং, দুই, ঔপনিবেশিক পার্থক্য, কলোনিয়াল ডিফারেন্স।

একটা ঔপনিবেশিক শাসনে কিছু কলোনিয়াল ডিফারেন্স তো থাকবেই, সাহেবে নেটিভে প্রভেদ দেখলে কেউই অবাক হয় না, এটা কোনো বাড়তি বিস্ময় বা আঘাত নয়। তাই, যেখানটায় আমাদের চোখ পড়ে, আমরা আবেগে আপ্লুত হয়ে যাই তা হল কলোনিয়াল ইকুয়ালিটি, ঔপনিবেশিক সাম্য। এটা চোখে পড়লেই আপামরপণ্ডিত আমরা সবাই আনন্দাশ্রুগদগদ হয়ে যাই। কিন্তু এই কলোনিয়াল ইকুয়ালিটির জটিলতা বোঝার জন্যে আর দু একটা কথা বলে নেওয়া দরকার কলোনিয়াল ডিফারেন্স নিয়ে। আজকের উত্তরঔপনিবেশিক তত্ত্বচর্চায় এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। বরং সেখানে কলোনিয়াল ইকুয়ালিটি নিয়ে আলোচনা প্রায় নেই-ই।

## ১৯।। ঔপনিবেশিক পার্থক্য

আমরা আগেই বলেছি গুহ কী ভাবে ঔপনিবেশিক পার্থক্যকে সাহেব প্রভুর ঔপনিবেশিক হেজেমনির অভাবের সূচক বলে ভেবেছেন। কিন্তু গুহ তার খুঁটিনাটিতে যাননি — কলোনিয়াল পার্থক্য বলতে ঠিক কী বোঝায়। পার্থ চ্যাটার্জি তার 'নেশন অ্যান্ড ইটস ফ্র্যাগমেন্টস : কলোনিয়াল অ্যান্ড পোস্টকলোনিয়াল হিস্ট্রিজ' বইয়ে বরং সেই খুঁটিনাটি নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। পার্থ চ্যাটার্জি এই আলোচনায় কোথাও কোথাও তাঁর একটা অবাক হওয়া জানিয়েছেন। অবাক হয়েছেন পশ্চিমের বিদ্যাচর্চার ঔপনিবেশিক আলোচনায়, কলোনিয়াল ডিসকোর্সে একটা ধারাবাহিক প্রত্যাখ্যান দেখে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অব্দি ঔপনিবেশিক ডিসকোর্স উপনিবেশের নেটিভ বাস্তবতার উপর শাসনে ঔপনিবেশিক সাহেব প্রভুর

পারসুয়েশন নীতিগুলোর, পারসুয়েসিভ প্রিন্সিপলগুলোর সার্বজনীনতা বা সর্বত্রগামিতা, ইউনিভার্সালিটি, মেনে নিতে একটানা প্রত্যাখ্যান করে এসেছে। এই পারসুয়েশন নীতিগুলোর মধ্যে ছিল বাক-স্বাধীনতা, সরকার এবং আমলাতন্ত্রে সমান প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি।

পার্থ চ্যাটার্জি উদাহরণ দিয়েছেন ভিনসেন্ট স্মিথের। স্মিথ তার লেখায় যুক্তি দিয়েছিলেন যে ব্রিটিশ পারসুয়েশন নীতি, পারসুয়েসিভ প্রিন্সিপল, ভারতে প্রয়োগ করা উচিত নয়, এবং সম্ভবও নয়।

উচিত নয়, কারণ, ভারতবাসীর নৈতিকতার, মরালিটির উপর সেটা একটা আঘাত হতে পারে। ব্রিটেনে গনতন্ত্র ইত্যাদি আধুনিকতার নীতিগুলো যেভাবে কাজ করে সেটা একটা নৈর্ব্যক্তিক প্রক্রিয়া। ভারতের ঔপনিবেশিক প্রজা তো একটা নৈর্ব্যক্তিক, ইমপার্সোনাল সরকারের চেয়ে একজন ব্যক্তিগত পার্সোনাল রাজাকে বেশি পছন্দ করতেই পারে।

আর ব্রিটিশ এই পারসুয়েশন নীতির ভারতীয় প্রয়োগ সম্ভব নয় তার কারণ, এক, ব্রিটিশ যে সাম্য এবং গনতন্ত্র ধারণা তা জাত-পাত-এর শ্রেণীবিভাগে বিভক্ত ভারতীয় সমাজের সঙ্গে যায় না। আর দুই, তাই এই নীতিগুলোর প্রয়োগ ভারতীয়দের উপর একটা চাপিয়ে দেওয়া, কোয়েরশন, নিপীড়ন হিশেবে আসবে, যা, পরে, একটা বিদ্রোহ ডেকে আনতে পারে।

এই আলোচনার সাপেক্ষে পার্থ চ্যাটার্জি তিনটি সম্ভাব্য অবস্থানকে চিহ্নিত করেন। এক, ইতিহাস বা সংস্কৃতির প্রকৃতি নির্বিশেষে সমস্ত সমাজে নির্বিচারে একধারসে এই নীতিগুলো প্রয়োগ করা যাবে। দুই, এই নীতিগুলো অপ্রতিরোধ্য রকমেই পাশ্চাত্য এবং পশ্চিমের নিজস্ব ইতিহাসের বাইরে এদের প্রয়োগ সম্ভব না। আর, তিন, সমাজ থেকে সমাজে ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক পার্থক্যগুলো প্রথমদিকে কিছু বাধা তৈরি করতে পারে, কিন্তু, পরে, উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে, সেই বাধা অতিক্রম করা যায়।

পার্থ চ্যাটার্জি ঔপনিবেশিক ভারতের ইতিহাস থেকে প্রমাণ খুঁজে এনেছেন যা দিয়ে দেখানো যায় যে ভারতে ব্রিটিশ পারসুয়েশনের নীতিগুলো আংশিক ভাবেই প্রয়োগ করা হয়েছিল। এবং ঔপনিবেশিক প্রভুর তরফে পারসুয়েশন নীতির এই খণ্ড প্রয়োগকে পার্থ চ্যাটার্জি নির্দিষ্ট করেছেন কলোনিয়াল ডিফারেন্স বা ঔপনিবেশিক পার্থক্য বলে। বোধহয় এটা তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে যে ভারতে ব্রিটিশ পারসুয়েশন নীতির এই আংশিক প্রয়োগ ইংরেজের সচেতন পছন্দের অংশ ছিল না। তারা যে এরকমই করতে চেয়েছে এবং করেছে তা নয়। করতে তারা বাধ্য হয়েছিল। আর কিছু করার ছিলনা ব্রিটিশ শাসকের। পার্থ চ্যাটার্জির কাছে এটা পছন্দ বলে মনে হয়ে থাকতে পারে এই কারণে যে তার এই আলোচনায় একটা অভিজ্ঞতাবাদী এমপিরিসিস্ট ঝোঁক কাজ করেছে। তিনি যে তিনটি সম্ভাব্য অবস্থানকে চিহ্নিত করেছেন সেই তালিকাটা তাঁর কাছে নিঃশেষকারী বা এক্সহস্টিভ মনে হয়েছে। মনে হয়েছে এর বাইরে আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু একটা সমাজ বাস্তবতা থেকে আর একটা সমাজ বাস্তবতায় শাসক নীতি রপ্তানি করার সম্ভাব্যতাটা, মানে কতটা সেগুলো রপ্তানি করা যাবে বা যাবে-না, সেটা এখানে কোনো ইশুই নয়। সমস্যাটা অন্য জায়গায়। সমাজ শাসনের নির্দিষ্ট কিছু নীতি, এ সেট অফ গভার্নিং প্রিন্সিপ্‌ল্‌স, যার মধ্যে একটা সমতার ধারণা উপ্ত হয়ে আছে — তাদের একটা উপনিবেশে রপ্তানি করা কতটা সম্ভব সেটাই এখানে প্রশ্ন। কারণ, উপনিবেশের সমাজ বাস্তবতা তো প্রভু ভৃত্যের ক্রমে নির্দিষ্ট। সেখানের আবহাওয়ায় ধানক্ষেতে এই সমতা ব্রান্ড বীজ কতটা ফলে উঠতে পারবে এখানে সমস্যা এটাই। ইশুটা এখানে ওই নীতিগুলোর মধ্যে উপ্ত সমতা-ধারণা।

আমরা এবার এই কলোনিয়াল ডিফারেন্স বা ঔপনিবেশিক পার্থক্যকে দেখব একটা প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের জমিতে একটা নির্দিষ্ট পার্থক্যের প্রকাশ হিশেবে। প্রকাশটা ঘটছে যুক্তিকাঠামোর শরীরে নতুন কিছু প্রবণতার আকারে। বিদ্যাচর্চায় আলোচনায় ডিসকোর্সে যে যুক্তিকাঠামো হাজির থাকে, একটা কলোনির ক্ষেত্রে সেই যুক্তিকাঠামোর মধ্যে নতুন কিছু স্ফূরণ হচ্ছে যা ওই ঔপনিবেশিক কাঠামোর নিজস্বতা থেকে উদ্ভূত। তাই, যা পশ্চিমের আধুনিকতার ডিসকোর্সেও নেই, আবার পূর্বের আবহমান ঐতিহ্যের ডিসকোর্সেও নেই। এবং এই উদ্ভব জাস্ট নতুন কিছু উপাদানের নয় — এমন উপাদান যা এমপিরিসিস্ট বা অভিজ্ঞতাবাদী অনুসন্ধানে ধরা পড়বে। একদম আভ্যন্তরীন যুক্তিগঠনের স্তরে একটা গভীর এবং নিবিড় বদল জন্মাচ্ছে, যাকে ধরবার জন্যে দরকার পড়ছে একদম আনকোরা কিছু তাত্ত্বিক অবস্থানের। এবং যুক্তিগঠনের এই নয়া বদলের সঙ্গে

অঙ্গাঙ্গী ভাবে সম্পৃক্ত কলোনির এই প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক। এই প্রভু-ভৃত্য বাস্তবতাটাই তার জমি। আমরা এই যুক্তিকাঠামোর বদল দিয়ে এবার বুঝতে চাইছি কলোনিয়াল ডিফারেন্স বা ঔপনিবেশিক পার্থক্যকে। মানে, আমরা ঔপনিবেশিক পার্থক্যকে ধরতে চাইছি লাকাঁ-জিজেকের সিম্পটম বা রোগলক্ষণ দিয়ে (এই সিম্পটম নিয়ে খুবই বিশদ আলোচনা করা আছে 'মার্জিন অফ মার্জিন' ছাড়াও ২০০০ শারদীয়া অনুষ্টুপে, 'নিয়ন্ত্রণ ও রোগলক্ষণ' প্রবন্ধে)।

এখানে সিম্পটম বলতে এককথায় অযুক্তির পুনরাগমন। কলোনাইজার সাহেব প্রভুর রিজন-এব, যুক্তির জগতের গভীরে তলায় তলায় বহমান অযুক্তি যা দিয়ে ফেরত আসছে — কলোনাইজড নেটিভ দাসের অযুক্তির আকারে — সেটাই সিম্পটম। এই সিম্পটম দিয়ে বোঝা ঔপনিবেশিক পার্থক্য আসলে ঔপনিবেশিক ইতিহাসের একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে ঔপনিবেশিক হেজেমনি বজায় থাকার একটা শর্ত। কলোনাইজার সাহেব শাসনের যুক্তির হেজেমনি যদি ঘটে, তাহলে নেটিভের অযুক্তির সিম্পটম হিশেবে এই ঔপনিবেশিক পার্থক্য ঘটবেই।

## ২০।। ঔপনিবেশিক আদি পাপ

উপনিবেশবাদ মানেই, প্রথমেই, কিছু বোঝাপড়া, কিছু কম্প্রোমাইজ। আধুনিকতাবাদী রিজন বা যুক্তির শাসন থেকে সরে আসার কিছু বোঝাপড়া। ধরুন, শুরুতেই, আধুনিকতার একদম গোড়ার একটা জায়গায় একটা বড় ঝাড় নেমে গেল, শাসক পছন্দ করার জায়গাটায়। কলোনির নেটিভ প্রজার কোনো অধিকার থাকছে না তার শাসক নির্বাচন করার। শাসক তার কাছে প্রদত্ত অপ্রশ্নেয়।

আধুনিকতার গনতন্ত্রের একটা মূল জায়গাই তো এই যে আমি আমার শাসককে নির্বাচন করতে পারি, ভোট দিতে পারি। কলোনিয়ালিজমের গোটা কাঠামোটাই গজিয়ে উঠছে এই প্রাথমিক কম্প্রোমাইজটার উপর। তাই ঔপনিবেশিক পার্থক্য আসলে একভাবে দেখলে এই গুরুতর প্রশ্নটাকে ঘিরে গজিয়ে ওঠা কিছু পরবর্তী গঠন। এই প্রাথমিক পাপ — একটা জাতি আর একটা জাতিকে গ্রাস করে নিল, তার সার্বভৌমতা কেড়ে নিল।

এই আদি পাপ ক্রমে আরো আরো চারিয়ে যাওয়ার আর এক নামই হল ঔপনিবেশিক পার্থক্য। এবার কথাটা এই যে তাকে কতটা চারিয়ে যেতে দেওয়া হবে? সে কি শাসনতন্ত্রের অন্য আর সমস্ত জায়গাকেই গিলে নেবে? এই আদি পাপই কি নির্ণয় করে দেবে কলোনাইজড নেটিভ প্রজার আমলাতন্ত্রে এবং আইনবিভাগে প্রবেশের অধিকারকেও, মানে, অধিকারের অভাবকেও? নাকচ করে দেবে বুরোক্রাসিতে তার কোনো প্রতিনিধিত্ব? বা ধরুন সুধী সমাজে, ভদ্দরলোকের পাড়ায়, শিক্ষায়তনে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, বাজারে, যানবাহনে, সেই সিভিল সোসাইটির উপত্যকায় কী হবে নেটিভ প্রজার অধিকার বা অনধিকারের চেহারা?

এই প্রশ্নগুলোর তাত্ত্বিক উত্তর দেওয়ার জন্যে প্রথমেই স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার একজন সমালোচনা তাত্ত্বিকের, ক্রিটিকাল থিয়োরিস্টের তার তত্ত্বে কাম আলোচনায় তার নিজস্ব প্রবেশপথ বা এন্ট্রি-পয়েন্টের ধারণা। অন্যত্র, প্রচুর আলোচনা করা আছে এই এন্ট্রি পয়েন্ট বা স্ট্র্যাটেজিক এসেনশিয়ালিজম নিয়ে। সবচেয়ে ভালো করে করা আছে অপর ২০০১ বইমেলা সংখ্যায় 'মার্জিন অফ মার্জিন : একটা অটেকনিকাল ভূমিকায়'। কিন্তু এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে আপনাদের সবার সেই লেখা পড়া আছে। তাই দুচারটে কথা বলে নিচ্ছি।

আমরা সারবাদ বা এসেনশিয়ালিজম-এর আলোচনা আগেই করেছি। আজকের উত্তরআধুনিক তত্ত্বচর্চার পৃথিবীর একটা মূল শর্তই এই এসেন্স-এর শাসন থেকে বেরিয়ে আসা। কোনো প্রদত্ত অপ্রশ্নেয় ধারণার এককেন্দ্রিক ফ্যাসিজম আর চলবে না। সবকিছুই নড়ছে ভাঙছে বদলাচ্ছে। এই গতিশীল পৃথিবীর গতিশীল মনন ও চিন্তন প্রক্রিয়ার, গতিশীল সাবজেক্টিভিটির বা বিষয়ী অবস্থানের সঙ্গে সাযুয্য রেখে তত্ত্বেরও একটা গতিশীল কাঠামো — এক কথায় এটাই নানা ধাঁচ এবং ধরনের পোস্টমডার্নিজম-এর একটা সাধারণ লক্ষণ এবং শর্ত। এবার এই শর্তের সমস্যাটা লক্ষ্য করুন। যদি কোনো একটা স্থির শান্ত প্রদত্ত ঘননিবদ্ধ এসেন্স দিয়ে আমি বাস্তবতাকে বুঝতে না চাই, তার মানে যে জায়গাটাই আমি বুঝতে চাই না কেন, তার মধ্যে মিশে

থাকবে অন্য অনেক জায়গা, সমস্ত জায়গা, যাদের না-বুঝে এই প্রথম জায়গাটাকে বোঝা যাবে না। এবার কোনো একটা নির্দিষ্ট ছোট্ট জায়গাকে বুঝতে গেলেও গোটা ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুকে বুঝে নিতে হবে। এককথায় সমস্ত চিন্তা চেতনা মনন সংস্কৃতি সবই অসম্ভব হয়ে পড়ল। আজ আমরা জল পড়া পাতা নড়া দিয়ে যা বুঝছি সেই জল-ও পড়বে, এবং পাতা-ও নড়বে, কিন্তু 'জল পড়ে পাতা নড়ে' ভাবা যাবে না, এই লাইন লেখা যাবে না, মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে সুর করে পড়া যাবে না — মনন জগতে থাকবে না এই লাইন, বাস্তবে যতই থাকুক। কারণ জল বলে কোনো কিছুকে আর ঘোষণা করা যাবে না, তার আগে জল কাকে বলে জানতে হবে, মানে গোটা ব্রহ্মাণ্ডকে জানতে হবে। কারণ জল আর সমস্ত কিছু, এমন কি খরা বা মরুভূমি অব্দি, সবাই সবাই-এর মধ্যে মিশে আছে। তার মানে একধরনের একটা এসেন্স লাগবেই। একটা খণ্ডকে সমগ্র বলে ঘোষণা করতে হবেই। শিশু তার শৈশবে যাকে ট্যাপের মুখ থেকে টিপ টিপ করে পড়তে দেখছে তাকেই জল বলে ঘোষণা করতে হবে, সব জলীয় জটিলতা জানার আগেই। ঠিক তত্ত্বেও তাই। কিন্তু এর সঙ্গে আবহমান এসেনশিয়ালিজমের একটা মৌলিক তফাত থাকবে। সেটা আত্মসচেতনতার। নিজের সীমার সচেতনতার। আগের তাত্ত্বিক সত্যিই বিশ্বাস করত তার এসেন্স সবকিছুরই নিয়ন্তা। বালকরা ভাবত ব্রহ্মচারী, হেগেলিয়ানরা এসেন্স, ধার্মিকরা ঈশ্বর, এবং মার্ক্সবাদীরা অ্যাবস্ট্রাক্ট লেবার। ওই দিয়েই সবকিছু বোঝা যাবে। এবার, যে তাত্ত্বিক আত্মসচেতন রকমে, কৌশল হিশেবে এসেন্সকে আনছে, সে জানে তার এই তত্ত্বর একটা খাঁচা আছে, সেই খাঁচার বাইরে এটা শুধু মিথ্যে হতে পারে তাই না, মিথ্যে হবেই। সে প্রথম থেকেই জানবে তার তত্ত্ব সীমিত। অন্য যে কেউ সেই খাঁচার বাইরে দাঁড়িয়ে, সেই খাঁচার বাইরের বিষয়কে এনে এটাকে মিথ্যে বলে ঘোষণা করতে পারে যে কোনো মুহূর্তেই। এই তত্ত্ব কখনো ফ্যাসিস্ট হবে না। কারণ, সে জানে একটা তত্ত্ব হল একটা নির্দিষ্ট খাঁচার মানে দৃষ্টিকোণের ফসল। অনেক অজস্র অনন্তসংখ্যক খাঁচা আছে। তাই সত্য-ও অনেক, বহুবচন। এই কৌশল হিশেবে আত্মসচেতন রকমে এসেনশিয়ালিজমকে প্রয়োগ করারই নাম স্ট্র্যাটেজিক এসেনশিয়ালিজম। এবার, তত্ত্বের মধ্যেও তাই রয়ে গেল একটা খাঁচার ঠিকানা, একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণের আইডেন্টিটি। কোন জায়গা থেকে ভাবা হচ্ছে — কোন খাঁচার মধ্যে বিষয়টাকে ভাবা হচ্ছে। সেটাই হল প্রবেশপথ বা এন্ট্রিপয়েন্ট। আবার একটা নিষ্ক্রমণ বা ক্লোজারও থাকবে। যার পরে এই তত্ত্ব আর প্রয়োগ করা যাবে না। এই এন্ট্রি পয়েন্ট আর ক্লোজারকে মিলিয়ে একটা তত্ত্বের মোট পরিপ্রেক্ষিত, তার সীমাবদ্ধতা। যা একটা তাত্ত্বিক অবস্থান থেকে আর একটা তাত্ত্বিক অবস্থানে আলাদা হবে, একটা বিষয়ী সংস্থান থেকে অন্য সংস্থানে আলাদা হবে। তাই তাদের তত্ত্ব কাম সত্য-ও আলাদা হবে। উত্তরঔপনিবেশিক উত্তরআধুনিক সংস্কৃতিবিদ্যার আমাদের দেখার জায়গাটার এন্ট্রি পয়েন্ট অতিনির্ণয়, ওভারডিটারমিনেশন। যার কথা আমরা আগেই বলেছি।

যা বলছিলাম, ঔপনিবেশিকতার আদি পাপ কতদূর অব্দি কী কী ভাবে চারিয়ে যাবে, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে এন্ট্রি পয়েন্টটা আগেই চিহ্নিত করে দিতে হবে। যদি সেই প্রবেশপথটা হয় অতিনির্ণয়, যেমন আমাদের, তাহলে উত্তরটা খুব সহজ। হ্যাঁ, এই আদি পাপ ছড়িয়ে যাবেই, শাসনযন্ত্রের তথা বাস্তবতার প্রতিটি কিনার অব্দি। কারণ, অতিনির্ণয় তো মনে করে, এই সমাজের প্রতিটি কিনার খন্দ খোঁচ অন্য প্রতিটিকে নির্ণয় ও নির্মাণ করে। তাই, সমাজের একটি এককের একটি মুহূর্তের একটি ইনস্টান্সের আভ্যন্তরীন একটি সত্তা, যা থেকে ওই গোটা এককটিই নির্মিত, মানে সেই ল্যাক, ল্যাক অফ ইকুয়ালিটি, সাম্যের খামতি, অর্থাৎ সেই আদি পাপ, সেটা সমাজ বাস্তবতার অন্য মুহূর্তগুলোকেও, এককগুলোকেও নির্ণয় এবং নির্মাণ করে দেবে।

তাই, ওই মূল খামতিকে ঔপনিবেশিক বাস্তবতার অন্য কিনারগুলোতে, আলোচনাগুলোতে, ডিসকোর্সে ছড়িয়ে পড়তে দেখে পার্থ চ্যাটার্জির মত আমরা 'বিস্মিত' হই নি, ওটাই আমাদের কাছে স্বাভাবিক লাগে। আমাদের কাছে এটা কোনো প্রশ্নই না, সমাজ জীবনের নানা আলাদা আলাদা স্তরে কলোনিয়াল ডিফারেন্স বা ঔপনিবেশিক পার্থক্য ছিল কি ছিল না। বাস্তবতা যদি অতিনির্ণীত হয়, থাকতে তাকে হবেই। প্রশ্নটা এই যে নানা আলাদা আলাদা স্তরে আলাদা আলাদা ভাবে বসবাসকারী এই ঔপনিবেশিক পার্থক্যগুলো কী ভাবে এ অন্যের সঙ্গে দরকষাকষি করবে, নেগোশিয়েট করবে? এই কলোনিয়াল ডিফারেন্সের তাত্ত্বিক ফলাফল কী

হবে, বা অভিজ্ঞতার জগতে তা নতুন কী কী উপাদানকে নিয়ে আসবে? এদের পক্ষে কী এমন ভাবে এই পারস্পরিক দরকষাকষি করা সম্ভব যাতে ওই আদি পাপের প্রাথমিক পার্থক্যকে প্রশমিত করে একটা ঔপনিবেশিক নিরপেক্ষতা বা কলোনিয়াল ইনডিফারেন্স নির্মাণ করা যায়? বা, নিয়ে আসা যায় ঔপনিবেশিক হেজেমনি?

একটা জায়গা খেয়াল রাখুন, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কখনোই নিছক অভিজ্ঞতাবাদ বা এম্পিরিসিজম দিয়ে দেওয়া সম্ভব না। এটা একটা তাত্ত্বিক প্রশ্ন। একটা তাত্ত্বিক সমস্যা। প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাগুলোকে কোন তত্ত্বের মডেলে দেখব — প্রশ্ন সেটাই। কী ভাবে আমরা বুঝব সেই ঔপনিবেশিক সাম্য কলোনিয়াল ইকুয়ালিটিকে যা তৈরি হতে পারে এই ঔপনিবেশিক নিরপেক্ষতা থেকে?

ঔপনিবেশিক ক্ষমতাকে, তার শাসনকার্য চালাতে গেলে, কলোনাইজার সাহেব বিষয়ী এবং কলোনাইজড নেটিভ বিষয়ীর মধ্যে একটা ফারাক করতেই হবে, এটা সে করবেই। পার্থ চ্যাটার্জি বা অন্যান্যদের মত করে এটাকে কলোনিয়াল ডিফারেন্স বলে ডাকাই যায়। এবার গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক সমস্যাটা এই কলোনিয়াল ডিফারেন্স নয়, এর লিমিটগুলো কী কী? এর সীমাটা কোথায়? কোথায় এটা কাজ করে, এবং কোথায় করে না? বা এই লিমিট কি আদৌ আছে? কোনো সীমাবদ্ধতা আছে ঔপনিবেশিক পার্থক্যের? যদি থাকে, তবে কোথায় সেই সীমা? এই সীমা কী ঘোষিত এবং নথীবদ্ধ ? ডিক্লেয়ার্ড এবং রেকর্ডেড? এই সীমার বাইরে কোনো মুক্তাঞ্চল কি আছে যেখানে কলোনাইজড নেটিভ বিষয়ী তার শাসক ঔপনিবেশিক ক্ষমতার কাছ থেকে সমান ব্যবহার পায়? পুরু যেমন চেয়েছিল আলেকজান্ডারের কাছে? যদি এই শেষ প্রশ্নদুটোর উত্তর হয় হ্যাঁ, মানে, এই সীমা ঘোষিত এবং নথীবদ্ধ, আর, ওইরকম কোনো মুক্তাঞ্চল আছে, তবেই আমরা বলতে পারি, ঔপনিবেশিক সাম্য বলে কিছু ছিল, নতুবা নয়।

এবং একদম শেষ প্রশ্নটা সেই অর্থে আরো গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ওরকম কোনো মুক্তাঞ্চলই সেই এলাকা যা দিয়ে বিশেষত নেটিভ ভারতীয় সমাজের মধ্যবিত্ত অংশে ঔপনিবেশিক হেজেমনি তৈরি হয়েছিল। আসুন আমরা ঔপনিবেশিক ভারতের কিছু লোকশ্রুতি কিছু গপ্পগাছা দিয়ে আমাদের এই কলোনিয়াল সাম্য ও পার্থক্যকে বোঝার চেষ্টা করি।

## ২১।। কলোনিয়াল কিম্বদন্তী

তখন সেই সাহেব স্যার আশুতোষ মুখার্জিকে জিগেশ করল, "আমার কোট কই?" চটজলদি জবাব দিলেন স্যার আশুতোষ, "আমার জুতো আনতে গেছে"।

সাহেবের কোটটা আশুতোষ মুখার্জি চলন্ত ট্রেনের জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন কারণ তার আগে সাহেব তার জুতো ফেলে দিয়েছিল। ট্রেনের ফার্স্টক্লাস কামরায় একজন সাহেব আর আশুতোষ মুখার্জির এই হামসফর হওয়ার কাহিনী আমরা সবাই জানি। ছোটবেলা থেকেই শুনে শুনে বড় হয়েছি। ছোটবেলায় মার মুখ থেকে এই গল্পগুলো শোনাকালীন নিজের ভিতর বীরপুজোর অনুভূতি এখনো মনে আছে। গল্পের মূল জোরের জায়গাটা লুকিয়ে আছে শেষ বাক্যে।

'সাহেব আর কী করবে, চুপ করে গেল।'

অর্থাৎ, সেই ঔপনিবেশিক সমাজেও, একজন সাহেব আঘাত করলে একজন নেটিভ প্রত্যাঘাত করতে পারত। এবং যথাযোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে যথাযোগ্য সেই প্রত্যাঘাত এলে একজন সাহেবকেও নিঃশব্দে সেটা হজম করতে হত। ইংরেজ আমল নিয়ে এরকম গল্প লোককথা কিম্বদন্তী আমাদের চারপাশে অজস্র ছড়িয়ে আছে। এদের দিয়েই তৈরি হয়েছিল সেই রূপকথা মায়া যা ভারতীয় সমাজে ইংরাজ শাসনের হেজেমনির ভিত গেড়েছিল। যার ধূমকি আমাদের আজ-ও চলছে। সেই মাতালের মত যে জীবনে মদ খেয়েছিল কেবল একবার তারপর থেকে শুধু খোয়াড়ি ভাঙছে, হ্যাং-ওভার তাড়াচ্ছে, আমরা একটা ঔপনিবেশিকতার একটা মায়া থেকে যাচ্ছি আর একটায় তার থেকে আর একটায় তার থেকে আর একটায়। কলোনি চলছেই। কলোনি যায়নি মরে আজো, তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয়।

আর একটা গল্প শোনা যাক।

রাঙামুখো গোরা পুলিশ স্যার আশুতোষের পথ আটকেছিল। রেডরোড দিয়ে যেতে দেয়নি। রেডরোড দিয়ে উপনিবেশের কলকাতায় যাওয়ার অধিকার ছিল কেবল সাদা চামড়া সাহেবের। কিন্তু এই জাতিপার্থক্যের সূচক এই অলিখিত অঘোষিত নিষেধাজ্ঞাটা তুলে নিতে হয়েছিল পুলিশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা গভর্নর জেনেরালকে। স্যার আশুতোষের কারণেই তিনি তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। রেডরোড খুলে দেওয়া হয়েছিল শুধু আশুতোষের জন্যে নয়, আপামর সমস্ত নেটিভের জন্যে।

স্যার আশুতোষ জিগেশ করলেন, "রেডরোড দিয়ে নেটিভদের যেতে কি নিষেধ আছে?"

"নিষেধটা আপনার জন্যে নয় — নট ফর ইউ", গভর্নর বলল।

"ইউ মানে? সিঙ্গুলার না প্লুরাল?"

"আচ্ছা বাবা, ঠিক আছে — প্লুরাল।"

আর এই কলোনিয়াল সাম্য সিরিজের বিখ্যাততম হল বিদ্যাসাগরের ঠ্যাং। একজন সাহেব ঘরে ঢোকার পরেও বিদ্যাসাগর টেবিল থেকে পা নামালেন না, টেবিলে রাখা ঠ্যাং নাচিয়েই চললেন, কারণ তিনি যেদিন সাহেবের ঘরে গেছিলেন সেদিন সাহেবও তার পা তুলে রেখেছিল টেবিলে। এই কাহিনীটা আমাদের শিশুবয়স থেকে কত সূত্রে কতবার শুনেছি তার কোনো ইয়ত্তা নেই। গল্পটা শুনতে শুনতে একটা আরামবোধ ছড়ায় শরীরে — হ্যাঁ, আমরাও পারি। একটা লুপ্ত বীরত্বের গল্প যেন — বাঙালিও বীর ছিল একসময়।

কিন্তু একবার ভাবুন তো, এই গল্পটা, এই গল্পগুলো আসলে কার গৌরবের? নেটিভ বাঙালির না সাহেব ইংরেজের? আসুন 'ভারতের নবজাগরণ' নামের এই বহু প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য পুস্তিকাটির পাতা ওল্টানো যাক — সাবধান, আস্তে ধরুন, আলতো আঙুলে, যত্নে — দেখছেন পাতাগুলো কেমন বিবর্ণ হলদের মুড়মুড়ে হয়ে গেছে। আর শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধাটা আনুন শরীরে, মহাপুরুষদের নিয়ে পুস্তিকা। দেখুন পাতার পর পাতায়, পরপর, মহাপুরুষের পর মহাপুরুষ, তারপর মহাপুরুষ। একদম উচ্চতম কোটির গুটিকয়েক মাত্র। নিখুঁত পেডিগ্রি, নিখুঁত শিক্ষা, এবং একটা মাত্র কেস ছাড়া সবক্ষেত্রেই নিখুঁত পোষাকও। ধীরে ধীরে পাতা উল্টে পরপর দেখে যান, দেখুন, বিদ্যাসাগর, রামমোহন, প্রিন্স দ্বারকানাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন। আরো।

কিন্তু, খেয়াল করুন, দেখেছেন, ওই একটা ছবি ছাড়া অন্যগুলো কি ঝাপসা, সময় যেন খুবলে খুবলে দিয়েছে, রঙ তুলে বিবর্ণ করে দিয়েছে — শুধু ওই বিদ্যাসাগরেরটা ছাড়া। হ্যাঁ, বিদ্যাসাগর। সবগুলো ছবির মধ্যে একমাত্র যার পরনে বাঙালি ধুতি আর চটি, একটা বেআক্কেলে রকমের প্রকাণ্ড, অল্প-কদাকার, মুণ্ড, কেশহীন। পুরো এই ছবির সিরিজ থেকে যেন একলা একা বেরিয়ে যাচ্ছে বাইরে, অন্যরা সব রাজন্য, নিখুঁত তাদের বেশভূষা, নিখুঁত অলঙ্কারও, এলিট, শোভন, এবং অনেকক্ষেত্রেই ব্রিটিশ। বিদ্যাসাগর সেখানে একমাত্র ব্যতিক্রম। ঈশ্বরের তৃতীয় ছানা, যাকে শুধু নেচে কুঁদে বেড়াতে হয়, ঈশ্বরের এলিট বাচ্চারা যখন সব দুধ খেয়ে চলে যায়। এই বইয়ের পাতায় অন্যদের চেয়ে এখন বড্ড বেশি উজ্জ্বল, সেই কেশহীন কুশ্রী বাঙালি, যার শরীরে এবং পোষাকে এবং পালিশে উজ্জ্বলতা ছিল সবচেয়ে কম। কিন্তু, ভাবুন তো, কার লেখা, কার সঙ্কলিত এই পুস্তিকা? কে সেই দুঃসাহসী অমিতবিক্রম, যে সিংহকে মূষিক আর মূষিককে সিংহ করে দিতে পারে? রাজন্যদের করুণাকাঙ্খী আর গ্রাম্যকে গাঁওয়ারকে সব এলিটের এলিটতম? কে সেই ঈশ্বরের চেয়েও বড় ঈশ্বর?

আর কেউ না, ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ ক্ষমতা। রুল ব্রিটানিকা — ব্রিটেন রুলস দি ওয়েভস। সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যেখানে সূর্যেরও সাহস হয় না অস্ত যাওয়ার। ব্রিটিশ কলোনিয়ালিজম। নবজাগরণের এই বিচিত্র অদ্ভুত পুস্তিকা রচনা করেছিল সেই। এবং বিদ্যাসাগরকে বিদ্যাসাগর করেছিল। ফরাসী বিপ্লব যা পারেনি, মার্সাই সঙ্গীত যা পারেনি, এমনকি বলশেভিক বিপ্লব যা পারেনি তা করে দেখিয়েছিল ওই দোকানদার আর ঠান্ডা বুড়ো ব্যাঙেদের জাত। এবং ঠিক ব্রিটিশ শিল্পবিপ্লবের মত, নিঃশব্দে, রক্তপাত ছাড়া, বলপ্রয়োগ না করে। নিপীড়ন নয়, প্রভাব, পারসুয়েশন দিয়ে।

শান্তিতে এই শাসন করার জন্যে, প্রজার বুক থেকে রাজার নামগান বার করে আনার জন্যে, মহারানী ভিক্টোরিয়ার দরকার ছিল আবহমান ঐতিহ্যের হেজেমনি ভেঙে, সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্রের হেজেমনি ভেঙে ভারতবাসীকে বার করে আনা বেলোয়ারি রৌদ্রকরোজ্জ্বল এনলাইটেনমেন্টের দুনিয়ায়। নিয়ে আসা ইংরিজি

ভাষার হেজেমনিতে। এই কাজ আর কে করতে পারত বিদ্যাসাগর ছাড়া? গরিব সাদামাটা পরিবারের সংস্কৃত পণ্ডিত, ওই কুশ্রী মুণ্ডের ভিতরে ঔপনিবেশিক ভারতের সবচেয়ে মহার্ঘ মেধা, কার সেই যোগ্যতা ছিল এই কাজ করার? যে একপলকে নির্মাণ করে নিতে পারবে আপামর প্রাকৃতের সম্মতি, ম্যানুফ্যাকচার করে নিতে পারবে তাদের কনসেন্ট? এই আপামর মানুষের ভাষা তাদের হৃদয় তাদের চিন্তা কে আর জানত বিদ্যাসাগরের মত?

অন্যসব অলঙ্কারশোভিত বেশভূষাধারী রাজন্যদের মধ্যে থেকে এই গ্রাম্য পণ্ডিতকে চিনে বার করে এনেছিল ব্রিটিশ। তার নাম তো ঈশ্বর আগে থেকেই ছিল, এবার তাকে সত্যিই ঈশ্বর করে দিয়েছিল। তারপর সঙ্কলন করেছিল এই পুস্তিকা। তার পাতায় পাতায় সেইসব অসহায় প্রিন্স এবং লর্ডদের ছবি। যাদের শরীর জুড়ে মগজ জুড়ে ব্রিটিশ হেজেমনির পদচিহ্ন।

বিদ্যাসাগরের পূর্ণ গৌরব বুঝে উঠতে গেলেই, সম্মান করতে বাধ্য হতে হয় ওই ইংরাজ শাসনের হেজেমনি নির্মাণের দক্ষতাকে। ইংরেজরাই বিদ্যাসাগরকে বিদ্যাসাগর করেছিল, এবং, সেটা ছিল তাদের হেজেমনি নির্মাণেরই একটা গুরুত্বপূর্ণ কলকব্জা। এইবার ঠিক এইখান থেকে আর একবার বিদ্যাসাগরের গল্পটাকে পড়ি আসুন।

গল্পটায় বিদ্যাসাগর কী করেছিলেন? বিদ্যাসাগর তো ঠিক সাহেবদের মতই, সাহেব প্রভুদের মতই করেছিলেন যখন তিনি সাহেব প্রভুর পায়ে মাথা নোয়াতে অস্বীকার করলেন। সাহেবদের মত, মানে, সাহেবদের নকল, সাহেবদের মিমিক্রি। এবং বিদ্যাসাগরের এই মিমিক্রিই তো প্রতিষ্ঠা করেছিল সাহেবদের মাথার উপরে সাহেবদের চেয়েও বড় এক ঈশ্বরের। সামনের সাহেব প্রভুর চেয়ে বড়, সকল সাহেবের চেয়ে বড়, আর নেটিভদের চেয়ে তো বড় বটেই। সেই ঈশ্বর এত বড় যে সামনের ইনকনফিডেন্ট সহজে রেগে যাওয়া সাহেব প্রভুর মত তিনি নেটিভের স্পর্ধায় নিজের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে চীৎকার করে ওঠেন না। তিনি নেটিভের স্পর্ধাও অনায়াসে হজম করে যাওয়ার মত শক্তিমান। নেটিভ এবং সাহেবের উর্দ্ধে, জাতপাতের উর্দ্ধে এই বৃহত্তর ঈশ্বরই ধরে রাখেন ন্যায় ও সাম্য।

এই বৃহত্তর ঈশ্বরই আধুনিকতার মডার্নিজমের হেজেমনি যাকে  ভারতে নিয়ে এসেছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ক্ষমতা ।

এবার ভাবুন তো ওই গল্পগুলো কার গৌরব গাইছিল? নেটিভ বাঙালির না সাহেব ইংরেজের? গল্পগুলো তো তৈরি করে দিচ্ছিল এই ধারণাই যে ইংরেজের চেয়েও বড় আর এক ঈশ্বর আছে, যাকে ইংরেজও মানতে বাধ্য হয়। সেটা সেই ন্যায় ও সাম্য যা সকল নেটিভতা ও সাহেবতার উর্দ্ধে। যে নেটিভ আপত্তিটা দেখাচ্ছে, প্রতিবাদ করছে, সে যদি যথার্থ জোরের সঙ্গে যথার্থ ন্যায়সঙ্গত ভাবে তার আপত্তিটা করতে পারে, তাহলে ইংরাজ প্রভুও তাকে মানতে বাধ্য। আপত্তির সেই যথার্থতা ছিল স্যার আশুতোষের, ছিল বিদ্যাসাগরের। তাই ইংরেজ মেনেছিল। এই বৃহত্তর ঈশ্বরকে আমরা সবাই মানতে বাধ্য।

(এই গল্পগুলোর ঘাপলার বিন্দুটা খেয়াল করুন। এই গল্পগুলোয় শুধু একজন ঈশ্বর নেই, একজন শয়তানও আছে। এবং, আশ্চর্যজনক ভাবে সেই শয়তান কিন্তু ইংরেজ প্রভু নয়। নেটিভ বাঙালি। ইংরেজ প্রভুও একটা বৃহত্তর ঈশ্বরকে মানে, তার মানে সে ভালো। কিন্তু খারাপ কে? এই গল্পে যে অনুপস্থিত মানে নেটিভ বাঙালি শ্রোতা। সে-ই এই গল্পের অনুপস্থিত নেগেটিভ নায়ক। সে যথেষ্ট ন্যায়সঙ্গত যথেষ্ট সাহসী নয় বলেই ইংরেজ প্রভু সচরাচর তার মুখের উপর পা দিয়ে চলে, নইলে দেখাই তো যাচ্ছে, তারা তো স্যার আশুতোষ বা বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এটা করতে সাহস পায় না। তার মানে, আর এক জায়গা থেকে দেখলে, মিমিক্রির যেটা মূল বিন্দু নিজেকে ঘিরে আত্মবিশ্বাস তথা ক্ষমতার যে অনুপস্থিতি বোধ করা, নেটিভের সেই নিজেকে ঘিরে খামতি বা ল্যাকের জায়গাটাকেই বাড়িয়ে তুলছে গল্পগুলো — কলোনিয়াল ডিফারেন্সকে। )

এই গল্পগুলো কাহিনীগুলো রূপকথাগুলো মিলে ব্রিটিশ হেজেমনির গৌরব গেয়েছিল। একটা গৌরব যা যীশু খ্রীষ্টের চেয়েও বড় ('যীশু খ্রীষ্ট'-টা ইচ্ছে করেই ভুল বানানে লেখা হল, ঠিক বানানটা চোখে এত অনভ্যস্ত লাগে)। সেই দোকানদার জাতির গৌরব যারা একটা মেঠো পণ্ডিতকে ঔপনিবেশিক ভারতের বৃহত্তম ব্যক্তিত্ব বানিয়েছিল। ওই নেটিভ জাতির কুলীন এলিট জমিদারদের চেয়ে অনেক অনেক উপরে,

তাঁকে ঈশ্বর করে দিয়েছিল। এই ঈশ্বরের পেছনের চাঁদমালা খোদ বিলেত থেকে আমদানি, তার থেকে যে জ্যোতি ঠিকরে বেরোয় তাও চাঁদের আলোর মতই, ব্রিটিশ সূর্যের অপ্রতিহত এনলাইটেনমেন্ট আলোকবিচ্ছুরণের প্রতিফলিত রোশনাই। সেই ঈশ্বরের গৌরব ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের হেজেমনির গৌরব।

## ২২।। ঔপনিবেশিক সাম্যের সীমা

আমাদের মূল যে আলোচনার জায়গা — ঔপনিবেশিকতা উত্তরঔপনিবেশিকতা নিয়ে সেই উপন্যাস সেটা কি এইখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে? কলোনিয়াল ইকুয়ালিটির মায়াবী এই কাহিনীগুলোয়? এই ঔপনিবেশিক সাম্যের সীমাটা কোথায়? কোথায় এটা শেষ হয়? এটা মাথায় রাখুন, কলোনির অধিবাসীরা কিন্তু কোনোদিনই সেই অর্থে নাগরিক নয়, সিটিজেন নয়, আধুনিকতার গনতন্ত্রে আমরা নাগরিক বলতে যা বুঝি। তার সামনে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা পশ্চিমের ডিসকোর্স ঝুলিয়ে দিয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের মার্সাই গানের সাম্যের স্বপ্ন, তার ঘোরে সে দেশপ্রেমিক গান লিখতে শুরু করেছিল, চল রে চল সবে ভারত সন্তান, সেই সুরেই, কিন্তু শেষ অব্দি স্বপ্নভাঙা কাঁচাঘুমভাঙা কলোনিবাসী যা পেল তা সেই সাম্য নয়, তার এক ঔপনিবেশিক সংস্করণ — কলোনিয়াল ইকুয়ালিটি।

কিন্তু এই কলোনিয়াল ইকুয়ালিটিও কি পেত সে? সেই হৃদয় জুড়োনোর মর্গটুকুও? সেটাও শেষ হয়ে যেত, প্রায়ই। তখন সেই কলোনিয়াল সাম্যের অ্যাপলজিটুকুও থাকত না আর। সে তো কোনোদিনই সিটিজেন হয়নি, নাগরিক হয়নি, খুব বেশি হলে হয়েছিল সাবজেক্ট, প্রজা। তাও সেই প্রজারও মাঝদুপুরে রাত্তির ঘনিয়ে আসত প্রায়ই, ডার্কনেস অ্যাট নুন। তার দিবা দ্বিপ্রহরে আকাশ বাতাস ফুঁড়ে বেরিয়ে আসত বড় বড় ঘাতক দাঁত, লে দেঁত দু মিদি, দুপুরের দাঁত। আলোকপ্রাপ্তির এনলাইটেনমেন্টের পশ্চিম দাঁত নখ বার করে ছুটে আসত তার দিকে। ফেরত নিয়ে নিত সেই কলোনিয়াল ইকুয়ালিটিটুকুও। মার্সাই গানের সাম্যের সুরে বাজত ব্রিটিশ বন্দুক। ব্রিটিশ ফরাসি জর্মন হিস্পানিক, যেখানে যেমন।

এই কলোনিয়াল সাবজেক্ট, এতক্ষণ যে তার ঔপনিবেশিক বিষয়ী সংস্থান রচনায় ব্যস্ত ছিল কান্ট লক আর হিউমের আলোয়, এবার সেই নেটিভ প্রজার গায়ে গুলি লাগে, রক্ত বেরিয়ে আসে ফিনকি দিয়ে, সে বেদনায় চীৎকার করে, আবিষ্কার করে তার প্রজাস্বত্বের সীমা। এতক্ষণের কান্ট লক আর হিউমের ঘোর তার মৃত্যুর আগের ভুল বকায় পরিণত হয়। ঠিক এটাই তো ঘটেছিল জালিয়ানওয়ালাবাগে। ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল। এমনকি ব্রিটিশ সরকারের তথ্যেও সেদিন মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৩৭৯, এবং বারোশোর-ও বেশি লোক গুরুতরভাবে আহত। যাদের অনেকেই পরে মারা গিয়েছিলেন। সেদিনের ব্রিটিশ আক্রমণের দায়িত্বে থাকা কমান্ডার রেজিনাল্ড ডায়ার নিরস্ত্র মানুষের উপর তার সৈনিকদের লেলিয়ে দিয়েছিল কোনোরকম কোনো প্ররোচনা ছাড়াই। এবং তার অধীনস্থ ব্রিটিশ সৈনিকরা গুলি চালিয়েছিল নির্বিচারে। যে মাঠে সভা হচ্ছিল সেই জালিয়ানওয়ালাবাগ স্কোয়ারটার বেরোনোর জায়গা ছিল কেবল একটা। এবং ডায়ার তার সৈন্য নিয়ে দাঁড়িয়েছিল ঠিক সেটারই সামনে। সভায় জড় হওয়া জনতার ভাগ্য নির্ধারণ করার পর ডায়ার আর তার ঘাতকেরা ছড়িয়ে পড়েছিল চারপাশের গ্রামের মানুষ শিকারে। চারপাশের বহু গ্রাম সেই রাতে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

জালিয়ানওয়ালাবাগের পর ভারতের এলিট নেটিভদের প্রতিক্রিয়াটা ছিল খুব মজার, ইন্টারেস্টিং। বেশিরভাগ প্রতিক্রিয়ারই মূল ধরতাই ছিল বিশ্বাসভঙ্গের বেদনা। যেন তাদের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এই ঘটনার পর স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর স্যার রইলেন না। তিনি ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া নাইট উপাধি ত্যাগ করলেন। তার এই নাইট উপাধি পরিত্যাগের মধ্যে ছিল একটা প্রতিরোধ।

এবার প্রশ্নটা এইখানে, এই বিশ্বাসভঙ্গ বিশ্বাসঘাতকতা বা বিট্রায়ালের ব্যাপারটাই ধরুন। বিশ্বাস নামক বস্তুটাকে ভঙ্গ করা হচ্ছে বা ঘাত করা হচ্ছে মানেই একটা বিশ্বাস ছিল। কী বিশ্বাস? সেটা নিশ্চিতভাবেই, কলোনিয়াল ইকুয়ালিটি বা ঔপনিবেশিক সাম্যের উপর একটা সরলমতি ইনোসেন্ট নির্ভরতা — মানে

বিশ্বাস। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড তাদের এই ইনোসেন্ট বিশ্বাসের ঘোরে একটা জোর ধাক্কা দিয়েছিল। অভাবিত অজানা একটা পরিস্থিতি চমকে দিয়েছিল তাকে। অভাবিত অজানার এই আকস্মিক অভ্যাগমন — এটাকে পড়ুন বহিষ্কৃতের পুনরাগমন, রিটার্ন অফ দি রিপ্রেসড। এককথায় সিম্পটম।

যে কোনো সামাজিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকেই কিছু ধারণার বা বর্গের একটা আন্তঃক্রীড়া দিয়ে ভাবা যায়, একটা ইন্টারপ্লে অ্যামং নোশনস। ঔপনিবেশিক হেজেমনি-ও তাই। কিন্তু নানা ধারণার নানা বর্গের এই খেলাধুলোটা তো অনন্তকাল ধরে চলতে পারে না। তার একটা সমাপ্তি বা ক্লোজার আনতে হয়। (একটু আগেই যার কথাটা আমরা ছুঁয়ে এসেছি। অন্যত্র অনেক দীর্ঘ আলোচনা আছে এই নিয়ে। ) তত্ত্বের তলে, থিয়োরির প্লেনে বিভিন্ন ধারণার এই খেলাধুলোটা থামিয়ে দিতে হয় একটা কৌশলগত বা স্ট্র্যাটেজিক ক্লোজার দিয়ে। একজন ঔপনিবেশিক প্রজার ক্ষেত্রে এই ক্লোজার বা সমাপ্তিটা আসে ওই ঔপনিবেশিক সাম্য বা কলোনিয়াল ইকুয়ালিটির ধারণা দিয়ে। এই ধারণাটাই শেষ অব্দি তাকে ধরে রাখে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের প্রতি নির্ভরতায়। এই ক্লোজারটা ঔপনিবেশিক প্রজার উপর ব্রিটিশ হেজেমনির প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধারণার বর্গের আন্তঃক্রীড়ায় একটা সীমা আনে, লিমিট আনে।

ঔপনিবেশিক সাম্য হল তাই যা সাম্য তবে পুরোপুরি নয়। সেই সাম্য যা রূপ পায় লিপিবদ্ধ রাখার, রেকর্ডেশনের, অধিকারে। কলোনাইজড নেটিভ প্রজার তো প্রতিনিধিত্বের, রিপ্রেজেন্টেশনের, অধিকার থাকে না। তার প্রতিনিধিত্বের অধিকার নাকচ হয়ে গেছে আগেই। সঙ্কটের সময়ে হাত পড়ে তার লিপিবদ্ধ রাখার অধিকারের উপরও। জালিয়ানওয়ালাবাগের মূল সভাটা ছিল এই নিয়েই, ভারতীয় নেটিভ প্রজাদের প্রতিনিধিত্বের অধিকারের দাবিতে — ইন্ডিয়ান সেল্ফগভর্নমেন্ট, ভারতীয়দের নিজেদের সরকার। তারপর, ডায়ারের ওই গনহত্যার পর হাত পড়ে গেল ঔপনিবেশিক প্রজার লিপিবদ্ধ রাখার অধিকারেও। সেটাও নাকচ হল। ব্রিটিশ সরকার, গোপন করার চেষ্টায়, অনেকদিন অব্দি কোনো তথ্য ছাপা হতে দেয়নি। তাই এই জালিয়ানওয়ালা হত্যাকাণ্ড আমাদের সামনে ঔপনিবেশিক সমতার সীমাটাকে চেনায়। যখন পশ্চিম থেকে আমদানি এই সমস্ত সাম্য ধারণা ভেঙে পড়ে একসাথে। তখনই আসে বিশ্বাসভঙ্গের বেদনা। লাকাঁর সিম্পটমকে মনে করুন। আদার বা অপর সচেতনের তথ্যের জ্ঞানের সীমার বাইরে থেকে নিজেকে ফেরত নিয়ে আসছে, এবং রিয়ালের বা আসলের নিশ্চিত এবং আত্মবিশ্বাসী শরীরে নিজেকে দেগে দিচ্ছে, রোগলক্ষণের ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিচ্ছে। জালিয়ানওয়ালাবাগ এবং জালিয়ানওয়ালাবাগেরা হল ঔপনিবেশিক বাস্তবতার, ঔপনিবেশিক সাম্যের সিম্পটম। যা পেরিয়ে ঔপনিবেশিক প্রজা আর প্রজাটুকুও থাকে না। সাবজেক্ট আর সাবজেক্ট থাকে না। সে হারিয়ে ফেলে তার অধিকার, তার বিষয়ী সংস্থান, তার মনন চিন্তন সবকিছু।

মিহির আর ওর বৌ যে সিনেমাটা দেখতে গেছিল সরমা সিনেমাহলে, সেই 'অগ্নিপথ', সেটা ছিল বিগ বি-র একের পর এক ফ্লপের মধ্যে হিট সিনেমায় ফেরত আসার চেষ্টা। নতুন পরিচালক মুকুল আনন্দকে নিয়ে। তাও সেটা ভয়ঙ্কর ফ্লপ করেছিল। তার আগের মহাফ্লপ 'ইন্দ্রজিত'-এর চেয়েও বড়। কিন্তু হিট করেছিল একটা ডায়ালগ, আপাতসাম্যের উত্তরঔপনিবেশিক পৃথিবীতে সেই ডায়ালগ হিট করারই কথা। আমরা তো আমাদের সমতার অধিকার আছে এরকম ভেবেই অভ্যস্ত। সিনেমাটার চেয়ে অনেক সফল সেই ডায়ালগটা ছিল "সওয়াল জিস জবান মে কিয়া যায়ে, জবাব ভি উস জবানমে দেনা চাহিয়ে"। যে ভাষায় প্রশ্ন উত্তরও সেই ভাষায় দিতে হবে। বোঝার এইটাই যে পশ্চিমের হেজেমনি আর কোনো ভাষাকেই অবশিষ্ট রাখেনি। ভাষা সেখানে একটাই। পশ্চিমের হেজেমনির ভাষা। ডিসকোর্স সেখানে একটাই। পশ্চিমের ডিসকোর্স। আমরা যে প্রশ্নই করি না কেন, সেটা ওই পশ্চিমের ভাষাতেই হবে, আর কোনো ভাষাই তো নেই।

এই প্রবন্ধের তিন নম্বর সেকশনে আমরা লিখেছিলাম, আমাদের সঙ্গে অন্যান্য উত্তরঔপনিবেশিকদের পার্থক্য এই যে আমরা এই পোস্টমডার্ন পোস্টকলোনিয়াল পৃথিবীর পোস্টকলোনিগুলোকে দেখতে চাইছি আর এক রকমের উপনিবেশ বলে, নথীহীন বিবরণহীন অলিখিত অঘোষিত কলোনি। কলোনি যায়নি মরে আজো, তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয়। নতুন নতুন ছবি নতুন নতুন সাম্যের রূপকথায় নিজেদের ভোলানো।

সাম্য বলে কোনোকিছু কখনো কোথাও ছিলনা, নেই। কলোনির সঙ্গে পোস্টকলোনির তফাত একটাই, কলোনিতে একটা নির্দিষ্ট ভিলেন ছিল, সাহেব প্রভু। এখন ভিলেন নামহীন অগণ্য অনবয়ব। আমার ভুখা শিশুর মুখের রুটি ছিনিয়ে রানী ভিক্টোরিয়ার চৈনিক সিল্কের অর্ন্তবাস হত, আজো হয়, শুধু কার হয় সেটা আর আলাদা করে দেখানো যায় না। কিন্তু সেই পোস্টকলোনিয়াল অর্থনৈতিক শোষণ দেখানোর জন্যে দরকার শ্রমের উদ্বৃত্ত মূল্যের সমীকরণ আর অঙ্ক। কীভাবে তৃতীয় বিশ্বের প্রাপ্য সারপ্লাস তৃতীয় বিশ্ব থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় — শুধু, এই ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কে তার নামটা আলাদা করে দেখানো যায় না। কিন্তু এই উত্তরউপনিবেশ মানে নামহীন ঔপনিবেশিকের উপনিবেশ — একে তো আমরা ধরতেই পারব না, যদি আমাদের উপনিবেশের ইতিহাসগুলোকে আমরা ঠিক ভাবে পড়তে না শিখি। কারণ, পদ্ধতিটা তো আসলে নিরবচ্ছিন্ন কন্টিনিউয়াস — কলোনি থেকে পোস্টকলোনি — এত যত্ন এবং আয়াসে যাদের আলাদা করে ছিন্ন করে ভেঙে দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।